পালি সাহিত্যে মানবাধিকার প্রসঙ্গ সমীক্ষা

GIFT

499040

নীরু বড়ুয়া

Dhaka University Library
499040

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

সেপ্টেম্বর ২০১৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, নীরু বড়ুয়া কর্তৃক উপস্থাপিত 'পালি সাহিত্যে মানবাধিকার প্রসঙ্গ সমীক্ষা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। অভিসন্দর্ভটি বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রি প্রাপ্তির জন্য উপস্থাপন করেননি।

ড. সুমন কান্তি বড়ুয়া
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক
পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।

499040

Dhaka University Institutional Repository

সূচি

ভূমিকা

অবতরণিকা

প্রথম অধ্যায় : বুদ্ধের শিক্ষায় মানবাধিকার : বিষয় ও প্রকরণ

দ্বিতীয় অধ্যায় : মানবতার সাধনায় বুদ্ধের শিক্ষা : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

তৃতীয় অধ্যায় : বুদ্ধের নারী স্বাধীনতা : একটি পর্যেষণা

চতুর্থ অধ্যায় : মানব কল্যাণে বুদ্ধের পঞ্চশীল

পঞ্চম অধ্যায় : বুদ্ধের শিক্ষায় সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য : প্রায়োগিক ব্যবহারের স্বরূপ অন্বেষণ

499040

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

আমার পিএইচ. ডি গবেষণাকর্মের শিরোনাম 'পালি সাহিত্যে মানবাধিকার প্রসঙ্গ সমীক্ষা'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের অধীনে উপরি-উক্ত শিরোনামে পিইচ. ডি গবেষণাকর্মের জন্য ২০১২–২০১৩ শিক্ষাবর্ষে (রেজি নং : ১৩/২০১২-২০১৩) আমি নিবন্ধন লাভ করি এবং ড. সুমন কান্তি বড়ুয়া- এর তত্ত্বাবধানে অভিসন্দর্ভ রচনা করি। কর্মমুখর সমাজজীবন। সংসার ও কর্মজীবনে নানাবিধ প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও অভিসন্দর্ভটি মূল্যায়নের জন্য উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি। অভিসন্দর্ভের সামগ্রিক পরকিল্পনা প্রণয়ন ও রূপরেখা বিনির্মাণে ড. সুমন কান্তি বড়ুয়া-এর কর্তব্য পরায়ণতা, প্রাজ্ঞ বিবেচনা, সততা, অনন্ত উৎসাহ ও অবিরত অনুপ্রেরণা শ্রদ্ধা অবণত ও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। তত্ত্বাবধায়কের সুচিন্তিত পরামর্শ অনাবিল আন্তরিকতা প্রাজ্ঞোচিত নির্দেশনা আমার গবেষণাকর্মকে অধিকতর সহজ করে দিয়েছে। আমি তাঁর সীমাহীন স্নেহে ধন্য ও অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ।

বিভিন্ন প্রাজ্ঞ ও সুধীজন মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমার গবেষণাকর্মকে বেগবান করেছেন। তন্মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের অনারারি অধ্যাপক ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া, অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া, অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া ও অধ্যাপক ড.বেলু রানী বড়ুয়া, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ড. নাছিমা খাতুন, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আব্দুর রশীদ, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু হল-এর প্রাক্তন প্রভোস্ট ও বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. বায়তুল্লাহ কাদেরী, থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান জনাব সুদীপ চক্রবর্তী, যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফ, সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক জগন্নাথ হল-এর প্রভোস্ট ড. অসীম সরকার এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য ভাষা বিভাগের অধ্যাপক ড. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া, অধ্যাপক ড. জিনবোধি ভিক্ষু প্রমুখ। এঁদের সহযোগিতা ও আন্ত রিক অনুপ্রেরণার কথা আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি। তাছাড়া আমি গভীর কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি আমার জন্মদাতা পিতা পূজনীয় প্রদীপ কুমার বড়ুয়াকে যিনি আমাকে সবসময় গবেষণাকর্ম সম্পাদনে উৎসাহ ও সাহস যুগিয়েছেন। তিনি আজ আমাদের মাঝে আর নেই কিন্তু তাঁর প্রাজ্ঞতা আমাকে সামনে যেতে সহায়তা করবে। আমার মা এমেলী বড়ুয়া ও দাদা হীরু বড়ুয়া তারা দুইজনই আমাকে এতে উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁদেরকেও স্মরণ করছি। তাছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় লাইব্রেরীতে যারা আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদেরকেও স্মরণ করছি।

Dhaka University Institutional Repository

অবতরণিকা

গৌতম বুদ্ধ খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ অব্দে ভারতবর্ষের কপিলাবস্তু রাজ্যের (বর্তমান নেপাল) লুম্বিনী উদ্যানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রাজা শুদ্ধোদন এবং মাতার নাম রানি মহামায়া। জন্মের সাত দিন পর জন্মদাত্রী মাতা মৃত্যুবরণ করলে বিমাতা গৌতমী তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব নেন। একজন রাজপুত্র হয়ে রাজসুখ, রাজমর্যাদা, রাজ সিংহাসন, মাতা-পিতা, পরম সুন্দরী স্ত্রী গোপা, প্রাণপ্রিয় রাহুল, আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করে দুঃখমুক্তির সন্ধানে উনত্রিশ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেন। ছয় বছর কঠোর সাধনা করে গয়ার বোধিবৃক্ষমূলে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে পরম বোধিজ্ঞান লাভ করেন। পয়ঁত্রিশ বছর বয়সে তিনি বারাণসীতে ঋষিপতন মৃগদাবে ধর্ম প্রচার শুরু করেন। আশি বছর বয়স পর্যন্ত তিনি তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর ধর্মীয় মতবাদকে যারা অনুসরণ করেন তারা বৌদ্ধ। তাঁর প্রচারিত উপদেশ কিংবা ধর্মবাণী যেই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে তাই 'ত্রিপিটক'। এটি বৌদ্ধদের ধর্মীয় পবিত্র গ্রন্থ। ত্রিপিটকের উৎস বুদ্ধবাণী যেখানে তাঁর মতাদর্শ ও চিন্তার রূপ-রূপান্তর দেখা যায়। এখানে কোনো রকম অস্বচ্ছ ও ভ্রান্তধারণা নেই। পুত-পবিত্র বিশুদ্ধ মননশীলতার উৎকর্ষই সেখানে বিদ্যমান।

ত্রিপিটক হলো তিনটি পিটকের সমাহার। তিনটি পিটক হলো : ক. বিনয় পিটক, খ. সূত্র পিটক, এবং গ. অভিধর্ম পিটক। এখানে পিটক শব্দের অর্থ পেঁটরা, বাক্স, পেটিকা ইত্যাদি। অর্থাৎ যেখানে কোনো কিছু সংরক্ষণ করা হয়। বিনয় পিটক : বিনয় পিটক ত্রিপিটকের প্রথম গ্রন্থ। বুদ্ধ প্রবর্তিত সঙ্ঘের নিয়ম-কানুন, আচার-ব্যবহার, শাসন-অনুশাসনই বিনয় পিটকের মূল বিষয়বস্তু। এখানে 'বিনয়' শব্দটি পারিভাষিক যার অর্থ নিয়মানুবর্তিততা, নৈতিক এবং মানসিক শিক্ষা। বুদ্ধ ছিলেন সুবিবেচক। ভিক্ষুসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পর থেকে তিনি কোনো রকম নিয়ম-কানুন বিধি-বিধান ভিক্ষুদের উপর সরাসরি চাপিয়ে দেননি। যখন ভিক্ষুরা কোনো একটি ঘটনা সংগঠিত করে বুদ্ধ তা নিজে ঘটনাটির কারণ অনুসন্ধান করে দেখেছেন ভিক্ষুরা তার জন্য কতটুকু দায়ী। যখন অপরাধ হয়েছে বুঝতে পেরেছেন তখন বুদ্ধ অনুশাসন করে দিলেন। বুদ্ধ নিজে অনুভব করতে পারলেন যে, আচার সংহিতা ছাড়া কোনো বড় সংস্থা টিকে থাকতে পারে না। তাই তিনি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে অনুসরণ করে সঙ্ঘের জন্য প্রণয়ন করলেন আচার সংহিতা। তিনি একসঙ্গে তা সম্পাদন করেননি। একটি একটি করে শিক্ষাপদ তৈরী করে সমগ্র বিনয় পিটক প্রতিষ্ঠা করেন। বিনয় পিটকে তিনটি গ্রন্থ। যথা : ক. সুত্ত বিভঙ্গ (পারাজিকা এবং পাচিত্তিয়া), খ. খন্ধক (মহাবর্গ এবং চূল্লবর্গ), গ. পরিবার পাঠো। সূত্র পিটক : ত্রিপিটকের দ্বিতীয় ভাগ হলো সূত্র পিটক। এতে বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্ব ও তার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং গৃহীদের প্রতি বুদ্ধের উপদেশ ইত্যাদি নিয়েই সূত্র পিটক। তাছাড়া শীল, সমাধি এবং প্রজ্ঞা, আর্যসত্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি, নির্বাণ সবই সূত্র পিটকে সুব্যাখ্যাত হয়েছে। এছাড়াও প্রাক্ বৌদ্ধযুগের ধর্মীয় বিশ্বাস কিংবা মতবাদ, দার্শনিক চিন্তা-চেতনা এবং বুদ্ধকালীন ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক বিবরণের উপর আলোকপাত করা হয়েছে সূত্র পিটকে।
সূত্র পিটকে পাঁচটি গ্রন্থ। ক. দীর্ঘ নিকায় (তিন খণ্ড) খ. মধ্যম নিকায় (তিন খণ্ড), গ. সংযুক্ত নিকায় (পাঁচ খণ্ড), ঘ. অঙ্গুত্তর নিকায় (পাঁচ খণ্ড) এবং খুদ্দক ব ক্ষুদ্র নিকায় (পনেরটি গ্রন্থ : ১. খুদ্দক পাঠ, ২. ধর্মপদ, ৩. উদান, ৪. ইতিবুত্তক, ৫. সূত্র নিপাত, ৬. বিমান বত্থু, ৭. পেতবত্থু, ৮. থের গাথা, ৯. থেরী গাথা, ১০. জাতক, ১১. নিদ্দেস [ক. মহানিদ্দেস এব খ. চুল্লনিদ্দেস], ১২. পটিসম্ভিদা মার্গ, ১৩. অপদান, ১৪. বুদ্ধ বংশ এবং ১৫. চরিয়া পিটক। অভিধর্ম পিটক : ত্রিপিটকের তৃতীয় ভাগ কিংবা শেষভাগ হলো অভিধর্ম পিটক। বুদ্ধের জীবদ্দশায় বুদ্ধবাণীসমূহ ত্রিপিটকে বিভক্ত ছিল না। তখন 'ধর্ম-বিনয়' নামেই প্রচলিত ছিল। 'বিনয়' হচ্ছে বুদ্ধ প্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসঙ্ঘ এবং ভিক্ষুণী সঙ্ঘের নিয়ম-কানুন বিষয়ক বিধিবিধান। বিনয়কে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট বুদ্ধবচনকে 'ধর্ম' বলা হতো। ধর্মকেই সূত্রপিটক এবং অভিধর্ম পিটক দুইভাগে বিভাজন করা হয়েছে। অত্রএব, 'অভি' উপসর্গ যোগে 'ধর্ম' শব্দ যোগ করে অর্থবোধক পদ 'অভিধর্ম' গঠিত হয়। 'অভি' উপসর্গের অর্থ অতি বা অধিকতর এবং 'ধর্ম' শব্দের অর্থ চিন্তনীয় বিষয়। এখানে 'অভি' উপসর্গ দিয়ে এটাই বোঝানো হয় যে, সূত্র পিটকে যে সমস্ত বিষয় আলোচনা করা হয়েছে অভিধর্ম পিটকে তারই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিস্তারিত ও বিশ্লেষণমূলক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে। বিষয়ের দিক দিয়ে সূত্র পিটক এবং অভিধর্ম পিটকের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। পার্থক্য রয়েছে পিটক দুটির আকৃতিতে। বিভিন্ন বিষয়ের বিশ্লেষণ ও শ্রেণীবিভজান অভিধর্ম পিটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অভিধর্ম পিটককে সূত্র পিটকের পরিপূরক বলা যায়। সূত্রকেই বৌদ্ধ ঐতিহ্যে অভিধর্মের ভিত্তি বলা হয়। অভিধর্ম পিটকে সাতটি গ্রন্থ। যেমন : ক. ধর্মসঙ্গণি, খ. বিভঙ্গ, গ. ধাতুকথা, ঘ. পুদগলপ্রজ্ঞপ্তি, ঙ. কথাবত্থু, চ. যমক (দুই খণ্ড)এবং ছ. পট্ঠান (পাঁচ খণ্ড)।

সুতরাং বলা যায়, বুদ্ধের বাণী যে আধারে সংরক্ষিত রয়েছে তাকেই পিটক বলা হয়। ত্রিপিটকের মোট গ্রন্থ বত্রিশ। স্বতন্ত্র নামানুযায়ী সংখ্যাটি নিরূপন করা হয়। তবে, মোট গ্রন্থের সংখ্যা বাহান্ন। কারণ হিসেবে দেখা যায়, কোনো কোনো গ্রন্থের বিষয়বস্তু সমাপ্ত হয় দুই খণ্ডে, আবার কোনোটি তিন খণ্ডে, কোনোটি পাঁচ কিংবা ছয় খণ্ডে। ত্রিপিটক সংকলনের পরবর্তী যুগে ভারতবর্ষে, শ্রীলংকা (প্রাচীন নাম সিংহল), মায়ানমান (পূর্বনাম ব্রহ্মদেশ), থাইল্যান্ড (পূর্বনাম শ্যামদেশ) এবং কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশে ত্রিপিটকের গ্রন্থগুলোর অর্থকথা বা টীকা গ্রন্থ, ভারত ও শ্রীলংকার (সিংহলের) ইতিহাস সম্পর্কিত গ্রন্থ এবং বুদ্ধের জীবনচরিতমূলক কাব্য গ্রন্থ রচিত হয়। এই সকল

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ভৌগোলিক শিক্ষাব্যবস্থার উপর যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। এভাবে ত্রিপিটককে অবলম্বন করে আরো অসংখ্য অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়। ত্রিপিটক বহির্ভূত গ্রন্থসমূহকে Non Canonical Text বলা হয়। নিম্নোক্তভাবে ত্রিপিটক বহির্ভূত গ্রন্থসমূহকে বিভাজন করা যেতে পারে। ক. অর্থকথা পূর্ববর্তী গ্রন্থ, খ. অর্থকথা বা টীকা গ্রন্থ, গ. বংশসাহিত্য বা ইতিহাস আশ্রয়ী কাব্যগ্রন্থ, ঘ. সারগ্রন্থ, সংকলন গ্রন্থ, ঙ. অন্যান্য কাব্য গ্রন্থ ও গদ্য গ্রন্থ এবং ছ. ব্যাকরণ, অভিধান, ছন্দ ও অলঙ্কার। ত্রিপিটকের অন্তর্গত গ্রন্থসমূহকে ইংরেজিতে Canonical text বলা হয়। ত্রিপিটক অন্তর্গত এবং বহির্ভূত গ্রন্থসমূহকে নিয়ে গড়ে উঠে পালি সাহিত্য। এতে নৈতিক জীবনবিধান প্রণালী, প্রাত্যহিক জীবনের করণীয় কর্ম, জীবনবোধের ধারণা, সম্প্রীতি-সদ্ভাব, কল্যাণকর ও শান্তিময় পৃথবী গড়ার অনন্য সাধারণ উপদেশ ও নিদের্শনা এখানে রয়েছে।

সুদূর অতীতকাল থেকে পালি সাহিত্য মানববিদ্যার পঠন-পাঠনে অবদান রেখে চলেছে এখনো বর্তমান। সাহিত্যটির ইতিহাস গৌরবামণ্ডিত যার গুরুত্ব ও ব্যাপকতা পৃথিবীর অন্যান্য যে কোনো সাহিত্যের সাথে তুলনীয়।। সেই সাহিত্যের প্রতিভার পুনর্জাগরণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সুধী সমাজের প্রয়াস লক্ষণীয়। চিন, জাপান, কোরিয়া মায়ানমার, শ্রীলংকা, কম্বোডিয়া, মঙ্গোলিয়া, ভিয়েতনাম, লাওস, থাইল্যান্ড, ভূটান প্রভৃতি এশিয়া ও বিশ্বের প্রগতিশীল রাষ্ট্রে এটির ব্যাপক চর্চা ও গবেষণা হয়। মানবিক মূল্যবোধ উন্নতসমাজ বিনির্মানেও এটির রয়েছে অত্যুজ্জ্বল ভূমিকা। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, পালি সাহিত্য মানবিক সাহিত্য। মানবতার বাতাবরণে কিংবা সদ্ভাব-সম্প্রীতির মেলবন্ধনে সবাইকে আবদ্ধ করতে সহায়তা করে এটি। পালি সাহিত্যে মানবাধিকার প্রসঙ্গ সমীক্ষা নিয়ে এ যাবৎ মূল্যায়নধর্মী কোনো গবেষণা সম্পাদিত হয়নি।

পালি সাহিত্যে তথ্য-উপাত্ত কিংবা তথ্য উপাদান আদর্শিক সমাজবিনির্মানে সহায়ক। সুতরাং আমি পালি সাহিত্য চর্চাকে আরো বেগবান করার জন্য 'পালি সাহিত্যে মানবাধিকার প্রসঙ্গ সমীক্ষা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনায় ব্রতী হয়েছি। বক্ষমান অভিসন্দর্ভে পাঁচটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায় 'বুদ্ধের শিক্ষায় মানবাধিকার : বিষয় ও প্রকরণ'। দ্বিতীয় অধ্যায় 'মানবতার সাধনায় বুদ্ধের শিক্ষা : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য'। তৃতীয় অধ্যায় 'বুদ্ধের নারী স্বাধীনতা : একটি পর্যেষণা'। চতুর্থ অধ্যায় 'মানব কল্যাণে বুদ্ধের পঞ্চশীল'। পঞ্চম অধ্যায় 'বুদ্ধের শিক্ষায় সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য : প্রায়োগিক ব্যবহারের স্বরূপ অন্বেষণ'।

প্রতিটি অধ্যায় যুক্তিনির্ভর তথ্যে এবং তত্ত্বে প্রাসঙ্গিক বিষয় অত্যন্ত সহজ, সরল ও সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। সবশেষে রয়েছে সমগ্র আলোচনার সারাৎসার 'উপসংহার' অংশ। তাছাড়া বর্তমান অভিসন্দর্ভ রচনায় যে সব গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে 'গ্রন্থপঞ্জি' অংশে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বুদ্ধের শিক্ষায় মানবাধিকার : বিষয় ও প্রকরণ

বুদ্ধ বোধিজ্ঞান লাভ করার পর বিভিন্নভাবে বহুজনের সুখ ও বহুজনের কল্যাণ কামনায় গঠনমূলক উপদেশ প্রদান করেন। তাঁর উপদেশ কিংবা ধর্মবাণীতে মানবাধিকার সম্পর্কিত প্রচুর তথ্য ও তত্ত্ব রয়েছে। তাঁর ধর্মের মূলশিক্ষা অহিংসা।[১] তিনি তাঁর নবপ্রবর্তিত ধর্মে রাজা-শ্রেষ্ঠী, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়, বৈশ্য-শূদ্র, ধনী-গরীব, দাস-দাসী, অস্পৃশ্য, চণ্ডাল, বারবণিতাসহ সবাইকে স্থান করে দিয়ে তাদের অধিকারের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শন করা হয়েছে। জাতিগোত্র-ধর্মবর্ণনির্বিশেষে অখণ্ড পৃথিবীতে সবাই সমান। সকলকে তিনি এক এবং অভিন্ন করে দেখেছেন। বলেছেন সর্বক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকারের কথা। তিনিই সর্বপ্রথম দেখিয়েছেন মানবসমাজ অখণ্ড এবং বিশ্বের সকল মানুষ অবিচ্ছেদ্য এবং পরম আত্মীয়তায় আবদ্ধ। সকলের সংঘে প্রবেশাধিকার দিয়ে তিনি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছেন এখনো। তাঁর ধর্মবিশ্বাসকে আত্মোন্নয়ন ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার এক অনন্য সাধারণ উপায় হিসেবে দেখিয়েছেন তিনি। সকল প্রকার বর্ণ-বৈষম্য, জাতিভেদ প্রথার বিলোপ সাধন, মানবমনের উন্নয়ন এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি-সদ্ভাব ও সৌভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করাই হলো বুদ্ধের অন্যতম শিক্ষা।

মানবাধিকার ও প্রাসঙ্গিক কথা

মানবাধিকার বর্তমান বিশ্বে নৈতিকতায়, আইনি এবং রাজনৈতিক চিন্তা-দর্শনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে নিঃসন্দেহে। 'মানবাধিকার' শব্দটি 'মানব' এবং 'অধিকার' দুটি অর্থবাচক শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। 'মানব' বলতে সচরাচর মানবগোষ্ঠীকে বোঝায়। 'অধিকার' বলতে মানবগোষ্ঠীর যথার্থ প্রাপ্যতাকে বোঝায়। ইংরেজি 'right'কে বাংলায় 'অধিকার' বলা হয় যা Latin rectus (meaning straight) থেকে উৎপত্তি। rectus শব্দটি Greek orektos-এর সমার্থক যার অর্থ stretched out or upright. এ বিষয়ে Richard Dagger-এর উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ; `The pattern is for the notion of straightness to be extended from the physical realm to the moral from rectus to rectitude, as it were. [২] অধিকারগুলো মানুষের মূল্য ও মর্যাদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং এ সকলের জন্মগত অধিকার।[৩] সামাজিক প্রাণী হিসেবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে স্বীকৃত মানুষের নৈতিক অধিকারের সাথে অস্তিত্ব রক্ষা, সহজাত ক্ষমতার সৃজনশীল বিকাশ এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের একান্তভাবে প্রয়োজনীয় কতিপয় মৌলিক অধিকারকে বলা হয় মানবাধিকার।[৪]

Dhaka University Institutional Repository

জন্মগতভাবে মানুষ কিছু অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে আর অধিকারগুলোর সঠিক প্রাপ্যতার নাম-ই হচ্ছে 'মানবাধিকার'। অন্যভাবে বলা যায়, বেঁচে থাকার জন্য যেসব অধিকার থাকা আবশ্যক সে সব প্রাপ্য অধিকারকে 'মানবাধিকার' বলা হয়। মানবাধিকারগুলো মানুষের এক ধরনের মৌলিক চাহিদা যার মাধ্যমে মানুষ তার স্ব-স্ব অবস্থানে থেকে স্বাধীনভাবে মতাধিকার বা মতামত প্রকাশ করতে পারে। মানুষের অধিকার সম্পর্কে প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে সুস্পষ্ট ধারণা রয়েছে। পরবর্তী সময়ে মানুষের বিভিন্ন অধিকার নিয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। প্রণয়নকৃত নীতিমালায় সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মানবাধিকারে মানুষের প্রাপ্য অধিকারের কথা বলা হয়। এক্ষেত্রে বলা যায়, মানুষ যদি তার আত্মমর্যাদা নিয়ে বাঁচতে না পারে তবে মানবাধিকারের কোনো মানবিক গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না।[৫]

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময় শাসক কর্তৃক প্রজাসাধারণ অত্যাচার, নির্যাতিত এবং নিপীড়িত হলে বিবেকবান, সুশীল, প্রাজ্ঞজনদের চিন্তাধারার আলোকে বিপ্লবী নায়কগণ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম আইন প্রণয়ন করেন। এই সব দলিলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দলিলের নামসমূহ হলো : ইংল্যাণ্ডে ১২১৫ খ্রিস্টাব্দে 'ম্যাগনাকার্টা', ব্রিটেনে ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দে 'পিটিসন অব রাইট', ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে 'আমেরিকান ডিক্লারেশন অব ইন্ডিপেন্ডস্' এবং ফ্রান্সে ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ডিক্লারেশন অব রাইট্স অব ম্যান এণ্ড অব দি সিটিজেন ইত্যাদি অন্যতম। এ ধরনের ঘোষণাপত্রকে মানবাধিকারের প্রাথমিক দলিল হিসেবে বিবেচিত করা হয়। বর্তমান মানবাধিকার বলতে সে সব অধিকারকে বোঝায় যে সব অধিকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক ঘোষণায় ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার (Universal declaration of Human Rights) নীতিবদ্ধ হয় যেখানে একটি প্রস্তাবনায় ৩০টি অনুচ্ছেদ কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থে ৬৭টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যুগোপযোগী ঘোষণা সংকলিত হয়।[৬]

মানবাধিকারকে পূর্বে Rights of Man বলা হতো।[৭] মানবাধিকারকে কিছুকাল পূর্বেও পুরুষের অধিকার বা প্রকৃতির অধিকার বলা হতো। এর মাধ্যমেই শুধুমাত্র অধিকারগুলো পুরুষের বোঝানো হয়-নারীদের নয়। নারী-পুরুষের দূরত্ব-বৈষম্য দূরীকরণে দার্শনিক Thomas Paine মানবাধিকার শব্দটির বহুল প্রায়োগিক ব্যহারের স্বপ্ন দেখেন। এটি এমন কতগুলো সহজাত অধিকার যেগুলো ব্যতীত মানুষ কখনো সত্যিকার মানুষ হিসেবে জীবনধারণ করতে পারতো না। Thomas Paine সম্ভবত প্রথম ব্যক্তি যিনি ফ্রান্সের জাতীয় পরিষদ কর্তৃক ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে গৃহীত মানুষের অধিকার সম্পর্কিত ফরাসি ভাষায় ঘোষণাটি ইংরেজি অনুবাদে 'মানবাধিকার' (Human Rights) পদটি ব্যবহার করেন। পরবর্তীসময়ে মিসেস এলিনর রুজভেল্টের প্রস্তাব অনুসারে জাতিসংঘের সাধারণ

Dhaka University Institutional Repository

পরিষদ কর্তৃক ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর মানুষের অধিকার সংক্রান্ত সর্বজনীন ঘোষণায় 'মানবধিকার' পদটি ব্যবহৃত হয়েছিল।[৮]

অধিকারসমূহ মানুষের জন্মগত অধিকার। এগুলো জাতিধর্মবর্ণ ও নারী-পুরুষনির্বিশেষে পৃথিবীর সব মানুষের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। 'অধিকার' নিয়ে আমরা কম বেশী সবাই জ্ঞাত। মানবাধিকারের যখন আলোচনা-পর্যেষণা হয় তখনই অধিকার পদটি বিশ্লেষণ করা দরকার। এখানে অধিকারকে বিশেষভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। এ বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে ; 'অধিকার হচ্ছে ব্যক্তি মানুষের প্রয়োজনে আপন আপন স্বার্থ সুরক্ষার জন্য বিশেষ সুবিধা আদায় অথবা সংরক্ষণ করার ন্যায্য দাবি। মানুষের মান-সম্মান এবং আত্ম মর্যাদাবোধ অক্ষুন্ন রাখার জন্য তাই অধিকার সমুন্নত রাখা একান্ত অপরিহার্য'। বিশিষ্টজনরা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে মানবাধিকার সম্পর্কে কথা বলেছেন। এখানে মানবাধিকারের স্বরূপ জানার জন্য কিছু কিছু মন্তব্য তুলে ধরা হলো । যেমন : মানবাধিকার সম্পর্কে বিশিষ্ট্য মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ Sankar Sen বলেন ;

> Human rights have been described as `those minimal rights that every individual must have be by virtue of his being' a member 0f human family irrespective of any other consideration. They are based on mankinds demand for life in which the inherent dignity of human being will receive respect and protection. [১০]

Gealirth Alan তাঁর `Human Rights Essays on Justification application' নামক গ্রন্থে বলেন ;

> Human rights are specious or moral rights in which all persons are equal simply because they are human. Such rights can be arguable or justification through a universal set of valid moral principles.[১১]

Dr. Talpan Biswal বলেন ;

> The Fundamental norm governing the concept of human rights is that of respect of human personality and its absolute worth, regardless of colour, race, sex and religion or other considerations. Human rights

Dhaka University Institutional Repository

are widely considered to be those fundamental moral rights of the person that are necessary for a life with human dignity.[১২]

`Human Rights: Issues and International Law' নামক গ্রন্থে মানবাধিকার সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে দেখা যায় ;

Human rights have gradually evolved over the year and are based on mankind's measuring demand for life in which the inherent dignity and worth of each human being will receive respect and protection.[১৩]

মানবজীবনের সার্বিক বিষয়ের সাথে মানবাধিকার অঙ্গাঅঙ্গিভাবে সম্পর্কযুক্ত। এতে অনুমিত যে, মানব সত্ত্বার অস্তিত্বের মধ্যেই বোধ হয় 'অধিকার' পদ নিহিত রয়েছে। নিচে Universal declaration of human Rights-এর ৩০টি ধারার মধ্যে মানবাধিকার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ধারা[১৪] উপস্থাপন করা হলো –

ধারা - ১ : সকল মানুষ স্বাধীন এবং সমমর্যাদার ও সমাধিকার নিয়েই পৃথিবীতে জন্মলাভ করে। তারা বিবেকসম্পন্ন এবং চিন্তাশক্তির অধিকারী। সেজন্য একে-অপরের প্রতি আচরণ হওয়া উচিত ভ্রাতৃত্ব সুলভ।

ধারা - ২ : জাতিধর্মবর্ণ, ভাষা, রাজনৈতিক অন্যান্য মতাদর্শী, ধনী, গরীব ও জন্মসূত্রে নির্বিশেষে সকলেই ঘোষণা পত্রে বর্ণিত অধিকার এবং স্বাধীনতার সমঅংশীদার।

ধারা - ৩ : প্রত্যেক ব্যক্তিরই জীবনের নিরাপত্তা এবং মুক্ত জীবনযাপনের অধিকার রয়েছে।

ধারা - ৪ : কাউকে নির্যাতন করা যাবে না। অমানবিক যন্ত্রণা বা সাজা দেয়া যাবে না। কারো উপর মানবেতর অবস্থা চাপিয়ে দেয়া যাবে না।

ধারা ১৭ : ক. প্রতিটি মানুষই ব্যক্তিগত এবং যৌথ উভয়ভাবেই ধন সম্পত্তি অর্জনের অধিকারী।

খ. অনিয়মতান্ত্রিক ভাবে কোনো ব্যক্তিকেই তার উপর অর্জিত ধন সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

ধারা - ১৯: প্রত্যেক মানুষেরই স্বাধীনভাবে মতামত পোষণ এবং ব্যক্ত করার অধিকার রয়েছে। এ অধিকারের মধ্যে রয়েছে নির্বিঘ্নে স্বীয় মতামত তুলে ধরা এবং রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি গ্রহণ এবং গ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করার অধিকার।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা -২৪ : কাজের সময় বিরতি ও বিশ্রাম নেয়া, বেতনসহ ছুটির সুবিধা, সপ্তাহে নির্দিষ্ট সময় কাজ করার অধিকার সবার রয়েছে।

১. বুদ্ধের শিক্ষায় মানবাধিকার স্বরূপ অন্বেষণ

মানবাধিকারের মর্মবাণী হলো জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ, দলিত-অদলিত, সাদা-কালো সকল মানুষের জন্য সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা। অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠা ছিল বুদ্ধের মহাজীবনের অন্যতম সামাজিক আন্দোলন। মানবাধিকারের স্বরূপ সম্পর্কে বুদ্ধবাণীর অনন্য সাধারণ মূলকথা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তিতে দেখা যায়। তিনি তাঁর 'বুদ্ধদেব' নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে বলেন ;

> বর্ণে বর্ণে, জাতিতে জাতিতে, অপবিত্র ভেদবুদ্ধির নিষ্ঠুর মূঢ়তা ধর্মের নামে আজ পঙ্কিল করে তুলেছে এই ধরাতল ; পরস্পর হিংসার চেয়ে সাংঘাতিক পরস্পর ঘৃণায় মানুষ এখানে পদে পদে অপমানিত। সর্বজীবে মৈত্রীকে যিনি মুক্তির পথ বলে ঘোষণা করেছিলেন সেই তারই বাণীকে আজ উৎকণ্ঠিত হয়ে কামনা করি এই ভ্রাতৃবিদ্বেষকলুষিত হতভাগ্য দেশে। পূজার বেদীতে আবির্ভূত হোন মানবশ্রেষ্ঠ, মানবের শ্রেষ্ঠতাকে উদ্ধার করবার জন্যে। ভগবান বুদ্ধ একদিন রাজসম্পদ ত্যাগ করে তপস্যা করতে বসেছিলেন। সে তপস্যা সকল মানুষের দুঃখ- মোচনের সংকল্প নিয়ে। এই তপস্যা মধ্যে কি অধিকার ভেদ ছিল ? কেউ ছিল কি ম্লেচ্ছ? কেউ ছিল কি অনার্য? তিনি তাঁর সবকিছু ত্যাগ করেছিলেন দীনতম মূর্খতম মানুষের জন্যে। তার সেই তপস্যার মধ্যে ছিল নির্বিচারে সকল দেশের সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা।[১৫]

পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য (অর্থাৎ ধর্মবর্ণনির্বিশেষে) এ সমস্ত অধিকারসমূহ সমানভাবে প্রযোজ্য। বুদ্ধ যে সব বিষয়ে মানবাধিকারের কথা বলেছেন তার একটি ধারণা নিচে উপস্থাপন করা হলো :

১. ক. বাচাঁর অধিকার বা জীবনের অধিকার

মানবাধিকারে সকল মানুষের সমানভাবে প্রাপ্যতার কথা উল্লেখ রয়েছে। মানবাধিকার সম্পর্কিত ৩ নং সংখ্যক অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে ; প্রত্যেকের জীবনে স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তা অধিকার রয়েছে।[১৬] এখানে জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। জীবন বলতে কোনো রকম বেঁচে থাকাকে বোঝায় না। জন্মগ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

করলে মৃত্যুবরণ করতে হবে সেটাই স্বাভাবিক। মৃত্যুর স্বাদ সবাইকে নিতে হবে। পুরো পৃথিবীর মানুষ একমত যে. মানুষ মরণশীল। এটি চিরন্তন এবং চিরশ্বাশত বাণী। পৃথিবীতে সুন্দর সুখীজীবন সবাই কামনা করে। সুন্দর-সুষ্ঠভাবে বেঁচে থাকার অধিকারই জীবনের অধিকার। বুদ্ধ জীবনের অধিকার সম্বন্ধে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপদেশ প্রদান করেছেন। সংহার

মানুষ বাঁচতে চায়। বাঁচার অধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার। অধিকার আদায়ে তাকে অবিরাম কিংবা আমৃত্যু যুদ্ধ করতে হয়। বাঁচার তাগিদে কখনো সফল হওয়ার জন্য বা কখনো কীর্তিমান হওয়ার জন্য। বুদ্ধ মানুষের নৈতিক আচরণকে পরিশুদ্ধ করার জন্য পঞ্চশীল[১৭] পালন করার উপদেশ দিয়েছিলেন। পঞ্চশীল অর্থাৎ পাঁচটি নিয়ম-নীতির প্রথমটি হলো প্রাণিহত্যা থেকে বিরতি। প্রাণিহত্যা বলতে ইচ্ছাপূর্বক সুস্থ মস্তিষ্কে যে কোনো প্রাণীকে সংহার বোঝায়। হত্যা করা অমানবিকতো বটেই আইনের দৃষ্টিতে জঘন্যতম অপরাধ। কাজেই যে কোনো প্রকার প্রাণিহত্যা মানবিক হতে পারে না। মানুষ জন্ম থেকে সুখবিলাসী। সে নিজের সুখের জন্য অপরাপর প্রাণীকে হিংসা করে। এমনকি অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অন্যপ্রাণীকে শাস্তি দিতে, আঘাত করতে এমনকি হত্যা করতে কুণ্ঠিতবোধ করে না, মানুষ ভুলে যায় তার যেমন বৃদ্ধিপ্রাপ্তি ও বাঁচার অধিকার আছে সুখ–শান্তি পাওয়ার বাসনা আছে তেমনি সমস্ত প্রাণী জগতের অনুরূপ কামনা বাসনা রয়েছে। তাই বুদ্ধ শুধু মানুষের জন্য নয় সমস্ত প্রাণী জগতের কল্যাণার্থে ঘোষণা করেছিলেন কোনে প্রাণিহত্যা করো না আর প্রাণিহত্যার কারণও হইও না। খুদ্দক নিকায়ের ধর্মপদের[১৮] দণ্ডবর্গের ১৩০ নং সংখ্যক সূত্রে বুদ্ধ বলেন ;

সব্বে তসন্তি দণ্ডস্স, সব্বেসং জীবিতং পিযং,

অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেয্য ন ঘাতযে।

অর্থাৎ, দণ্ডকে সকলেই ভয় করে, জীবন সকলেরই প্রিয়। সুতরাং নিজের সাথে তুলনা করে কাউকে হত্যা বা আঘাত করবে না।

করণীয় মৈত্রী সূত্রে[১৯] বুদ্ধ এ বিষয়ে আরো উল্লেখ করেছেন;

মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে

এবম্পি সব্ব ভূতেসু মানসং ভাবযে অপরিমাণং।

অর্থাৎ, মাতা যেমন নিজের গর্ভজাত একমাত্র পুত্রকে আপন জীবন দিয়েও সকল প্রকার বিপদ আপদ হতে রক্ষা করেন, তেমনি সমস্ত প্রাণীর প্রতি সীমাহীন প্রীতিময়-স্নেহময় মৈত্রীভাব পোষণ করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

'করণীয় মৈত্রী সূত্রে' বুদ্ধের সর্বজনীন উপদেশ প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে ; জগতের সকল দিকে উপরে-নীচে, পার্শ্বে চারিদিকে যে সকল প্রাণীসমূহ আছে, তারা বাঁধাহীন ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অর্থাৎ শত্রুতা বর্জিত হোক।[২০] 'অয়কূট জাতক' পাঠে জানা যায়, বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব অবস্থায় ভেরীবাদ দ্বারা ঘোষণা করেছিলেন যে, কেউ প্রাণিহত্যা করতে পারবে না।[২১] পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে ছাগ ও মেষ ইত্যাদি বলি প্রদান প্রথার বিরোধিতা প্রসঙ্গে বুদ্ধ মৃতকভক্ত জাতকে বলেছেন ; বলি প্রদান করার জন্য নিয়ে আসা ছাগের মৃত্যুকে অবলম্বন করে এই জাতকে বোধিসত্ত্ব সত্যশিক্ষা প্রচার করেছেন এভাবে ;

জানে যদি জীব কি কঠোর দণ্ড জন্মে জন্মে ভোগ
হিংসার কারণ তবে কি সে কভু জীবের জীবন হরে।[২২]

এখানে দেখা যায়, জীব যদি জানতে পারে প্রাণিহিংসার জন্য জন্মে জন্মে কঠোর দণ্ডভোগ করতে হয় তবে কি সে কখনো জীবের প্রাণ সংহার করতে পারে।

পালি বর্হিভূত সাহিত্যের (Non canonical text) অন্তর্গত 'সদ্ধম্মোপায়ন' নামক গ্রন্থে[২৩] দেখা যায় ; হিংসা অল্প আয়ুর কারণ, বহু ব্যাধির কারণ, বিয়োগ দুঃখ বাহুল্যের কারণ এবং উদ্বিগ্ন থাকার কারণ। মল্লিকা সূত্রে[২৪] উল্লেখ রয়েছে ; সব দিকে নিজের চেয়ে প্রিয়তর কোথাও মেলেনি। পরের বা অন্যান্য সবার কাছে তেমনিই নিজ খুব প্রিয়। আত্মকামী বা আত্মহিতৈষীর পরকে হিংসা করা কখনো উচিত নয়। আয়াচিত্ত জাতক[২৫]- এ প্রাণিহত্যার দ্বারা দেবতার নিকট মানত শোধ করার ব্যর্থ তা ঘোষিত হয়েছে। জাতকটিতে বৃক্ষদেবতাকে দেখা যায় এভাবে ;

মুক্তি যদি চা জীব, পরলোক কথা যেন থাকে তব মনে অনুক্ষণ
এ মুক্তি তোমার শুধু, শুন হে মুঢ়মতি, দৃঢ়তর বন্ধন কারণ
জ্ঞানী ধর্মপরায়ণ এহেন মানবগণ আত্মমুক্তি লভে সযতনে
অজ্ঞানী পাষণ্ড যারা হিংসা জীবে অহরহ মুক্তিভ্রমে লভিছে বন্ধনে।

এখানে বলা হচ্ছে, যারা জ্ঞানী ও ধার্মিক তাঁরা জ্ঞান দ্বারা আত্মমুক্তি লাভে সচেষ্ট হয়। যারা অজ্ঞানী তারা মূঢ়মতি পরায়ণ। তাই তারা ভূল করে জীবহিংসা করে ও যাগ-যজ্ঞ করে মুক্তির পরিবর্তে প্রতিনিয়ত বন্ধনই লাভ করে।

Dhaka University Institutional Repository

ত্রিপিটকের অন্তর্গত সূত্র পিটকের 'সংযুক্ত নিকায়' নামক গ্রন্থের 'অহিংসক সূত্রে'-এ বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে ; 'যে কায়-বাক্য-মনে হিংসা করে না, পরের অশুভ চিন্তা করে না, অমঙ্গল কামনা করে না সে ব্যক্তিই অহিংসা পরায়ণ হয়' ।[২৬] সর্বতোভাবে প্রাণাতিপাত হতে সর্ব প্রকারে বিরত হওয়ার কথা বলেছেন। তিনি বলেন ; কায়-বাক্য এবং মনে কারো মনে দুঃখ না দেওয়াই হলো বুদ্ধগণের উপদেশ।[২৭] তিনি আরো বলেন ; যে ব্যক্তি হত্যা করে না, অপরকে দিয়ে হত্যা করায় না, নিজে পীড়া দেয় না, অপরকে দিয়ে পীড়া দেওয়ায় না- যার সকল প্রাণির প্রতি মৈত্রীভাব আছে তার প্রতি কারো বৈরীভাব থাকে না।[২৮]

এগুলো বুদ্ধের চিরশাশ্বত চিরোজ্জ্বল বাণী। বুদ্ধের বাণীসমূহ যে কতো বিশাল, মহান ও ব্যাপক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রাণিহিংসা ত্যাগ করে যিনি অন্তরে শুধু মাত্র মানুষ নয় সর্ব জীবের প্রতি মায়া-মমতায় মৈত্রী ও করুণায় অনুপ্রাণিত হন, তার পক্ষে প্রাণিহত্যা অসম্ভব। বর্তমান বিশ্বে নারী-পুরুষ ও শিশু যেভাবে হত্যার শিকার হচ্ছে, পশু পশুর দ্বারাযতটুকু হত্যা হয় না মানুষ মানুষের দ্বারা তারচেয়ে বেশি হত্যা হচ্ছে। এই বর্বরোচিত জগন্য কাজ হলো সমাজের অন্যতম অশুভ দিক। বুদ্ধের পঞ্চশীল বা পঞ্চাচরণের প্রথম শিক্ষা প্রাণিহত্যা না করা। এ ধরনের নৈতিক আচার-আচরণে যাপিতজীবনের অধিকার কিংবা বাঁচার অধিকার স্পষ্টভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে। এর মাধ্যমে জীবন সুন্দর ও আলোকিত হয়। আলোকিত জীবন দিয়েই মানবতা, মনুষ্যত্ব ও মানবপ্রেম জাগ্রত হয়।

প্রতিটি মানুষের জীবনের নিরাপত্তা কামনা করে। এটি পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয়ভাবেই সর্বত্রে। আজ থেকে প্রায় ২৫৫৬ বছর আগে বুদ্ধ কাউকে প্রতিহিংসা এবং প্রতিঘাত না করার কথা বারংবার উচ্চারণ করেছেন। 'ধর্মপদ' গ্রন্থের -এর যমক বর্গের ৫নং সংখ্যক সূত্রে[২৯] বুদ্ধ বলেছেন ;

নহি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো।

অর্থাৎ, পৃথিবীতে শত্রুতার দ্বারা কখনই শত্রুতা দমন করা যায় না, মিত্রতার দ্বারা শত্রুতার উপশম করা যায়। ইহাই সনাতন ধর্ম।

জগতের প্রতিটি কাজ কার্যকারণের দ্বারা সৃষ্টি হয়। কার্যটি না করলে কর্মটি কখনো সম্পাদিত হতে পারবে না বা কখনো হয় না। পরস্পরের মধ্যে সঙ্ঘাত সৃষ্টি না করে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের মাধ্যমে একে অপরকে নিরাপদে বসবাস করার সুযোগ দান করাই হচ্ছে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম মূল শর্ত। আচার্য দার্শনিক শান্তিদেব (আনুমানিক সপ্তম শতাব্দী) একজন মহাযানী বৌদ্ধ আচার্য। তিনি শিক্ষা সমুচ্চয়, সূত্র সমুচ্চয় এবং বোধিচর্যাবতার গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি মানবাধিকারের স্বার্থে মানবতার বিকাশে দুটি উপায়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন

Dhaka University Institutional Repository

উপায়। দুটি হলো : ক. পরাত্ম সমতা ধ্যান : পরকে এবং নিজকে সমান বা এক বলে মনে করা এবং খ. পরাত্ম পরিবর্তন ধ্যান : পরকে নিজ এবং নিজকে পর বলে ধ্যান করা।[৩০] উপরি-উক্ত দুটি ভাবনার মধ্যে যে পরিমাণে গভীরতা লাভ করবে তার জীবনে ততোধিক পরিমাণে মানবতার বিকাশ ঘটবে।

১. খ. সমতা নিশ্চিতকরণ

প্রাচীন ভারতে ধর্মের নামে যাগযজ্ঞ ও পশুবধ, সামাজিক সূচিতা রক্ষার মিথ্যা স্বার্থে নিম্নবর্গের মানুষের প্রতি চরম অবহেলা করা হতো। এক শ্রেণীর উচ্চবর্গ লোকের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ সার্বিক নৈতিক মূল্যবোধের একান্ত অভাব ছিল। বুদ্ধ ব্রাহ্মণ্যধর্মে বর্ণিত এ রকম আচরণমালা কিংবা বিধি-বিধানগুলো তাঁর জীবদ্দশায় সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছেন।[৩১] ব্রাহ্মণ্যধর্মের বৈপ্লবিক ও প্রতিবাদী ধর্ম হিসেবেই বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব হয়। সমাজে যাগযজ্ঞ, পশুবলি, ব্যয়বহুল পূজা-পার্বণ এগুলো মানুষকে ত্রাণ করতে বা মুক্তি দিতে পারে না বলে বুদ্ধ উল্লেখ করেন। বুদ্ধ সমাজজীবনের প্রতিবন্ধকতাগুলো অনেকাংশে দূর করে জনসাধারণের জন্য গ্রহণযোগ্য, কল্যাণকর, মঙ্গলময়, সুখকর, জীবনযাপন পদ্ধতির উপায় নির্দিষ্ট করেছিলেন। তাঁর প্রবর্তিত ও প্রদর্শিত অহিংসা নীতির পেছনেও কল্যাণবোধ কাজ করে। বৌদ্ধধর্মে অহিংসা নীতির ওপর সবচেয়ে বেশী জোড় দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র প্রাণিহত্যা করলেই যে হিংসা মনে করা হতো তা নয়, দণ্ড কিংবা অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা কোনো প্রাণিকে আঘাত করাকেও হিংসা মনে করা হতো। মনে মনে কারো অনিষ্ট চিন্তা করা কিংবা ক্ষতি কামনা করা দ্বেষ করাও এক ধরনের হিংসা, কায়-বাক্য-মনে কোনো প্রকারে কোনো প্রাণীকে পীড়া দেওয়াও এক ধরনের হিংসা বটে।

অহিংসার প্রচার দ্বারা ক্ষমতার লোভ থেকে ব্যক্তি ও সমাজকে মুক্ত করার কথা বলেছেন বুদ্ধ। সমাজে গৃহপতি, শ্রেষ্ঠী প্রভৃতি শ্রেণীর উদ্ভবের ফলে এবং ক্ষত্রিয় শ্রেণীর একাংশ ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য মেনে নিতে না চাইলে এক নতুন ধর্মমতের প্রয়োজন দেখা দেয়। বুদ্ধ যজ্ঞ কণ্টকিত ব্রাহ্মণ্যধর্মকে অস্বীকার করেন এবং নৈতিক অনুশাসনকে সর্বোচ্চ স্থান প্রদান করেন। তিনি জাতিভেদ, চতুরাশ্রম অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করেন। বুদ্ধ তাঁর ধর্মকে সমাজের সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত প্রসারিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 'শুদ্ধিক সূত্রে' দেখা যায় ; আরদ্ধবীর্য নিত্যপরাক্রমশালী ব্যক্তি ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল আর পুষ্প নিক্ষেপক ঝাড়ুদার হোক সে ব্যক্তিই পরম বিশুদ্ধিতা লাভ করতে পারে।[৩২] তাঁর ধর্ম সকল শ্রেণী, পেশা, বর্ণ ও জাতির অন্তরকে স্পর্শ করে। তাঁর ধর্মবাণীতে পৃথিবীর সকল মানুষের সমতার কথা লক্ষ্য করা যায়। তিনি তীব্র বিরোধিতা করেছেন সকল প্রকার বর্ণপ্রথার ও বর্ণবৈষম্যের।

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধ মানবসমাজে সমতা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে উচ্চবর্ণ থেকে নিম্নবর্ণে প্রচলিত বর্ণ-বৈষম্য ও জাতিভেদ প্রথার বিরূদ্ধে দাঁড়িয়ে সবাইকে সমানভাবে গুরুত্ব দিয়ে মুক্তির উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। তিনি তাঁর সঙ্ঘ[৩৩] প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সকল মানুষের সমতা নিশ্চিত করেছেন। সংঘে জাতিভেদ জাত্যাভিমান না থাকার জন্য তিনি প্রথমে ক্ষৌরকার অর্থাৎ নাপিতের ছেলে উপালিকে দীক্ষা দান করেন।[৩৪] পরে অন্যান্য রাজপুত্র বা অন্যান্যদেরকে সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত করেন। এরূপ অনেক কাহিনি রয়েছে পালি বা বৌদ্ধ সাহিত্যে। সুনীত ছিল অত্যন্ত দরিদ্র ঘরের একজন সন্তান। প্রত্যেহ রাস্তা-ঘাট ঝাড়ু দেওয়া এবং ময়লা-আবর্জনা পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন করাই হলো তার প্রধান এবং অন্যতম কাজ। সে জন্য সে কখনো উচুঁকূলের লোকদের সংস্পর্শে আসতে পারেনি। তার অন্তর ছিল বিশুদ্ধ, কোমল, পুত-পবিত্র। একসময় বুদ্ধের সাথে সুনীতের সাক্ষাৎ হয়। বুদ্ধের নিকট থেকে সুনীত দীক্ষা গ্রহণ করে ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যে তিনি অর্হৎ ফল লাভ করেন।[৩৫] সুনীত-এর অধ্যাত্ম সাধনায় সিদ্ধিলাভের বিষয় উল্লেখ করতে গিয়ে বুদ্ধ বলেন ;

তপেন ব্রহ্মচরিযেন সংযমেন দমেন চ
এতেন ব্রাহ্মণো হোতি এতং ব্রাহ্মণমুত্তমন্তি।[৩৬]

অর্থাৎ, ইন্দ্রিয় সংযমে, শীল পরিপালনে, শীলরক্ষণে, প্রজ্ঞা সাধনে ও বিবিধ শ্রেষ্ঠ আচরণের দ্বারা যিনি ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করতে পেরেছেন তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ।

বুদ্ধ আরো বজ্রনিনাদে ঘোষণা করেন ;

ন চাহং ব্রাহ্মণং ব্রুমি, যোনিজং মত্তিসম্ভবং
ভোবাদি নাম সো হোতি, সচে হোতি সকিঞ্চনো।
অকিঞ্চনং অনাদানং অক্কোধনং বতবন্তং সীলবন্তং অনুস্সদং
দন্তং অন্তিমসারীরং তম্হং ব্রুমি ব্রাহ্মণং।[৩৭]

অর্থাৎ, জন্মের দ্বারা অথবা মাতার গর্ভে উৎপত্তির জন্য আমি কাউকেও ব্রাহ্মণ বলি না। সে ভোবাদি হতে পারে। সে ধনবান হতে পারে। যিনি অনাসক্ত, অক্রোধী, ব্রতবান, শীলবান, তৃষ্ণাহীন, শান্ত-দান্ত অন্তিম দেহধারী, তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

ত্রিপিটকের সূত্রপিটকের 'ধর্মপদ' নামক গ্রন্থের ব্রাহ্মণ বর্গে ব্রাহ্মণের স্বরূপ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। বুদ্ধ গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করলে যেমন ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না ; ক্ষত্রিয়ের গৃহে জন্মগ্রহণ করলে ক্ষত্রিয় হওয়া যায় না ; ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করলে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না ; অনুরূপভাবে বৈশ্য,

Dhaka University Institutional Repository

শূদ্র, চণ্ডাল, মেথর, অস্পৃশ্য প্রভৃতি গৃহে জন্মগ্রহণ করলে বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল, মেথর, অস্পৃশ্য হওয়া যায় না। কর্ম মানুষকে মহীয়ান করে তোলে। এ বিষয়ে তিনি বলেন ;

ন জটাহি ন গোত্তেন ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো

যম্হি সচ্চঞ্চ ধম্মো চ সো সূচি চ ব্রাহ্মণো।[৩৮]

অর্থাৎ, জটা-গোত্রধারী বা জন্মের বংশ পরিচয়ে কেউ প্রকৃত ব্রাহ্মণ হতে পারে না। যাঁর অন্তরে সত্যধর্ম বিরাজ করে িপবিত্র তিনিই ব্রাহ্মণ।

এখানে দেখা যায় ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল, মেথর এবং অস্পৃশ্য তারাও অনুরূপ সৎকর্ম, সত্যবাদিতা, সুন্দর আচার-আচরণ দ্বারা ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হতে কোনো রকম বাধা নেই। জন্মে দ্বারা বা ব্রাহ্মণ আ অব্রাহ্মণত্বের দাবী যুক্তিযুক্ত নয়। বস্তুত জন্মে নয় কর্মে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ হয়। কর্মের মাধ্যমে সবাই পরিচিতি লাভ করে। এ প্রসঙ্গে দেখা যায় ; 'কৃষক, শিল্পী, বণিক, চোর, যোদ্ধা যাচক বা রাজা সবাই আপন আপন কর্মের মাধ্যমেই পরিচিতি লাভ করে'।[৩৯]

'সোপাক' এক দরিদ্রার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। এখানে উল্লেখ থাকে যে, তার মাতা প্রসবকালীন সময়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় আত্মীয়-স্বজন সবাই তাকে মৃত মনে করে শ্মশানে রেখে আসে। সেখানে তার জ্ঞান ফিরে আসলে একজন সন্তানের জন্ম দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে সে মারা যায়। শ্মশানে জন্ম এবং শ্মশানে বর্দ্ধিত বলে তার নাম হলো 'সোপাক'। তারপর সে একজন শ্মাশান রক্ষকের অর্থাৎ চণ্ডাল গৃহে নিজের সন্তানের মতো পালন করতে লাগল। তাই সোপাক চণ্ডাল পুত্র নামে পরিচিতি লাভ করে। চণ্ডাল ও চণ্ডাল পুত্র সর্বক্ষেত্রে অচ্ছুৎ। বুদ্ধের সান্নিধ্যে এসে সোপাক নবজীবন লাভ করে। অল্পদিনের মধ্যে সোপাক সাধনার চরম শিখরে আরোহণ করে অর্হত্বফল লাভ করতে সক্ষম হন।[৪০] রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলো নাটক বৌদ্ধ কাহিনি ও বৌদ্ধ সাহিত্যেকে অবলম্বন করে রচিত। তন্মধ্যে অন্যতম নাটক হলো 'নটীর পূজা'। রবীন্দ্রনাথের চণ্ডালিকা নাটকেও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব লক্ষণীয়। বুদ্ধ যখন সেখানে অবস্থান করেছিলেন অনাথপিণ্ডিকের জেতবন নামক আরামে এই ঘটনাটি ঘটেছিল শ্রাবস্তীতে। বুদ্ধের প্রধান শিষ্য আনন্দ ভিক্ষা সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে প্রতিদিন নগরে যেতেন। একদিন একজন সাধারণ গৃহস্থের গৃহে দুপুরের আহার সমাপনান্তে তিনি যখন জেতবনারামে ফিরছিলেন তখন তিনি খুবই তৃষ্ণা অনুভব করেন। এ সময় তিনি একজন চণ্ডালির কন্যা প্রকৃতিকে কুয়ো থেকে পানি তুলতে দেখেন। তিনি তার কাছে পানি পান করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। তখন চণ্ডালি কন্যা তাঁকে জানালেন যে, সে একজন অস্পৃশ্য চণ্ডালির কন্যা। তাই তাকে সে পানি

Dhaka University Institutional Repository

দিতে পারবে না। তারপর বুদ্ধ শিষ্য আনন্দ তাকে বললেন বৌদ্ধধর্মে কোনো রকম জাতিভেদ প্রথা নেই। বর্ণবৈষম্য নেই। তিনি বললেন;

যে মানব আমি সে মানব তুমি কন্যা
সেই করি তীর্থ বারি
যাহা করে তৃষিতেরে
যাহা তাপিত প্রান্তেরে স্নিগ্ধ করে
সেই তো পবিত্র বারি
জল দাও, আমায় জল দাও।[৪১]

তারপর বুদ্ধ শিষ্যকে চণ্ডালি কন্যা পানি পান করিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করান। বুদ্ধের চিরশ্বাশত সর্বজনীন আবেদন সর্বকালে ও সর্বত্রে পৃথিবীর সকল মানুষের নিকট সমানভাবে প্রযোজ্য।

ত্রিপিটকের অন্তর্গত 'উদান' গ্রন্থের 'উপোসথ সূত্রে' বুদ্ধ ভিক্ষুদের আহবান করে বলতে দেখা যায় ; সেয্যথাপি ভিক্খবে যা কাচি মহানদিয়ো সেয্যথীদং গঙ্গা, যমুনা, অচিরাবতী, সরভূ, মহী তা মহাসমুদ্দং পত্তা জহন্তি পুরিমানি নামগোত্তানি মহাসমুদ্দোত্বেব সঙ্খ গচ্ছন্তি, এবমেব খো ভিক্খবে চত্তারোমে বণ্ণা খত্তিযা ব্রাহ্মণা বেস্সা সুদ্দা, তে তথাগতপ্পবেদিতে ধম্মবিনযে অগারস্মা অনাগারিযং পব্বজিতা জহন্তি পুরিমানি নাম-গোত্তানি, সমণা সক্যপুত্তিযাত্বেব সঙ্খং গচ্ছন্তি।[৪২] অর্থাৎ, ভিক্ষুগণ ! গঙ্গা, যমুনা, অচিরাবতী, সরভূ, মহী, আদি মহানদী মহাসমুদ্রে এসে নিজেদের পূর্বের নাম ও গোত্র পরিত্যাগ করে মহাসমুদ্রে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং শূদ্র চারি গোত্রীয় লোক বুদ্ধের শাসনে এসে পূর্বের নাম, গোত্র এবং বংশ ত্যাগ করে শাক্যপুত্র নামে পরিচিতি লাভ করে। এখানে সংযুক্ত নিকায়ের 'অরণ সূত্রে' আরো উল্লেখ রয়েছে ; বুদ্ধ শাসনে প্রব্রজিতকে মাতা-পিতা ভাই-বোন এবং আত্মীয়-স্বজন প্রণাম করেন। ক্ষত্রিয়গণ নিম্নবর্ণের (নীচুকুল জাত) শ্রমণকে প্রণাম করেন।[৪৩] এখানে তিনি কাউকেই খাটো করে কিংবা ছোটো করে দেখতেন না। উঁচু-নিচু, ধনী-দরিদ্র কোনো কিছুই ছিল না তাঁর নিকট। তিনি কারো প্রতি কোনো রকম বৈষম্যমূলক আচরণ প্রদর্শন করেননি। তিনি সবাইকে এক এবং অভিন্ন মনে করতেন। সমদৃষ্টিতে দেখতেন। যেহেতু তিনি জাতিভেদ মানতেন না। তাইতো বুদ্ধের সান্নিধ্যে এসে সবাই নিজ নিজ অহংঙ্কার, গর্ববোধ এবং জাত্যাভিমান থেকে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হন। এ প্রসঙ্গে সংযুক্ত নিকায়ের 'সুন্দরিক সূত্রে' আরো দেখা যায় ; কাষ্ঠ থেকে একান্তই অগ্নি উৎপন্ন হয়। নীচুকুলে কিংবা অচ্ছুতকুলে জাত ব্যক্তিও ধৃতিমান পাপনিবারী জ্ঞানসম্পন্ন মুনি হয়।[৪৪]

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞানবুদ্ধি কর্ম তৎপরতায় কর্ম উৎসাহে সৃষ্টির সেরা মানুষ। মানুষের ক্ষেত্রে তিনি জাতিভেদ প্রথা অস্বীকার করতেন। তবে একথা বলা যায় যে, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার (Universal declaration of Human Rights)-এর ১ম ধারায় দেখা যায় ; 'সকল মানুষ স্বাধীনভাবে এবং সমমর্যাদা ও সম্মান অধিকার নিয়ে জন্মে। তাদের উচিত বিচারবুদ্ধি ও বিবেক অধিকার এবং ভ্রাতৃত্বের মনোভাব নিয়ে পরস্পরের সাথে আচরণ করা'।[৪৫] বর্তমানে প্রচলিত মানবাধিকারে যা রচিত হয়েছে তাতে বুদ্ধের সুচিন্তিত মতামত নির্যাতিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা সর্বজনীন ঘোষণার রূপরেখা দেখতে পাওয়া যায়। আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান। সকলের সমানাধিকার রয়েছে এতে। এখানে সমানাধিকার হলো- জাতি-বর্ণ-গোত্র, জন্মস্থান নারী-পরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের আইনগত সমান মর্যাদার স্বকৃতি। এ প্রসঙ্গে Hervey Peter তাঁর `An Introduction to Buddhist Ethics' নামক গ্রন্থে বলেন ;

> Those who have the good fortune to have a `rare and precious human rebirth'; with all its potential for awareness, sensitivity, and freedom have a duty to not abuse the right of others to partake of the possibilities of moral and spiritual flourishing offered by human existence. Such flourishing is only posible when certain conditions relating to physical existence and social freedom are mantained. Human beings furthermore have an obligation to treat other of life with respect commensurate to their natures.[৪৬]

বুদ্ধের সর্বজনীন আবেদন সমগ্র মানবজাতি মাত্রই সকলের নিকট সমানভাবে কার্যকর। তিনি সকলের জন্য মঙ্গল, কল্যাণ, সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করেছেন। তৎসমকালীন সমাজের বর্ণবৈষম্যের প্রভাবে যে অসমতা সৃষ্টি হয়েছে তা দূরীকরণ সমতা বিধানের জন্য বুদ্ধের উপদেশের আজো প্রাসঙ্গিতা রয়েছে। বুদ্ধ মতবাদে দেখা যায় যে, সবাই এক এবং অভিন্ন সত্তায় বিশ্বাসী তার একটি রূপরেখা পাওয়া যায় বুদ্ধের উপদেশে।

১. গ. শিক্ষার অধিকার

শিক্ষা মানুষের মানবিক গুণাবলীসমূহকে জাগিয়ে তোলে। শিক্ষা মানুষকে মানবীয় হতে সহায়তা করে। শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে শেখায় এবং নৈতিকতায় উৎসাহিত করে। এটি মানুষের মনে মানবিকতা ও মনুষ্যত্বের আলো প্রজ্জ্বলন করে। যুগে যুগে মহান ব্যক্তিরাই মানুষকে মানবতা সত্যের পথ দেখিয়েছেন। এটার মাধ্যমে মানুষের সুপ্রবৃত্তির উন্মেষ ঘটে আর কুপ্রবৃত্তি অবদমিত হয়। ফলশ্রুতিতে মানুষ ভালো-মন্দ, নৈতিক-অনৈতিক, সদাচার-

Dhaka University Institutional Repository

অনাচার বিচা ও বিবেচনা করতে সক্ষম হয় এবং পাপ কাজ পহিারপূর্বক জীবনযাপন করে। এ ধরনের শিক্ষার ব্যাপারেই বলা হয় 'শিক্ষা মানব জাতির মেরুদণ্ড'। মানবসভ্যত্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হলো শিক্ষা। সুন্দর সমাজ ও সভ্যতা ক্রমবিকাশে শিক্ষাই হলো একধরনের অন্যতম হাতিয়ার বিশেষ। সাধারণত কোনো বিষয় জানা বা শেখাই হলো শিক্ষা। সেই শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নাও হতে পারে। মনের ভাবকে লিখিতভাবে প্রকাশ করা এবং লিখিত কোনো কিছু পড়তে পারার যোগ্যতাকে শিক্ষা বলে। বস্তুত শিক্ষার পরিধি ব্যাপক এবং বিস্তৃতি। লিখতে পড়তে জানা এবং বিশেষ কোনো উপায়ে জীবিকা অর্জনের উপায় আয়ত্ব করার কৌশলকে শিক্ষা বলা হয়। বর্তমান সময়ে লিখতে পড়তে জানাকে শিক্ষার অপরিহার্য দিক হিসেবে বিবেচনা কর হয়। শিক্ষার অন্যতম মূখ্য উদ্দেশ্য হলো মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানো। ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশ লাভের জন্য শিক্ষা খুবই প্রয়োজন। এক্ষেত্রে শিক্ষার বিকল্প কিছুই নেই। Dewey ; বলেন ; Education is process of living through a continuous reconstruction of experience. It is the development of all those capacities in the individual, which will enable him to control his environment and fulfill his possibilities.[৪৭] শিক্ষার ফলে মানুষের জ্ঞানের উন্মেষ হয়। জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। নৈতিক ও উন্নত পবিত্র জীবনযাপন করতে পারে। শিক্ষাহীনতার ফলে মানুষের চরম অধোঃপতন হয়। শিক্ষা মানবজীবনে বাঞ্ছিত পরিবর্তনকরণে সহায়তা করে।

প্রাচীন ভারতে সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত ছিল সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ শিক্ষা পদ্ধতি। মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশে যে সমস্ত কালজীয় মহাপুরুষ শিক্ষাবিদদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন তাঁদের মধ্যে বুদ্ধ অনন্য সাধারণ। তাঁর শিক্ষাদর্শন বিষয় আলোচনা মানবসভ্যতায় নবতর অধ্যায়ের সূচনা করেছে। বুদ্ধ প্রবর্তিত সামাজিক বিপ্লবগুলোর মধ্যে সর্বজনীন শিক্ষা অধিকার প্রতিষ্ঠা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাজপুত্র হিসেবে তিনি অসাধারণ শিক্ষার্থী ছিলেন। বাল্যজীবনে তিনি চৌষট্টি লিপিবিদ্যা অর্জন করেছিলেন। এগুলো হলো : ১. ব্রাহ্মীর লিপি, ২. খরোষ্টী লিপি, ৩. পুস্করসারী লিপি, ৪. অঙ্গ লিপি, ৫. বঙ্গ লিপি, ৬. মগধ লিপি, ৭. মঙ্গল্য লিপি, ৮. মনুষ্য লিপি, ৯. অঙ্গুলীয় লিপি, ১০. শিকারী লিপি, ১১. ব্রহ্মবল্লী লিপি, ১২. দ্রাবিড় লিপি, ১৩. কিনারী লিপি, ১৪. দক্ষিণ লিপি, ১৫. উগ্র লিপি, ১৬. সংখ্যা লিপি, ১৭. অনুলোম লিপি, ১৮. অর্দ্ধধনু লিপি, ১৯. দরদ লিপি, ২০. খাস্যা লিপি, ২১. চীন লিপি, ২২. লূন লিপি, ২৩. হূন লিপি, ২৪. মধ্যক্ষরবিস্তর লিপি, ২৫. পুষ্প লিপি, ২৬. দেব লিপি, ২৭. নাগ লিপি, ২৮. যক্ষ লিপি, ২৯. গন্ধর্ব লিপি, ৩০. কিন্নর লিপি, ৩১. মহোরগ লিপি, ৩২. অসুর লিপি, ৩৩. গরুড় লিপি, ৩৪. মৃগ লিপি, ৩৫. চক্র লিপি, ৩৬. মরু লিপি, ৩৭. ভৌমদেব লিপি, ৩৮. উত্তর কুরুদ্বীপ লিপি, ৩৯. অপরগোদানি লিপি, ৪০. পূর্ববিদেহ লিপি, ৪১. উৎক্ষেপ লিপি, ৪২. নিক্ষেপ লিপি, ৪৩. বিক্ষেপ লিপি, ৪৪.

Dhaka University Institutional Repository

প্রক্ষেপ লিপি, ৪৫. সাগর লিপি, ৪৬. বজ্রলিপি, ৪৭. লেখ প্রতিলেখ লিপি, ৪৮. অনুদ্রুত লিপি, ৪৯. শাস্ত্রাবর্ত লিপি, ৫০. গণনাবর্ত লিপি, ৫১. উৎক্ষেপবর্ত লিপি, ৫২. নিক্ষেপবর্ত লিপি, ৫৩. পাদলিখিত লিপি (দ্বিরুত্তর পদসন্ধি লিপি হতে দশোত্তর পদসন্ধি লিপি পর্যন্ত।) ৫৪. অধ্যহারিনী লিপি, ৫৫. সর্বরুতসংগ্রহণী লিপি, ৫৬. বিদ্যানুলোমা লিপি, ৫৭. বিমিশ্র লিপি, ৫৮. ঋষিতপস্তপ্তা লিপি, ৫৯. রোচমানা লিপি. ৬০. ধরণীপ্রেক্ষণী লিপি, ৬১. গগনপ্রেক্ষিণী লিপি, ৬২. সর্বৌষধিনিষযন্দা লিপি, ৬৩. সর্বসার সংগ্রহণী লিপি এবং ৬৪. সর্বভূতরুত গ্রহণী লিপি।[৪৮] তাছাড়া তিনি ছেচল্লিশটি বর্ণমালা আয়ত্ব করেছিলেন। তা হলো - অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ, অং, অঃ, ক, খ, গ, ঘ, ঙ; চ, ছ, জ, ঝ, ঞ; ট, ঠ, ড, ঢ, ণ; ত, থ, দ, ধ, ন; প, ফ, ব, ভ, ম ; য, ও, ল,ব, শ, ষ স, হ, ক্ষ।[৪৯] পালি বা বৌদ্ধ সাহিত্যের আলোকে দেখা যায় সেই সময় দু প্রকার শিক্ষা পদ্ধতির প্রচলন ছিল। যথা : ক. প্রাক্ বৌদ্ধ শিক্ষা পদ্ধতি এবং খ. বৌদ্ধ শিক্ষা পদ্ধতি।

প্রাক্ বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত শিক্ষার্থীরা ছাত্র হিসেবে বিদ্যায়তনে প্রবেশ করার সুযোগ লাভ করতে পারতেন।[৫০] ত্রিবেদে[৫১] জ্ঞান লাভ করা বাধ্যতমূলক। কেননা, শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে তা প্রধান ও অন্যতম যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হতো। বুদ্ধের সময়ে কৌশাম্বীরাজ উদয়নের পুরোহিত পুত্র ছিলেন ভারদ্বাজ। বুদ্ধ শাসনে প্রবেশ করে তিনি খুব তাড়াতাড়ি মার্গফল লাভ করেন। বুদ্ধ শাসনের প্রবেশের আগে তিনি ত্রিবেদে পারদর্শী হয়ে ৫০০ ছাত্রকে ত্রিবেদ শিক্ষা দান করতেন।[৫২] অনুরূপভাবে তিষ্য নামক অপর একজন ব্রাহ্মণও নিজে ত্রিবেদ শিক্ষা লাভ করে ৫০০ ছাত্রকে ত্রিবেদ শিক্ষা দিতেন।[৫৩] সেকালে কোনো কোনো ছাত্র অতিরিক্ত শিক্ষা হিসেবে নানারকম বিদ্যাশিক্ষা আয়ত্ব করতেন। বৌদ্ধ বিহারগুলোতে শিল্পচর্চায় সবাইকে অনুপ্রাণিত করা হতো।

পালি বা বৌদ্ধ সাহিত্যের 'ব্রহ্মায়ু সূত্র' থেকে জানা যায় যে, মিথিলা নগরীর বিংশত্যধিক শত (১২০) বর্ষীয় ব্রহ্মায়ু নামক একজন ব্যক্তি বেদ ছাড়াও ধ্বনি বিজ্ঞান, পদজ্ঞ, শিক্ষা নিরুক্ত, লোকায়াত শাস্ত্র, শব্দতত্ত্ব ও ইতিহাসে পারদর্শী ছিলেন।[৫৪] একই ভাবে চম্পা নগরের সোণদণ্ড নামক ধনশালী ও ঐশ্বর্যশালী একজন ব্রাহ্মণ সাধারণ বিষয়েও পারদর্শী লাভ ছাড়াও ত্রিবেদ, নির্ঘন্ট, বেদ নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানসমূহ, লিপিবিদ্যা, শব্দশাস্ত্র, ইতিহাস, ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র, মহাপুরুষ জ্ঞান বিদ্যা অর্জন করেন।[৫৫] বৈদিক যুগে শিক্ষালয়ের প্রধান ছিলেন গুরু। এ সময় গুরু শিক্ষালয় লোকালয়ের বাহিরের অরণ্যের নিকটবর্তী কোনো এক উপযোগী স্থানে গড়ে তুলতেন। এখানকার প্রদত্ত শিক্ষা রীতি-নীতিকে বলা হতো তপোবনভিত্তিক শিক্ষানীতি। এখানে গুরু শিক্ষার্থীকে সকল বিষয়ে শিক্ষা দান করতেন। এই ধারার শিক্ষাব্যবস্থায় খুব অল্প সংখ্যক শিক্ষার্থী শিক্ষা লাভ করার সুযোগ পেতেন। শিক্ষা লাভ করার অধিকাংশই ছিলেন উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়। এই সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিশিষ্ট্য সাহিত্যিক বঙ্কিম চট্টোপধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

বলেন ; 'ব্রাহ্মণ্য শাসিত বৈদিক যুগে জ্ঞানার্জন বা বিদ্যাশিক্ষা শুধু ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল। তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর এরূপ স্বার্থ বুদ্ধি ও বর্ণবৈষম্য ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের অধিক সংখ্যক সদস্যকে জ্ঞানার্জনের স্বীয় স্বাভাবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাদের মূর্খ করে রাখল। ফলে বির্দ্যা ও জ্ঞানার্জনের এবং আলোচনার একমাত্র অধিকারী ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায় সকল বর্ণের প্রভু হয়ে নিজেদের বিদ্যা বা জ্ঞানালোচনার প্রভুত্ব রক্ষীরূপে নিযুক্ত করলেন'।[৫৬]

প্রাক্ বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় ত্রিবেদ বাধ্যবাদকতা থাকলেও বুদ্ধের সময়ে তা কিছুরই প্রয়োজন পড়েনি। সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন করার মানসে পরবর্তীসময়ে বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় সঙ্ঘ শিক্ষার প্রয়োজনে, বৌদ্ধসঙ্ঘের সম্প্রীতি ও ঐক্যের ফলস্বরূপ সমাজ, রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় জীবনের খুব ঘনিষ্টতায় উপমহাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার ধারায় বহুমুখি প্রচার-প্রসার লাভ করে। বুদ্ধ বৈদিক শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তে নতুন ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের ধারাসমূহ অনুসরণ করে শিক্ষা ও শিক্ষণের ক্ষেত্রে এক স্বর্ণযুগের অবতারণা করেন। তাঁর প্রচারিত-প্রসারিত ধর্ম মতবাদকে অবলম্বন করে শিক্ষার ক্ষেত্রে এক অনবদ্য-বৈচিত্রময় বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। বুদ্ধ সুশৃঙ্খলবদ্ধ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। শৃঙ্খলাবদ্ধ সঙ্ঘজীবনের মধ্য দিয়ে কর্মচিন্তার সুগভীর প্রভাবে ও বুদ্ধজীবনের অনন্য সাধারণ ও গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত অধ্যায়গুলোর চিরাচরিত আদর্শে গণশিক্ষার মাধ্যম ও বিহারভিত্তিক বিদ্যালয় গড়ে উঠে। খ্রি. পূর্ব ৬ষ্ট শতাব্দীতে প্রাচীন ভারতে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক ধরনের বিপ্লবের সূচনা করেন তিনি। পালি সাহিত্যের সূত্র পিটকের অন্তর্গত 'দীর্ঘ নিকায়' নামক গ্রন্থের 'ব্রহ্মজাল সূত্রে'[৫৭] বুদ্ধের সমসাময়িক দার্শনিক মতবাদের আলোচনা দৃষ্টনীয়। এই রকম মতবাদের সংখ্যা বাষট্টি। বুদ্ধ এগুলোকে মিথ্যাদৃষ্টি বলেছেন।

প্রাচীনকালে নগরজীবনের শিক্ষা ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো প্রাক্ বৌদ্ধশিক্ষা ব্যবস্থায় শুধু মাত্র ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের শিক্ষায়তনে পড়ালেখার সুযোগ পেতেন। কিন্তু সেই সময় ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় একমাত্র মূলকেন্দ্র ছিল বৌদ্ধবিহার বা সংহারাম। এটি সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। সংঘে প্রবেশ, দীক্ষা গ্রহণ, আহার গ্রহণ করা, বাসস্থান, ব্রতলাভ, ধ্যান-সমাধি প্রভৃতি সম্পর্কে নানাবিধ বিধিবিধান প্রণীত হয়। বৌদ্ধবিহার মাত্রই তখন এক একটি আবাসিক শিক্ষা কেন্দ্র রূপে গড়ে উঠে। প্রথম পর্যায়ে এগুলো ছিল ভিক্ষু-শ্রমণদের ধর্ম বিনিময় ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র। শিক্ষালয়সমূহ লোকালয়ের বাহিরে নিবিড়, মনোরম ও শান্ত পরিবেশ অবস্থিত। এখানকার বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা কোনোপ্রকার পারিশ্রমিক কিংবা গুরুদক্ষিণা নিতেন না। সকলকে ভালোবেসে পাঠদান করতেন, যার ফলে বিহারগুলোতেই সর্বপ্রথম সর্বসাধারণের জন্যে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এখানে যেসব বৌদ্ধ ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী বসবাস করতেন, তারা সকলেই নিজ নিজ বিহারের আশে-পাশের লোকদের বিনাবেতনে ধর্মীয় শিক্ষা দান করতেন। এভাবেই বৌদ্ধবিহারগুলোতে সর্ব প্রথম অবৈতনিক শিক্ষা লাভ করার

Dhaka University Institutional Repository

সুযোগ সৃষ্টি হয়। এই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থায় সঙ্ঘের অনুশাসন মেনে চলা শিক্ষার্থীদের অপিরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল।

বুদ্ধ রাজা বিম্বিসারের অনুরোধে জেতবন বিহারে ধর্ম-বিনয় ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানচর্চার জন্য বর্ষাবাস গ্রহণের জন্য মাসের অষ্টমী অমাবস্যা, অষ্টমী ও পূর্ণিমা তিথিতে উপোসথব্রত[৫৮] গ্রহণ করেন। বর্ষায় চারিদেকে পানি ও আবর্জনায় রাস্তা-ঘাট পূর্ণ থাকে। উন্মুক্ত স্থানে বিদ্যাচর্চার বিঘ্ন ঘটায় বিহারে ধর্মশিক্ষার বা ধর্মচর্চার ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তীকালে ভিক্ষু-শ্রামণ ছাড়াও অন্যান্য সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীরাও এমন কি সাধারণ জ্ঞান পিপাসুরাও এ সকল শিক্ষা নিকেতনে বিদ্যার্জনের সুযোগ পেতেন। শিক্ষার বিষয় আর ধর্ম বিষয়ে সীমাবদ্ধ রইল না। কলা, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র, উপনিষদ, ব্যাকরণ, সাংখ্য, ন্যায়, বেদ-বেদান্ত জ্যোতিষ শাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হতো। 'মিলিন্দ প্রশ্ন' নামক গ্রন্থে গ্রীকরাজ মিলিন্দ-এর বিদ্যায়ত্বের পরিচয় প্রসঙ্গে সেখানে উনবিংশতি প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের উল্লেখ রয়েছে। এগুলো হলো[৫৯] : ১. শ্রুতি, ২. স্মৃতি, ৩. সাংখ্য, ৪. যোগ, ৫ ন্যায়, ৬. বৈশেষিক, ৭. গণিত ৮. সঙ্গীত, ৯. চিকিৎসা, ১০. চর্তুবেদ (মতান্তরে ধনুর্বিদ্যা) ১১. পুরাণ, ১২. ইতিহাস, ১৩. জোতিষ, ১৪. যাদুবিদ্যা, ১৫. হেতু বা তর্ক বিদ্যা, ১৬. মন্ত্রণা, ১৭. যুদ্ধবিদ্যা, ১৮. ছন্দ বিদ্যা, ১৯. সামুদ্রিক বিদ্যা। একবিংশ শতাব্দীতে এসেও এই সমস্ত বিষয়ের পঠন-পাঠনর প্রচলন দেখা যায়। উপরি-উক্ত পঠিত বিদ্যা তৎসমকালীন বিদ্যা সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা প্রদার করে। পরবর্তী সময়ে এসব বিহারভিত্তিক শিক্ষানিকেতন এক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ পরিগ্রহ করে[৬০]। এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ রয়েছে ;

> 'The universities maintained high standards in education, administration and discipline. The course of studies of this universities included Buddhist studies pertaining to all three Buddhist traditions, comparative religion, the six systems of Hindu philosophy and various other secular subject such as politics, economics, law, agriculture, astrology, science, logic, medicine, fine-arts and literature'.[৬১]

শিক্ষাগ্রহণে নারী-পুরুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। সকলেই সমানভাবে শিক্ষা লাভ করার অধিকার রাখে। বৌদ্ধশিক্ষা ব্যবস্থায় তার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই। বুদ্ধের শিক্ষা লাভে মহিলাও কম অগ্রগামী ছিলেন না। তাঁদের জন্য আলাদা আলাদা বিদ্যায়তন ছিল। এখানে তাঁরা মানসিক জ্ঞানবিকাশের সুযোগ পেতেন। বুদ্ধের সময়ে রাজগৃহের সমৃদ্ধশালী বিশাখ নামক নাগরিকের পত্নী ধম্মদিন্না কায়-বাক্য-মনে সংযত হয়ে প্রখ্যাত স্মৃতি

Dhaka University Institutional Repository

সম্পন্না হিসেবে পরিচিত ছিলেন।[৬২] স্মৃতিচারণ ছিল শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা জ্ঞান আহরণে এটি সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য এবং এটি অসাধারণ শিক্ষা পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হতো। তাছাড়া মহিলারা সাধারণ শিক্ষায়ও শিক্ষিতা ছিলেন। বুদ্ধের সময়ে নন্দত্তরা নামক একজন রমনী শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা লাভ করেন। তাছাড়া তিনি বাগ্মিতা বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিলেন।[৬৩] প্রাচীন ভারতে নিম্নশ্রেণীর বিশেষ করে শূদ্র ও মেয়েদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনে কোনো অধিকার ছিল না। বুদ্ধ বিনা দ্বিধায় তাদের সংঘে স্থান দিয়ে পুরুষের পাশাপাশি তাদের অধিকারও নিশ্চিত করেছেন। বৌদ্ধশিক্ষা সমাজে বৈপ্লবিক চেতনা সৃষ্টি করে ও শিক্ষায় সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। বৌদ্ধশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল সকলের জন্য উন্মুক্ত। এখানে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই বিদ্যাচর্চার সুযোগ লাভ করতো।

বুদ্ধের সময় বিভিন্ন পণ্ডিতজন বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের সুখ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বুদ্ধ তাঁদেরকে ভিন্ন ভিন্ন উপাধি[৬৪] প্রদান করে সম্মানিত করেছিলেন।

ক. অঞ্ঞাত কৌণ্ডিণ্য : জ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ;

খ. শারিপুত্র : মহাপ্রজ্ঞাবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ;

গ. মহামৌদগলায়ন : ঋদ্ধিমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ;

ঘ. মহাকাশ্যপ : ধূতাঙ্গ জীবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ;

ঙ. অনুরুদ্ধ : দিব্য চক্ষু সম্পন্নদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ;

চ. মন্তানিপুত্র পুণ্ন : ধর্ম প্রদানকারীদের মধ্যে মন্তানিপুত্র পুণ্ন শ্রেষ্ঠ ;

ছ. মহাকচ্চায়ন : সংক্ষিপ্ত দেশনাকারীদের মধ্যে মহাকচ্চায়ন শ্রেষ্ঠ এবং

জ. আনন্দ : বহুশ্রুতদের মধ্যে আনন্দ শ্রেষ্ঠ।

পরবর্তী সময়কালে শিক্ষাব্যবস্থায় সৃষ্টি হয় এক অভিনব দিগন্ত। ধীরে ধীরে বিহার, মহাবিহার, সঙ্ঘারামগুলো বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। কোনোটি আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ লাভ করে। এগুলোর মধ্যে নালন্দা, তক্ষশীলা, বিক্রমশীল, ওদন্তপুরী, সোমপুরী, জগদ্দল, এবং পণ্ডিত বিহার উল্লেখযোগ্য। সমকালীন রাজা, শ্রেষ্ঠী এবং সাধারণ প্রজা সাধারণের ঐকান্তিক পৃষ্টপোষকতায় এ সমস্ত বিদ্যায়তন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান ভারতের বিহার প্রদেশের পাটনা জেলার বরগাওন গ্রামে অবস্থিত প্রাচীন মগধ রাজ্যের শিক্ষাকেন্দ্রিক নগর নালন্দা। সেই সময় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় দেশে এবং বিদেশে খুবই সুপরিচিত এবং সুনাম ছিলেন। ত্রিপিটকের অন্তর্গত মহাবর্গ[৬৫] অনুসারে তক্ষশীলা বৌদ্ধ প্রাক্ বৌদ্ধযুগেরই এক শ্রেষ্ঠ বিদ্যাশিক্ষার নগরী হিসেবে পরিচিতি ছিল। এই শিক্ষাকেন্দ্রে বুদ্ধের অন্যতম রাজ চিকিৎসক (ভেষজ বৈদ্য) জীবক শিক্ষা সমাপনান্তে নিজে রোগীর চিকিৎসার দায়িত্বভার গ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন। এছাড়া বিখ্যাত বৈয়াকরণিক পাণিনি ও অর্থশাস্ত্র প্রণেতা কৌটিল্যও তেমনি ঐ বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।[৬৬] বুদ্ধের সময়ে খুবই উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহরে মধ্যে এটি অসাধারণ। তাছাড়া এখানে কোশলরাজ পুরোহিত পুত্র অহিংসক[৬৭] তক্ষশীলায় গমন করে সেখানে নানাবিধ বিদ্যায়ত্ব করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৬৮] এই ধরনের প্রাচীন ও ঐতিহাসিক বিদ্যাপীঠ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্র ঠাকুর বলেন ;

> 'বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিশেষ সাধনার ক্ষেত্র। সাধারণভাবে বলা চলে, সে সাধনা বিদ্যার সাধনা, কিন্তু তা বললে কথাটা সুনির্দিষ্ট হয় না, কেননা 'বিদ্যা' শব্দের অর্থ ব্যাপক এবং তার সাধনা বহু বিচিত্র। য়ুরোপীয় ভাষায় যাকে য়ুনির্ভাসিটি বলে প্রধানত তার উদ্ভব য়ুরোপে। অথচ এ য়ুনিভার্সিটির প্রথম প্রতিরূপ একদিন ভারতবর্ষেই দেখা দিয়েছিল। নালন্দা, বিক্রমশীল ও তক্ষশীলার বিদ্যায়তন কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার নিশ্চিত কাল নির্ণয় এখনো হয়নি। কিন্তু ধরে নেওয়া যেতে পারে, য়ুরোপীয় য়ুনির্ভাসিটির পূর্বেই তাদের আর্বিভাব। তাদের উদ্ভব ভারতীয় চিত্তের আন্তরিক প্রেরণায়, স্বভাবের অনিবার্য আবেগে। তার পূর্ববর্তীকালে বিদ্যার সাধনা ও শিক্ষা বিচিত্র আকারে ও বিবিধ প্রণালীতে দেশের নানান স্থানে ব্যাপ্ত হয়েছিল, এ কথা আজ সুনিশ্চিত। সমাজের সর্বত্র পরিকীর্ণ সাধনাই পুঞ্জীভূত, কেন্দ্রীভূতরূপে একসময়ে স্থানে স্থানে দেখা দিল। দেশে যে বিদ্যা, যে মনন ধারা, যে ইতিহাস কথা দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত ছিল। এমন কি দিগন্তের কাছে প্রায় বিলীন হয়ে এসেছে, একসময় তাকে সংগ্রহ করা, তাকে সজ্বত করার নিরতিশয় আগ্রহ জেগেছিল সমস্ত দেশের মনে। দেশ একান্ত ইচ্ছা করেছিল আপন সূত্র ছিন্ন রত্নগুলোকে উদ্ধার করতে, সংগ্রহ করতে, তাকে সূত্রবদ্ধ করে সমগ্র করতে এবং তাকে সর্বলোকের ও সর্বকালের ব্যবহারে উৎসর্গ করতে। সেই বিশ্বদৃষ্টির প্রবল আনন্দে তারা ভারতবর্ষে চিরকালের শিক্ষার প্রশস্ত ভূমি পত্তন করেছিল। সে শিক্ষা ধর্মে, কর্মে, রাজনীতিতে, সমাজনীতিতে ও তত্ত্বজ্ঞানে বহু ব্যাপক। সে যুগে সে বিদ্যার মহৎ মূল্য দেশের লোক গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিল, তাকে সমগ্র সম্পূর্ণতায় কেন্দ্রীভূত করে সর্বজনীন জ্ঞানসত্র রচনা করার ইচ্ছা স্বতঃই ভারতবর্ষের মনে সমুদ্যুৎত হয়েছিল, সন্দেহ নেই। ভগবান বুদ্ধ একদিন যে ধর্ম নানাতত্ত্ব নানা অনুশাসন, তাঁর সাধনার নানা প্রণালী নিয়ে সাধারণ চিত্তের আন্তঃভৌম স্তরে প্রবেশ করে ব্যাপ্ত হয়েছিল। তখন দেশ প্রবল ভাবে কামনা করেছিল এই বহু শাখায়িত পরিব্যাপ্ত ধারাকে কোন কোন সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রস্থলে উৎসরূপে উৎসারিত করে দিতে সাধারণের স্নানের জন্য, পানের জন্য কল্যাণের জন্য।[৬৯]

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধ যুগেই সর্বপ্রথম শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বজনীন রূপ লাভ করে। শিক্ষার ক্রমধারায় এটি ছিল বৌদ্ধযুগের শিক্ষার অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য। বৌদ্ধশিক্ষা প্রগতিশীল এবং উদারতা অন্যতম অঙ্গ বিশেষ। বৌদ্ধযুগের শিক্ষাপদ্ধতি সঙ্ঘকে (Buddhist Monks) অবলম্বন করে বিকশিত হয়েছে। সঙ্ঘের বাইরে জনসাধারণের কাছেও সঙ্ঘ শিক্ষাপদ্ধতি ব্যাপক সাড়া পড়েছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষু সঙ্ঘের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিল বিহারভিত্তিক বিদ্যায়তন। বুদ্ধ প্রদর্শিত এবং প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে প্রাচীন ভারতের জ্ঞানের বিশ্বক্ষেত্রে উচুঁ-নিচু সবাইকে এক লক্ষ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করেই প্রমাণ করে যে , এখানে সকলে এক এবং অভিন্ন। এখানে কোনো রকম ভেদাভেদ, কোনো রকম বৈষম্য, কোনো রকম জাতিভেদ, কোনো রকম অন্যায় আচার-আচরণ নেই। বুদ্ধের শিক্ষায় দেখা যায়, পারস্পরিক সমাচরণ। সঙ্ঘের মধ্যে গুরু-শিষ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল পিতা-পুত্রের মতো। পরস্পরের উন্নতি ও সুখ-সুবিধার জন্য পরস্পর সকলেই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতেন। একসময় বুদ্ধ শ্রাবস্তীর অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করেন। তারপর তিনি সেখান থেকে রম্যক আশ্রমে গমন করেন, সেখানে বুদ্ধ প্রব্রজিত কুলপুত্রদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিভিন্ন উপদেশ প্রদানের সময়। যথাযথ জ্ঞানুসন্ধানের কথা বলেন।[৭০] এ ধরনের শিক্ষাদান পদ্ধতি বা উপদেশ প্রদান করার রীতি-নীতি বর্তমান সময়ে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায়ও লক্ষ্য করা যায়।

শিক্ষা ব্যতীত (তবে যথার্থই প্রকৃত শিক্ষা) জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ হয় না কখনো। মানুষ যে সব অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। সেই সব অধিকারের মধ্যে শিক্ষা বিষয়ক অধিকার অন্যতম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। মানবাধিকারের ঘোষণার ২৬ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে ; 'প্রত্যেকের শিক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে। ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ও মানবিক অধিকার ও মৌলিক অধিকার সমূহের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা পরিচালিত'।[৭১] বৌদ্ধশিক্ষা প্রচার-প্রসারে ভিক্ষু-সঙ্ঘের অবদান সবচেয়ে বেশী। কেননা, সঙ্ঘই শিক্ষা বিস্তারে অনন্য সাধারণ শক্তির উৎস। বুদ্ধ প্রদর্শিত পরম নির্বাণ লাভ করতে হলে প্রয়োজন সংস্কার মুক্ত মনের অধিকারী হওয়া। লোভ-দ্বেষ-মোহ মন থেকে চিরতরে বিদায় করে দেওয়া। শুধুমাত্র জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রই তাঁর নির্দেশিত আদর্শকে নিজেদের জীবনে প্রতিফলিত করতে সক্ষম।

মানুষের প্রতিনিয়ত জীবন যাপিত হয় দুঃখকে আলিঙ্গন করে। উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির উৎকর্ষতাই ব্যক্তির ভিতরের অন্তর্নিহিত দুঃখসমূহকে (লোভ-দ্বেষ-মোহ) বিদূরিত করে সমৃদ্ধ জীবনব্যবস্থার উন্মেষ সাধন ঘটতে পারে। একজন শিক্ষিত ব্যক্তির মাধ্যমে সমাজের অপরাপর অশিক্ষিত মানুষকে জাগ্রত করে সকলের মধ্যে শিক্ষার প্রদীপ্ত আলোর প্রজ্জ্বলন ঘটিয়ে সুখ-শান্তি ও উন্নয়নের বাতাবরণ খুলে দিতে পারে। বুদ্ধ সকলকে শিক্ষার আলোয়

Dhaka University Institutional Repository

আলোকিত করতে অবিরাম চেষ্টা করেছেন যা তাঁর প্রদত্ত উপদেশে দেখা যায়। তিনি ভিক্ষু-সঙ্ঘ ছাড়াও সাধারণ গৃহীদের শুধুমাত্র প্রথাগত শিক্ষা নয় বিভিন্ন শিল্পবিদ্যার উপরও জোর দিয়েছিলেন। বুদ্ধ বলেছেন ;

বহু সচ্চঞ্চ সিপঞ্চ বিনয়ো চ সুসিক্খিতো

সুভাসিতা চ যা বাচা এতং মঙ্গলং উত্তমং।[৭২]

অর্থাৎ, বহুশাস্ত্র বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা, বিবিধ শিল্প শিক্ষা করা, বিনয়ী ও সুশিক্ষিত হওয়া এবং সুভাষিত বাক্য ভাষণ করাই উত্তম মঙ্গল।

বুদ্ধের আদর্শকে রূপ দিতে সঙ্ঘশক্তি বহুবিধ দুঃখ ও বহুমুখি সমস্যায় পীড়িত মানুষের নিকট জ্ঞান বিতরণের ব্রতগ্রহণ করেছিলেন। সমাজে সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠায় তাঁরা জনগণকে শিক্ষার আলোকিত করার মহান দায়িত্বও গ্রহণ করেছিলেন। ফলে বিহার ও সঙ্ঘারামগুলো জনসাধারারণের শিক্ষার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিণত হয়। একটি শিক্ষিতসমাজ, উন্নতজাতি ও দক্ষ মানবসম্পদময় সমাজগঠনে সহায়ক যাকে গণতন্ত্রের পূর্বশর্তও বলা হয়। বুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার মাধ্যমে সচেতন করিয়ে দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের মাধ্যমে উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক ধারাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্রের ভিতকে উত্তরোত্তর সুসঙ্ঘত ও সমৃদ্ধ করা। এ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থাকে জাতিভেদমুক্ত সর্বজনীন শিক্ষা বলা হয়।

১. ঘ. সঙ্ঘবদ্ধতার অধিকার

বর্তমান সময়ে সঙ্ঘবদ্ধ হবার অধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 'সঙ্ঘ' বলতে বহুজনের একত্রিকরণকে বোঝায়। যার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ এক একাধিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একতাবদ্ধ হয়ে ন্যায়সঙ্গত আচার-আচরণের দ্বারা সুসঙ্ঘবদ্ধভাবে পরিচালিত হয়। ম্যাকাইভার সঙ্ঘ-এর সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেন ; 'সঙ্ঘ হচ্ছে সামাজিক এমন এক সংগঠন যা কোনো সাধারণ স্বার্থ বা একাধিক স্বার্থ সাধনের সাথে সংশ্লিষ্ট।[৭৩] মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ ব্যতীত মানুষ বাঁচতে পারে না কখনো। সমাজব্যবস্থায় এককভাবে কোনো কাজই কখনো পরিপূর্ণতা সাধন সম্ভবপর নয়। তাই সঙ্ঘবদ্ধতার প্রয়োজন রয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন ; সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার ব্যতীত আধুনিক জীবনযাপন করা অসম্ভব।[৭৪] মানবাধিকারের ২০ নং সংখ্যক অনুচ্ছেদের 'ক' ধারায় উক্ত আছে ; প্রত্যেকেরই শান্তিপূর্ণভাবে সম্মিলিত হওয়ার এবং সঙ্ঘভুক্ত হওয়ার অধিকার রয়েছে।[৭৫]

বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পর বারানসী রাজ্যের ইসিপতনের মৃগদাব বনে পাঁচজন শিষ্যকে[৭৬] নিয়ে একতাবদ্ধভাবে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। প্রারম্ভিক বর্ষাবাসে ৬০ (ষাট) জন কুলপুত্র ভিক্ষুধর্মে দীক্ষিত হয়ে বুদ্ধের সঙ্ঘ সদস্য হন। তাঁকে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নদ্রষ্ঠা বলা হয়। তিনি প্রথম গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সাংঘিক সংগঠন ভিক্ষুসঙ্ঘ এবং

Dhaka University Institutional Repository

ভিক্ষুণীসঙ্ঘ গঠন করেছিলেন। তিনি সঙ্ঘ সৃষ্টি করেননি, সুন্দর ও সুষ্ঠভাবে সঙ্ঘ পরিচালনার জন্য সংযত আচার-আচরণসমৃদ্ধ আচার সংহিতা বা নিয়ম-নীতি বিনয়[৭৭] দেশনা করেন যা বিনয় পিটকে সংরক্ষিত রয়েছে। তাঁর সুপ্রতিষ্ঠিত ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীসংঘে রাজপুত্র রাজকন্যা এবং রাজরানী থেকে শুরু করে নাপিতপুত্র, চণ্ডালপুত্র, দুস্য, ক্রীতদাস, বারবণিতা, ক্রীতদাসী সকলেই সংঘে প্রবেশ করে সমান অধিকার লাভ করেন। এখানে এসে তারা পূর্বের নাম গোত্র সবই হারিয়ে ফেলে। নব উদ্যমে স্বাতন্ত্রবোধ বজায় রেখে তারা নিজ নিজ কর্ম সম্পাদন করে।

বুদ্ধ কৃর্তক সুপ্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘ ছিল স্বাধীন চিন্তা-চেতনার প্রতীক এবং ধারক ও বাহক। বুদ্ধ সঙ্ঘবদ্ধ জীবনকে খুবই গুরুত্ব দিতেন। তারা নিজ নিজ চিন্তার উপর নির্ভরশীল। বৌদ্ধধর্মে প্রবেশের যে মন্ত্র তা হলো ত্রিশরণ।[৭৮] পরম জ্ঞান, সদাচরণ এবং একতার আশ্রয়ই বৌদ্ধদের একমাত্র আশ্রয়। একতাবদ্ধতায় বা সঙ্ঘবদ্ধতায় সুখ এবং কল্যাণ বয়ে আনে। এই বিষয়ে 'মহাপরিনিব্বাণং সুত্তং'-এ বুদ্ধ বলেন ;'যাবকীবঞ্চ ভিক্খবে, ভিক্খু সমগ্গা সন্নিপতিস্সন্তি সমগ্গা বুট্ঠহিস্সন্তি সমগ্গা সঙ্ঘ করণীযানি করিস্সন্তি বুদ্ধিযেব ভিক্খবে ভিক্খূনং পাকিঙ্খা নো পরিহানি'। অর্থাৎ, হে ভিক্ষুগণ ! ভিক্ষুসঙ্ঘ যতদিন একতাবদ্ধ হয়ে নিয়মিত সম্মিলিত হবে, একমত হয়ে আসন হতে উঠবে এবং সঙ্ঘের সকল প্রকার দায়িত্ব-কর্তব্য বিষয়ে একমত হয়ে সম্পাদন করবে, ততোদিন পর্যন্ত ভিক্ষুদের উন্নতি ব্যতীত কখনো পরিহানি হবে না।[৭৯]

বর্তমান বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সর্বত্রে বিভিন্ন সংগঠনের আলোচনা সভায় মোট সমিতির উপস্থিতি সদস্যসের দুই-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে কোরাম পূরণ প্রথা আজ থেকে আড়াই হাজার বছরেরও অনেক পূর্বে বুদ্ধ তাঁর মহান ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি, উপোসথসহ নানাবিধ সঙ্ঘকর্ম প্রবর্তন করেছিলেন। বিভিন্ন সংগঠনে আলোচনা সভা শুরু করার পূর্বে প্রস্তাবনার মাধ্যমে অনুমতি নেওয়া হয়। এ সম্পর্কে 'প্রাতিমোক্ষ' নামক গ্রন্থে দেখা যায় ; 'সুনাতু মে ভন্তে সংঘো যদি সঙ্ঘস্স পত্তকল্লং অহং আযস্মন্তং বিনং পুচ্ছেয্যং'। অর্থাৎ, ভন্তে/সঙ্ঘ আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। যদি সঙ্ঘের উপযুক্ত সময় হয় তবে আমি আয়ুষ্মানের (অমুক ভিক্ষুকে) কাছে বিনয় বিষয়ক প্রশ্নজিজ্ঞাসা করতে পারি।[৮০] বৌদ্ধধর্মে সঙ্ঘের প্রাধান্যতা দেখা যায়। সঙ্ঘের গুরুত্ব সম্পর্কে বৌদ্ধ কাহিনি দেখা যায় ; বুদ্ধের বিমাতা মহাপ্রজপতি গৌতমী একবার গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা দিয়ে নিজের হাতে দুটি চীবর[৮১] (অন্তরবাস এবং উত্তরাসঙ্ঘ) সেলাই করেন। তিনি বুদ্ধকে দান করতে গেলে বুদ্ধ তা নিজে গ্রহণ না করে সঙ্ঘকে দান করার জন্য অনুরোধ করেন। বুদ্ধ নিজেও ভিক্ষুসঙ্ঘের সদস্য। সুতরাং সঙ্ঘকে দান করলে তাতে তিনিও পূজিত হবেন।[৮২] এ ধরনের উক্তি থেকে সহজেই সঙ্ঘের অধিকারের প্রতি বুদ্ধের শ্রদ্ধা, সম্মান, বিশ্বাস কতটুক তা অতি সহজেই অনুমেয়। সংগঠনে সংযমতা দরকার। বুদ্ধ এ বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেন ;

Dhaka University Institutional Repository

উট্‌ঠানবতো সতিমতো সুচীকম্মস্‌স নিসম্মকারিনো

সঞ্ঞতস্‌স চ ধম্মজীবিনো অপ্পমত্তস্‌স যসোহভিবড্‌ঢতি।[৮৩]

অর্থাৎ, যিনি সতত জাগরিত, স্মৃতিমান, কল্যাণ কর্ম সম্পাদনকারী এবং যিনি বিচারপূর্বক কার্য সম্পাদন করেন, সংযতেন্দ্রিয় এবং ধর্মপরায়ণ ও অপ্রমাদী ব্যক্তির যশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

এখানে তিনি সঙ্ঘবদ্ধতায় উদ্যশীল ও উৎসাহী হবার কথা বলেছেন। বলেছেন সংযমতার কথা। এভাবে তিনি সংগঠনের কিংবা সঙ্ঘবদ্ধতার অধিকারের কথা ব্যক্ত করেছেন। বুদ্ধভাষিত বিনয়ই সঙ্ঘের পথ নির্দেশনা স্বরূপ। পারিবারিক, ব্যক্তিগত ও সামাজিক বৈষম্যহীনভাবে সঙ্ঘের সকল সদস্য সমান অধিকার ভোগ করে। বুদ্ধের সমকালীন ভারতে চার প্রকার প্রবল শ্রেণি বৈষম্য বিরাজমান ছিল। এগুলো হলো :

ক. ব্রাহ্মণ : যাগযজ্ঞ সম্পাদনকারী পুরোহিত শ্রেণি ;

খ. ক্ষত্রিয় : শাসক বা যোদ্ধা বর্ণগোষ্ঠী ;

গ. বৈশ্য : ব্যবসায়ী ও কৃষক বর্ণগোষ্ঠী এবং

ঘ. শুদ্র : শ্রমিক বা নিম্ন বর্ণগোষ্ঠী।

আগেই বলেছি তাঁর প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘ স্বাধীন ও সার্বভৌম সংগঠন। বিনয় হচ্ছে স্বাধীন সার্বভৌম সঙ্ঘের সংবিধান যা সঙ্ঘভুক্ত প্রত্যেক সদস্যের অধিকার ও মূল্যবোধকে সমানভাবে স্বীকৃতি প্রদান করে। বুদ্ধের সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয় মানবজাতির সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনের ব্রত নিয়ে যা আমরা বর্তমান সময়েও দেখি। সঙ্ঘের মাধ্যমে যাতে সকলের কল্যাণ সাধিত হয় সেই মূল্যবান উপদেশ বুদ্ধ প্রদান করেন। এখানে তিনি তাঁর মহান ভিক্ষ-সঙ্ঘকে উপলক্ষ্য করে বলেন ; 'হে ভিক্ষুগণ ! বহুজনের হিতে জন্য বহুজনের কল্যাণের জনন্য বহুজনের সুখের জন্য, মানুষের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনের জন্য, দেব-মানবের হিতার্থে ও সুখার্থে বিচরণ করো। তোমরা এমন ধর্ম দেশনা করো যার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ এবং অন্তে কল্যাণ'।[৮৪]

বুদ্ধের সঙ্ঘ ও বিনয় চলমান শ্রেণি বৈষম্যের বিরূদ্ধে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ। এ সময় সংঘে বুদ্ধের আর্বিভাবের সময়ে বর্ণবৈষম্য ছিল। বুদ্ধের কণ্ঠে অনুরণিত হয় জাতিভেদ প্রত্যাখানের কথা। উচ্চারণ করেন সকলের সমানাধিকারের কথা।[৮৫] বুদ্ধ কর্তৃক সুপ্রতিষ্ঠত সঙ্ঘব্যবস্থায় নানা বর্ণ, নানা গোষ্ঠী, নানা গোত্র, নানা সম্প্রদায় সকলেই সমান অধিকার লাভ করলো। কাউকে কোনোরূপ অবহেলা করা হয়নি। সবাই স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণ এবং কথা বলার সুযোগ লাভ করলো।

Dhaka University Institutional Repository

১. ঙ ব্যক্তির স্বাধীনতার অধিকার

স্বাধীনতা বলতে ব্যক্তির স্বাধীনতাকে বোঝানো হয়েছে। 'বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান' গ্রন্থ মতে 'স্বাধীন শব্দের অথ হলো বাধাহীন, আজাদ, মুক্ত, স্বচ্ছন্দ, নিজের বশে।[৮৬] 'স্বাধীনতা' শব্দের অর্থ স্বচ্ছন্দতা, বাধাহীনতা, অপরাধীনতা, স্বাতন্ত্র। ইংরেজিতে স্বাধীনতাকে বলা হয় freedom। ইংরেজি খরনবংঃু শব্দটিও একই অর্থ প্রকাশ করে। এটি অত্যন্ত গুরুত্ববহ এবং অর্থবোধক। প্রসঙ্গে Professor Barker বলেন; 'প্রত্যেকের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা অপরের স্বাধীনতার প্রয়োজন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও সীমাবদ্ধ হওয়া জরুরী'।[৮৭]

ব্যক্তির স্বাধীনতার অধিকার বিষয়ে বুদ্ধ সজাগ ছিলেন। তিনি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণকারী থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে মূল্যায়ন করতেন। স্বাধীনতার স্বরূপ সম্পর্কে দেখা যায়, নিজেকে নিজের দ্বীপ করে জ্বেলে নিজেকে সত্য শরণের উপর নির্ভরশীল হতে উপদেশ দিয়েছেন তিনি।[৮৮] নিজেকে নিজের নাথ হিসেবে দেখার কথা বলেছেন।[৮৯] এখানে তিনি আত্মমুক্তি তথা স্বাধীনতার শিক্ষা দিয়েছেন। কারণ ব্যক্তির স্বাধীনতাই ব্যক্তির সুন্দর পথ ও মতের সন্ধান প্রদান করে ; সচ্চরিত্র গঠনের সহায়তা করে ; আত্মশুদ্ধিতার মাধ্যমে সাম্য আর প্রগতির দিকে পরিচালিত করে। মানুষ নিজের অন্তরের ভিতরের শুভ চেতনাবোধকে যখন জাগ্রত করে তখন সমস্ত অকল্যাকর চেতনা দূরীকরণ করে আত্মোন্নয়ের মাধ্যমে জনকল্যাণে উদ্বুদ্ধ হতে পারে। অন্ধবিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে কোনো মতামত গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি অষ্টবিধ লোকধর্ম পরিহার করার কথা বরেছেন।[৯০]

একসময় বিভিন্ন সন্ন্যাসী তাদের মতবাদ প্রশংসা এবং অন্যদের মতবাদ বিরোধিতা করেন। এ ব্যাপারে সত্যাসত্য মতবাদ সম্পর্কে সবাই সন্দিহান। এ বিষয়ে বুদ্ধের নিকট জানতে চাইলে বুদ্ধ বলেন ; 'শোনা কথা বিশ্বাস কর না। বংশ পরম্পরায় তোমরা তা বিশ্বাস কর না। অন্যকোনো গুরু আচার্য বা শিক্ষক বলছে বলেই তা অন্ধভাবে তা মেনে নিও না। বিচারশক্তি ও যুক্তিতর্কের চাতুর্যে বিশ্বাস করো না। কারো বাহ্যিক হাব-ভাবের দ্বার বিশ্বাস করো না। দেখলে প্রকৃত ভেবে বিশ্বাস করো না। যা পেয়েছ বা যা শুনেছ তা তোমার বিবেকের কষ্টিপাথরে যাচাই করো ; যদি তা কোনো উপকারে কিংবা মঙ্গলরূপে সমাদৃত হয় তবেই পবিত্র অন্তরে গ্রহণ করো। যদি তা কোনো উপকারে নিয়ে আসবে না মনে হয় তবে তা গ্রহণ করো না। যদি এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসা না যায়, সন্দেহ, সংশয় জাগে তবে কোনো প্রকৃত জ্ঞানীব্যক্তির সহায়তায় সিদ্ধান্ত নাও'।[৯১] ধর্ম আচরণকারীদের এ ধরনের স্বাধীনতা খুব বেশী চোখে পড়ে না। বুদ্ধের চিরশ্বাশত ধারণা গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতায় অধিকার সনদ হিসেবে বিবেচিত হবে এমনটি আশা করা যায়। এখানে বুদ্ধ ব্যক্তির আপন জ্ঞানে কিংবা বিচার-বুদ্ধি দিয়ে প্রকৃত সত্যকে বরণ ও গ্রহণ করার জন্য সকলকে উপদেশ দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধের শাসনে রয়েছে সকলের সমান প্রবেশাধিকার । তাঁর শাসনে এসে সবাই বুদ্ধপুত্র হিসেবে বিবেচিত হতো। তিনি কখনো তাঁর শিষ্যদের নিজের মতামত চাপিয়ে দেননি। বরঞ্চ তিনি ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী একজন মহামানব ছিলেন। ত্রিপিটকের অন্তর্গত 'মহাবর্গ' নামক গ্রন্থে বুদ্ধকে তাঁর মহান ভিক্ষুসঙ্ঘকে উপলক্ষ্য করে বলতে দেখা যায় ; 'হে ভিক্ষুগণ ! আমি বর্তমানে তোমাদের জন্য যে সকল শিক্ষা উপদেশ নির্দেশনা জ্ঞাপন করছি, সেই সমুদয়ের মধ্যে কোনো কোনো শিক্ষাপদ ভবিষ্যতে এমনও প্রতীয়মান হতে পারে যে তদ্বারা কোনো মঙ্গল বা কল্যাণ সাধিত হচ্ছে না। তখন সকল ভিক্ষুসঙ্ঘ শিক্ষাপদটি বর্জনে একমত হলে তা বর্জন করতে পারো। আবার দেখা যায়, শিক্ষাপদ অনুজ্ঞা বা নির্দেশ করিনি যা ভবিষ্যতে মঙ্গল ও কল্যাণকর বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। তখনও সকল ভিক্ষুসঙ্ঘ একমত পোষণ করলে তেমন শিক্ষাপদ সঙ্ঘ গ্রহণ করতে পারবে'।[৯২] এখানে দেখা যায় ; শেষ শয্যায় শায়িত অবস্থায় তথাগত সেবক আনন্দকে লক্ষ্য করে বলেছেন ; 'অথ খো ভগবা আযস্মন্তং আমন্তেসি ; সিযা খো পনানন্দ তুম্হাকং এবম্সস অতীতসত্থুকং পাবচনং, নত্থি নো সত্থাতি। ন খো পণেতং আনন্দ এব দট্ঠব্বং। যো খো আনন্দ মযা ধম্মো চ বিনযো চ দেসিতো পঞ্ঞত্তো সো বো মমচ্চযেন সত্থাতি'। অর্থাৎ, 'হে আনন্দ ! তোমাদের এরূপ মনে হতে পারে যে, শাস্তার উপদেশ শেষ হলো, আমাদের শাস্তা নেই। এরূপ ধারণা করবে না। আমার অবর্তমানে আমার দেশিত ধর্ম-বিনয়কেই তোমাদের শাস্তা হিসেবে জানবে'। তিনি আরো বলেন ; 'আকঙ্খমানো আনন্দ সঙ্ঘে মমচ্চযেন খুদ্দানুখুদ্দকানি সিক্খাপদানি সমূহনতু'।[৯৩] অর্থাৎ, আমার অবর্তমানে ভিক্ষু-সঙ্ঘ ইচ্ছা করলে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ সমূহ সমুচ্ছেদ বা বাতিল করতে পারে।

এখানে বুদ্ধের সুচিন্তিত চেতনা তথা উদারতাবাদই লক্ষ্যণীয়। ব্যক্তির স্বাধীন বিবেকের প্রতি এ ধরনের সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শন সত্যিই প্রশংসার দাবীদার। এভাবে স্বাধীন শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তির আত্মপ্রত্যয় ও আত্মশক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে যা গণতান্ত্রিক সমাজগঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

১. চ. গণতান্ত্রিক অধিকার

গ্রিক শব্দ demos এবং kratia শব্দদ্বয় থেকে ইংরেজি democracy নামক অর্থবোধক শব্দটির উদ্ভব যার বাংলা অর্থ হচ্ছে গণতন্ত্র। demos এবং kratia শব্দ দুটির অর্থ যথাক্রমে people এবং power অর্থাৎ জনগণ এবং ক্ষমতা। সুতরাং বলা যায়, গণতন্ত্র হলো জনগণের ক্ষমতা। আব্রাহাম লিংকনের ভাষায় বলা যায়, 'জনগণের কল্যাণের জন্য জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত ও জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থাই গণতন্ত্র'।[৯৪] আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালনায় গণতন্ত্র খুবই জনপ্রিয় এবং কার্যকর পদ্ধতি বিশেষ। কালের বির্বতনে জাতয়ি অগ্রগতির সোপান হিসেবে গণতন্ত্র সর্বত্রে ব্যাপক সাড়া ফেলতে সক্ষম যেমন হয়েছে তেমনি আবার মানুষের কল্যাণময়

Dhaka University Institutional Repository

শাসনব্যবস্থার অমলিন ধারায় পরিণত হয়েছে। গণতন্ত্রের মূল কাজ হলো জনকল্যাণ আর তারই ধারাবিাহিকতায় কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণা অগ্রাধিকার পাওয়া। বর্তমানে গণতন্ত্র খুবই নন্দিত, প্রশংসিত এক অনন্য শাসন ব্যবস্থার নাম। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১ নং অনুচ্ছেদে গণতন্ত্র প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে ; 'প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যেও প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে'।[৯৫]

গণতন্ত্র সকল মানুষের মূল্যবান সম্পদ বিশেষ। একবিংশ শতাব্দীতে গণতন্ত্রের জন্য লিবিয়া, ইয়েমেন মায়ানমারসহ অনেক রাষ্ট্রে সংগ্রাম চলছে। আজ থেকে আড়াই হাজার বছরেরও অনেক আগে বুদ্ধ গণতন্ত্রের সূচনা করেন। বুদ্ধ রাজনৈতিক শাসন ও সরকারব্যবস্থা সম্পর্কে কোনো উপদেশ প্রদান করেননি। ধর্মীয় শিক্ষায় নির্দেশনা দিয়েছেন। শাসনব্যবস্থার যে কোনো অবয়বই ভালো হতে পারে যদি গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন থাকে। বুদ্ধের শিক্ষার অন্যতম মূল উদ্দেশ্য হলো জনকল্যাণের মাধ্যমে অমানবিক দুঃখ-দুর্দশাকে লাঘব করে সুখী এবং সমৃদ্ধিময় জীবনগঠন করা।

বুদ্ধ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন যা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মডেল হিসেবে বিবেচিত। তাঁর সুপ্রতিষ্ঠিত 'সঙ্ঘ' ব্যবস্থায় যদি কখনো গণতন্ত্র শব্দটি ব্যহার করা হয়নি তথাপি সঙ্ঘের বিনয়বিধান, সঙ্ঘ পরিচালনা এবং সংঘে অংশগ্রহণ প্রভৃতি থেকে গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্টতঃ লক্ষ্য করা যায়। এমন কি তিনি ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের জীবনযাত্রায় ঐক্যবদ্ধতা, একত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পারস্পরিক সদ্ভাব-সম্প্রীতি- সৌহার্দের উপর খুবই জোর দিতেন। আধুনিক রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় ভোট দান প্রক্রিয়া তিনি আড়াই হাজার বছরেরও আগে এই গণতান্ত্রিক প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন ভিন্ন ভিন্ন শলাকা ব্যবহার করার মাধ্যেমে।[৯৬]

খ্রি.পূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে উত্তর ভারতে ষোলটি রাজ্য বিশেষভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠে যা ষোড়শ মহাজনপদ নামে সমধিক পরিচিত।[৯৭] রাজ্যগুলোর কয়েকটিতে গোষ্ঠীনির্ভর গণতান্ত্রিক রাজ্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এগুলো হলো কপিলাবস্তুর শাক্য, রামগ্রামের কোলিয়, বৈশালীর লিচ্ছবী বা বৃজি, কুশিনগর ও পাবার মল্ল, সুংসুমারীর ভগ্গ, কেশপুত্রের কালাম, অল্লকপ্পের বুলি, পিপ্পলিবনের মৌর্য, মিথিলার বিদেহ উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে শাক্য, বৃজি, লিচ্ছবি এবং মল্ল রাজ্যগুলো ছিল প্রসিদ্ধ এবং শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গণতান্ত্রিক।[৯৮] রাজ্যগুলোর শাসনকর্তা সাধারণত জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হতো। রাজা তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচন করার কোনো রকম নিয়ম ছিল না।[৯৯] এখানে K. N Joysowal যর্থাথই বলেছেন ; The Buddhist Sangha was copied out from the political Sangha of the republic.[১০০] বুদ্ধ এরূপ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার উপর লালিত-পালিত

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ত্রিপিটকের অন্তর্গত সূত্রপিটকের 'দীঘনিকায়'নামক গ্রন্থের 'মহাপরিনিব্বাণ সুত্ত'-এ বুদ্ধ কর্তৃক উপদেশিত সপ্তঅপরিহানীয় নীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। সপ্তঅপরিহানীয়[১০১] নীতিসমূহ হলো :

ক. যতদিন তারা সম্মেলনের ব্যবস্থা করবে বার বার একত্রিত হবে ততোদিন তাদের পতন না হয়ে উত্থান হবে।

খ. যতদিন তারা এক সাথে সম্মেলনে একত্রিত হবেন এক সাথে সম্মেলন থেকে ফিরে আসবেন সর্বোপরি করণীয় কর্ম একসাথে সম্পাদন করবে, ততোদিন তাদের পতন না হয়ে উত্থান হবে।

গ. যতদিন তাঁরা অপ্রজ্ঞাপ্ত বিধি প্রজ্ঞাপ্ত করবে না, প্রজ্ঞাপ্ত বিধিসমূহ লঙ্ঘন করবে না বৃজি রাজধর্ম অনুসারে যথা প্রজ্ঞাপ্ত নিয়মে রাজ্যশাসন করবে ততোদিন তাদের পতন না হয়ে উত্থান হবে।

ঘ. যতদিন তারা বয়োঃবৃদ্ধদের সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে এবং তাদের উপদেশ মেনে চলবে ততোদিন তাদের পতন না হয়ে উত্থান হবে।

ঙ. যতদিন তারা কুলবধূ ও কুলকুমারীদের সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে ততোদিন তাদের পতন না হয়ে উত্থান হবে।

চ. যতদিন তারা নিজ নগরে ও বহির্নগরে যে সমস্ত চৈত্য আছে সেগুলোর গৌরব, সম্মান, পূজা করবে ততোদিন তাদের পতন না হয়ে উত্থান হবে।

ছ. যতদিন তারা অর্হৎগণের রক্ষণাবেক্ষণ ও তাদের বসবাসের সুব্যবস্থা করবে অনাগত অর্হৎগণ স্বীয় রাজ্যে আগমন করে এবং তাতে সুখে বাস করতে পারে ততোদিন তাদের পতন না হয়ে উত্থান হবে।

উপরি-উক্ত সপ্তঅরিহানীয় ধর্মকে আধুনিক গণতন্ত্রের ভিত্তি বলা হয়। বুদ্ধের সময়ে বৈশালীর লিচ্ছবীরা ছিলেন শক্তিশালী জাতি। তাঁদের শৌর্য-বীর্য ও একতার আদর্শ এখনো ইতিহাস সন্ধিৎসুদের আকৃষ্ট করে।[১০২]

বৈশালীতে বুদ্ধের সময়ে উন্নত শাসন প্রণালী ছিল যেখানে বর্তমান গণতন্ত্রের পূর্বাবাস রয়েছে। লিচ্ছবীদের মিলন কেন্দ্রের নাম ছিল 'সন্থাগার'।[১০৩] এই 'সন্থাগার' ছিল বাংলাদেশের সংসদ ভবনের মতো। এখানেই বসে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করেন। তাঁদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজ্যশাসন ও একতাবদ্ধতা তৎসময়ের অন্য রাজ্যগুলোর মধ্যে পরাক্রমশালী ছিল। বুদ্ধ এমন একজন ব্যক্তি যিনি গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক চিন্তার মূল ধারক ও

Dhaka University Institutional Repository

বাহক। তিনি আত্মহিতের পরিবর্তে পরার্থে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি অপরিমেয় মৈত্রীর[১০৪] কথা বলেছেন।

সকলের প্রতি মৈত্রী, প্রেম আর সেবা পরায়ণতা তখনই সম্ভব হয় যখন আত্মপরতা বা স্বার্থপরতা ছিন্ন করে সকলের কাতারে শামিল হতে পারা যায়। কেননা, স্বার্থবাদী দ্বারা কখনো জনগণ কল্যাণ সম্ভব নয়। এখানে বুদ্ধের শিক্ষা নির্দেশ করে ব্যক্তির উন্নয়ন মানে পরিবারের উন্নয়ন, পরিবারের উন্নয়ন মানে সমাজের উন্নয়ন, সমাজের উন্নয়ন মানে গ্রামের উন্নয়ন, গ্রামের উন্নয়ন মানে ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্রের উন্নয়ন। কেননা, ব্যক্তি থেকে পরিবারে, পরিবার থেকে সমাজে, সমাজ থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকেই রাষ্ট্রে এই চর্চা ও অনুশীন ব্যাপকতা লাভই করবে এবং একটি জনকল্যাণমূলক সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠবে যা গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার চেয়ে গণতান্ত্রিক। বুদ্ধের উপদেশে গণতান্ত্রিক নীতিসমূহ দেদীপ্যমান। তাঁর প্রতিটি বাণীতে গণতন্ত্রের সুদৃঢ় দিক নির্দেশনাসমূহ প্রতিভাত হয়। ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজ আর রাষ্ট্রকেন্দ্রিক গণতান্ত্রিক নীতিসমূহ বার বার বুদ্ধের উপদেশে দেখা যায়। সুন্দর সুশৃঙ্খল ও উন্নতজীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনে বুদ্ধের উপদেশে একবিংশ শতকের শান্তিময় গণতন্ত্রকে শক্ত ও মজবুতকরণে সহায়ক।

১. ছ. মর্যাদাবোধের অধিকার

এখানে প্রথমেই প্রশ্ন আসে মর্যাদা কী? উত্তরে বলা যায়, মানুষ জীব-জগতের শ্রেষ্ঠতম স্থান অধিকার রয়েছে। মানুষ তার বিবেক-বুদ্ধি, আচার-আচরণ, চিন্তা- চেতনা, বাক্‌শক্তি ইত্যাদি অন্যান্যদের থেকে আলাদা। মানুষ বিবেকবান এবং বুদ্ধিসম্পন্ন। মানুষ কথা বলতে পারে। নিজের ভাব অন্যের নিকট প্রকাশ করতে পারে। মানুষ বিবেকজাত চিন্তা-ভাবনা এবং কথা বলার মৌলিক যোগ্যতা প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত। প্রকৃতির প্রদত্ত যোগ্যতা ও ক্ষমতা মানুষকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তুলেছে যা মানুষের সহজাত। সহজাত যোগ্যতা ও ক্ষমতার কারণেই মানুষ জীব-জগতে শ্রেষ্ঠ হিসেবে অভিহিত। বুদ্ধ মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সর্ববিধ বৈষম্যকে অস্বীকার করেন। তিনি মানুষকে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার সাহস যুগিয়েছেন। তাঁর ধর্মে মানুষের মানবীয় মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদানের কথা বলেছেন। বুদ্ধ জাতি বা জন্ম সূত্রে কাউকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেননি। তিনি কর্মকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। লোভাসক্ত, দ্বেষাসক্ত, মোহাসক্ত, পাপাসক্ত কুলষযুক্ত লোক ব্রাহ্মণ্য পদবাচ্য হবার উপযোগী নয় কখনো। আত্মমুক্তির কিংবা আত্মনিবেদনের কথা বুদ্ধ কোথাও বলেননি। এ বিষয়ে বুদ্ধের নিম্নলিখিত উক্তিটি গভীরভাবে স্মরণযোগ্য। এ ধরনের উক্তির সত্যতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন ;

অত্তাহি অত্তা নাথো কোহি নাথে পরোসিযা

Dhaka University Institutional Repository

অত্তনাহি সুদন্তেন নাথং লভতি দুল্লভং।[১০৫]

অর্থাৎ, মানুষই নিজেই নিজের একমাত্র নাথ বা আশ্রয় অন্য কেউ নয়। নিজেকে সুসংযত করতে পারলে নিজের মধ্যে দুর্লভ প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ আত্মশক্তির সাথে গভীরভাবে পরিচিতি না হয় ততোদিন সে মানসিকভাবে খুবই দুর্বল থাকে। লোভ-দ্বেষ-মোহ তাকে অতি সহজে পরাভূত করে। যখন ঐ সুপ্ত প্রতিভার জাগরণ কিংবা বিকাশ লাভ হয় তখন সে মহাশক্তির অধিকারী হয়। সকল প্রকার বাঁধা-বিঘ্ন সহজেই অতিক্রম করতে পারে।

সূত্র পিটকের খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত 'ধম্মপদ' নামক গ্রন্থের শেষ এবং ছাব্বিশতম অধ্যায় হলো 'ব্রাহ্মণবর্গ'। ভারতীয় উপমহাদেশে আধিপত্য বিস্তারকরেণ ব্রাহ্মণ্য মতবাদ একধরনের জ্বলন্ত উদাহরণ। তারা মনে করেন করে তারাই শ্রেষ্ঠ মানুষ। ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মজাত মানুষ এখন ব্রাহ্মণ নামে সমধিক পরিচিত। অন্য কেউ এরূপ পদবাচ্যে কখনো ভূষিত হতে পারে না। বুদ্ধ তাতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি প্রচলিত এ সমস্ত সকল প্রকার মতবাদের ঘোরবিরোধী ছিলেন এবং সর্বত্রে তার বজর্নেও কথা বলেছিলেন। তিনি বলেন ;

ন জটাহি ন গোত্তেন ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো
যম্হি সচ্চঞ্চ ধম্মো চ সো সূচি সো ব্রাহ্মণো।[১০৬]

অর্থাৎ, জটা, গোত্র, কিংবা জাতির পরিচয়ে কেই ব্রাহ্মণ হয় না। যাঁর অন্তরে সত্য ও ন্যায় পরায়ণতা বিরাজমান তিনি পবিত্র এবং তিনি ব্রাহ্মণ।

পালি সাহিত্যে 'সুত্ত নিপাত' অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থগুলোর মধ্যে একটি। এই গ্রন্থের 'উরগবর্গের' সপ্তম সূত্র হলো 'বসল সুত্ত বা বৃষল সূত্র'। বৃষল বা অচ্ছুতদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এখানে। সূত্রটি শ্রাবস্তির অগ্গিক ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ্যে করে রচিত হয়। সূত্রটির অন্যনাম অগ্গিক ভারদ্বাজ সূত্রও বলা হয়। সমাজ জীবনযাত্রায় মানুষ তার নিজকর্মের মাধ্যমেই পরিচিতি লাভ করে। জন্মের মধ্যে দিয়ে কখনো নয়। এখানে বসল সুত্রে[১০৭] বুদ্ধের উপদেশে উক্ত হয়েছে ;

ন জচ্চো বসলো হোতি ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণে।
কম্মুনা বসলো হোতি কম্মনা হোতি ব্রাহ্মণো।

অর্থাৎ, জন্মের কারণে কেহ বৃষল হয় না, জন্মের কারণেও কেহ ব্রাহ্মণ হয় না, কর্মের দ্বারা বৃষল হয়, ব্রাহ্মণ ও কর্মের দ্বারাই হয়।

Dhaka University Institutional Repository

একসময় বুদ্ধ কোশল রাজ্যের সুন্দরিকা নদীর তীরে অবস্থান করছিলেন। এসময় সুন্দরিক ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ যেখানে বুদ্ধ সেখানে উপস্থিত হয়ে বুদ্ধকে জাতি বিষয়ে প্রশ্ন করলে বুদ্ধ প্রত্যুত্তরে বলেন ;

ন ব্রাহ্মণো নো'ম্হি ন রাজপুত্তো
ন বেস্সাযনো উদ কোচি নো'ম্হি।[১০৮]

অর্থাৎ, আমি ব্রাহ্মণ নই, রাজপুত্র নই, এমন কি বৈশ্য নই। গোত্রের পরিচয় সাধারণজনের জন্যেই। আমি এগুলোকে তুচ্ছ জ্ঞানে দেখে জগতে বিচরণ করি।

সূত্র পিটকের অন্তর্গত 'দীর্ঘ নিকায়' নামক গ্রন্থের অম্বট্ঠ সূত্র[১০৯] এর মূল আলোচ্য বিষয় জাতিভেদ। জাতিগর্বে অহঙ্কারকারী ও গৌরববোধকারী অম্বট্ঠ নামক যুবককে বুদ্ধকেও যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করতে অস্বীকৃত হয়। বুদ্ধ প্রমাণ করে দিলেন যে, তাঁর পুর্বপুরুষরা শাক্যদের দাসীপুত্র ছিলেন। কিন্তু তিনি সাধনাবলে মহাঋষি হয়েছিলেন। তাঁর হীনজাতি তাকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হওয়ার ক্ষেত্রে বাঁধা দিতে পারেনি। এখানে বুদ্ধ বলেন ; যিনি বিদ্যাচরণ সম্পন্ন তিনি যে জাতিতে জন্ম গ্রহণ করুক না কেন দেব-মানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাছাড়া সূত্র পিটকের অন্তর্গত 'মধ্যম নিকায়' নামক গ্রন্থের 'অশ্বলায়ন সূত্র'-এ জাতিভেদ প্রথার অসারত্ব সম্পর্কে দেখা যায়।[১১০] এখানে বিশেষ কোনো গোষ্ঠী কিংবা বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি অঙ্গুলি সংকেত প্রদর্শন করেননি বা নির্দেশ করেননি তিনি। বরং ব্রাহ্মণের মধ্যেই তিনি আচার-আচরণ, ন্যায়-নিষ্ঠা, দৃঢ়তা-বীর্যতাসহ মানবীয় গুণাবলীসমূহর প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাছাড়া তিনি নিজের উন্নতির জন্য নিজেকে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে আসীন করছেন তিনি। তিনি এ বিষেয়ে বলেন ; 'এই সংসারে যে নাম ও গোত্র প্রকল্পিত হয় তা সংজ্ঞা মাত্র। পৃথক পৃথক জায়গায় যা কল্পনা করা হয়েছে তা সাধারণ সম্মতি হতে উৎপন্ন।[১১১] তিনি আরো বলেন ; যিনি বিদ্যাচরণসম্পন্ন তিনি যে জাতিতেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন তিনি দেব-মানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।[১১২]

মহামতি বুদ্ধের অন্যতম আবিষ্কার মহতী ভিক্ষুসঙ্ঘ। ভিক্ষুসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করে তিনি মানবীয় মর্যাদাবোধ প্রতিষ্ঠা করে তার প্রমাণ করে রেখে গেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংঘে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শুদ্র, বৈশ্য, নাপিত, চণ্ডাল, এমনকি নরঘাতক দস্যু অঙ্গুলিমাল[১১৩] নর্তকী ও বারবণিতা বৈশালীর আম্রপালী[১১৪] উজ্জয়িনীর সভা নর্তকী পদুমবতী[১১৫] রাজগৃহের শালবতীগণিকা,[১১৬] সিরিমা,[১১৭] সামা,[১১৮] সুলসা,[১১৯] কাশীর অর্দ্ধকাশী[১২০] প্রভৃতি প্রথমে বারবণিতা নতর্কী ছিল পরে বুদ্ধ তাদেরকে মানবীয় মর্যাদার অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে তাঁর সংঘে দীক্ষা দিয়েছিলেন। যারা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞানলাভ করে অর্হৎ[১২১] প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এখানেও মানবীয় মর্যাদার স্বীকৃতি যথার্থভাবে

Dhaka University Institutional Repository

পরিলক্ষিত হয়। বুদ্ধ তাদের অবহেলা না করে ধর্মে স্থান করে দিয়ে তাদেরকে ঐ সমস্ত পেশাসহ সবাইকে থেকে মুক্তি দেন। বুদ্ধের ধর্মে প্রবেশ করে তাঁরা নব নব উদ্যেমে মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করলো।

মানুষ যে ধর্ম বা যে গোত্রে বা যে সম্প্রদায়ে বা যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করুক না কেন সকলের স্বাতন্ত্রিক মানবিক মর্যাদাবোধ রয়েছে। সবাই সমমর্যাদা ও সমঅধিকারে সুযোগ পাবে। বুদ্ধ এখানে তাই বোঝাতে চেয়েছেন। মানবাধিকারের অনুচ্ছেদ ২-এ তারই প্রতিধ্বিনি দেখা যায় ; 'যে কোন প্রকার পার্থক্য যথা গোষ্ঠী বা গোত্র বর্ণ, নারী-পুরুষ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্য মতবাদ, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্য মর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেকেই ঘোষণা পত্রে বর্ণিত সকল অধিকার ও স্বাধিকার স্বত্ববান'।[১২২] বৈষম্য এবং অসমতা থাকলে মানুষ স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে না ; কথাবার্তা বলতে পারে না ; সুষ্ঠভাবে অর্পিত কর্ম সম্পাদন করতে পারে না। বুদ্ধ সকলকে তাঁর ধর্মে স্থান দিয়ে সবার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন। শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। তাদের কর্মকে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন।

১. জ. নীতিবোধ ও শৃঙ্খলা

নৈতিকতা শব্দটি 'নীতি' থেকে আগত। 'নীতি' শব্দ-এর সাথে 'ষ্ণিক' প্রত্যয় যোগে গঠিত হয় 'নৈতিক' যার অর্থ 'নীতি' বিষয়ক আর সেই থেকে নৈতিকথা যার অর্থ নীতিবোধ। 'শৃঙ্খল' থেকে 'শৃঙ্খলা' যার শব্দগত অর্থ রীতি, নিয়ম, সুব্যবস্থা, সুবিন্যাস ইত্যাদি। একথা স্বীকার্য যে, নীতিবোধ ও শৃঙ্খলা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। মানবাধিকারের ২৯নং সংখ্যক অনুচ্ছেদে সমাজে নৈতিকতার কথা বলা হয়েছে।[১২৩]

মানুষের মধ্যে বিভিন্নভাবে মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি। নৈতিক শিক্ষা মানবিকতায় উদ্বুদ্ধকরণে গুরুতপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নৈতিক শিক্ষা বুদ্ধ আদর্শ ও নীতির কথা বলেছেন। নৈতিক উন্নতিই হলো মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ। এজন্য দরকার প্রকৃত শিক্ষা। জার্মান শিক্ষাবিদ ফ্রেডারিক হার্বাট শিক্ষা সম্পর্কে বলেন ; 'শিক্ষা হচ্ছে মানুষের বহুমুখী প্রতিভা ও অনুরাগের সুষ্ঠু প্রকাশ এবং নৈতিক চরিত্র গঠন'।[১২৪] এ বিষয়ে আরো দেখা যায় ; শিক্ষা হচ্ছে মানুষের নৈতিক উন্নতির সাহায্যে ইহলোক ও পরলোকের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি। শিক্ষার সাহায্যে মানুষ নিজকে এবং বিশ্বকে জানতে পারে।[১২৫] সুন্দর জীবনযাপন করার উদ্দেশ্যে মহান ও সৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সকলকে শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন কথা বলেছেন। বুদ্ধ উন্নত চরিত্রের অধিকারী হবার উপদেশ দেন। মানুষ নীতিবান না হলে অপরের অধিকার হরণ করা থেকে দুরে থাকা খুব কঠিন। মানুষের নৈতিক এবং চারিত্রিক বিশুদ্ধিতায় বুদ্ধ সবাইকে শীল পরিপালনের উপদেশ দিয়েছেন। 'শীল' শব্দটিকে পালিভাষায় বলা হয় 'সীল'। এটার শব্দগত অর্থ হলো নৈতিক চরিত্রের অভ্যস্থ কর্ম, সচ্চরিত্র-অভ্যাস, সদাচার, নৈতিক অনুশীলন, ন্যায় পরায়ণতা, সততা

Dhaka University Institutional Repository

ইত্যাদি।[১২৬] তিনি মহান ভিক্ষু-শ্রামণদের আচার-আচরণ, নীতিবোধ ও শৃঙ্খলার অধিকার সম্পর্কে যেমন উপদেশ বা বিনয় বা নীতি নৈতিকতার সৃষ্টি করেছিলেন। তেমনি আবার যারা সংসারে (layman-women) থেকে জীবিকা নির্বাহ করেন তাদের কি কি অধিকার থাকা দরকার তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন ;

সীলদস্সন সম্পন্নং ধম্মট্ঠং সচ্চবেদিনং
অত্তনো কম্মকুব্বানং তং জনো কুরুতে পিযং।[১২৭]

অর্থাৎ, যিনি শীলবান, বহুবিষয়ে অভিজ্ঞ, ধার্মিক, সত্যবাদী, এবং নিজ দায়িত্ব-কর্তব্যে নিয়োজিত তিনি সর্বত্রে সকলের প্রিয় হন।

মন হলো সকল প্রকার কর্মের মূল উৎস সকল প্রকার কাজের মধ্যে সর্বাগ্রে অগ্রগামী। এটাকে এক জায়গায় স্থির রাখা যায় না কখনো। মনকে বাদ দিয়ে কোনো কাজ করা সম্ভব নয় কখনো। কুলষিত মনে কাজ করলে পরিণতি খুবই খারাপ হয়। প্রসন্ন মনে কাজ করলে মন খুবই প্রসন্ন থাকে বা মনে খুব সুখ থাকে। এ প্রসঙ্গে ধর্মপদ নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে ;

মনো পুব্বংগমা ধম্মা মনোসেট্ঠা মনোময়া
মনসা যে পসন্নেন ভাসতি বা করোতি বা
ততো নং দুক্খমন্বেতি চক্কং'ব বহতো পদং।[১২৮]

অর্থাৎ, মন হলো সমস্ত ধর্মের পূর্বগামী। সকল প্রকার ধর্ম মন গঠিত এবং মনের উপর নির্ভরশীল। প্রদুষ্ট মনে কেউ কিছু বলে বা করে তাহলে শকটচক্র যেরূপে ভারবাহীর পদ অনুসরণ করে সেরূপ দুঃখ তাকে অনুসরণ করে।

মনো পুব্বংগমা ধম্মা মনোসেট্ঠা মনোময়া
মনসা যে পসন্নেন ভাসতি বা করোতি বা
ততো নং সুখমন্বেতি ছায়া'ব অনপায়িনী।[১২৯]

অর্থাৎ, সমস্ত ধমের্র পূর্বগামী হলো মন। সকল প্রকার কর্ম-ধর্ম মন গঠিত এবং মনের উপর নির্ভরশীল। প্রসন্ন মনে কেউ কিছু বলে বা করে তাহলে সুখ সর্বদা তাকে অনুক্ষণ ছায়ার মতো অনুসরণ করে।

স্বভাবত মন অস্থির এবং চঞ্চল। বুদ্ধ মনকে সংযত রাখার কথা বলেছেন। সিগালোবাদসুত্রে[১৩০] বুদ্ধ গৃহপুত্র সিগালকে তার হৃদয়ে বা অন্তরে অধিকার বা নীতিবোধ জাগিয়ে তুলতে ছয়টি দিকের কথা বলেছেন এভাবে ; ছয় দিকের প্রতি ভক্তি না করে মাতাপিতা পূর্ব দিক, স্ত্রী-পুত্রকে পশ্চিম দিক, বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনকে

Dhaka University Institutional Repository

অধোদিক, আচার্য বা শিক্ষককে দক্ষিণ দিক, শ্রামণ উর্ধদিক ও চাকর-চাকরাণীকে অধোদিক হিসেবে বিবেচনা করার কথা বলেছেন। এছাড়া সাধারণ গৃহীরা যাতে জীবনযাপন করতে গিয়ে বা চলার পথে পরাজিত না হয় সেদিকেও তিনি সজাগ দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। এক সময় বুদ্ধ শ্রাবস্তির অনাথপিণ্ডিকের জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন। এই সময় রাতের শেষে অপূর্ব সৌন্দর্যশালী এক দেবতা সমস্ত জেতবন আলোকিত করে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে অবণত চিত্তে প্রণাম নিবেদন করে পুরুষের কেন নৈতিক পরাজয় হয় তার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। প্রত্তোত্তুরে মহামানব বুদ্ধ বলেছিলেন ; 'জ্ঞানী ব্যক্তির জয় এবং অজ্ঞানী ব্যক্তির পরাজয় ঘটে। ধর্মে অনুরাগীর জয় এবং ধর্ম হিংসাকারীর পরাজয় হয়'। 'যারা অসৎ ব্যক্তিকে প্রিয় মনে করে ; সৎ পুরুষকে প্রিয় মনে করে না। মিথ্যাধর্মে রুচিশীল হয়, তার পরাজয় ঘটে'। 'যে ব্যক্তি নিদ্রাশীল, সহচরানুক্ত, উৎসাহহীন, অলস ও ক্রোধ পরায়ণ সেই ব্যক্তির পরাজয় হয়'। 'যে ব্যক্তি ধনবান হয়েও বৃদ্ধ মাতা-পিতার ভরণ-পোষণ করে না তার পরাজয় হয়'। 'যে ব্যক্তি শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, কিংবা অসহায় লোককে মিথ্যাবাক্যেও মধ্য দিয়ে প্রতারণা করে সেই ব্যক্তির পরাজয় হয়'। 'জাতির অহঙ্কারী, ধনের অহঙ্কারী গোত্রের অহঙ্কারী মানুষ নিজের আত্মীয়গণকে অবজ্ঞা করে কিংবা ঘৃণা করে, তার পরাজয় হয়'। 'যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রী ছাড়াও পরস্ত্রীতেও আসক্ত, নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবনকারী, জুয়াখোর ও পাশা খেলায় অভ্যস্ত হয়ে লব্ধ সম্পত্তি বিনাশ সাধন করে ; সেই ব্যক্তির পরাজয় হয়'। 'যে পুরুষ নিজের স্ত্রীতে সন্তুষ্ট না হয়ে গণিকার সাথে এবং পরস্ত্রীর সাথে কামসেবা করে ; সেই ব্যক্তির পরাজয় হয়'। 'যে ব্যক্তি বৃদ্ধকালে অল্প বয়স্ক মহিলা বা যুবতী নারী বিবাহ করে কিন্তু নারী স্বামীতে তৃপ্ত না হয়ে পর পুরুষের প্রতি আসক্ত হয়। তা দেখে বৃদ্ধ স্বামী ঈর্ষানলে দগ্ধ হয়ে সুখে নিদ্রা যেতে পারে না'। 'মাদকজাতীয় দ্রব্য পানকারিনী, অযথা অর্থ ব্যয়কারিনী স্ত্রীকে অথবা সেইরূপ পুরুষকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসেবে নিযুক্ত দান করলে তা পরাজয়ের কারণ হয়'।[১৩১]

বিদ্ধান, জ্ঞানী কিংবা পণ্ডিত ব্যক্তি মাত্রই পরাজয়ের কারণসমূহ দর্শন করে কিংবা জ্ঞাত হয়ে কৌশলে বর্জনীয় বিষয়সমূহ সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেন এবং কায়-বাক্য-মনে ও নৈতিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কুশল কর্ম সম্পাদন করেন। ফলে কারো পরাজয় হবার সম্ভাবনা থাকে না। বরঞ্চ সর্বত্রে পূজিত হন। অঙ্গুত্তর নিকায়ের অষ্টম নিপাতের 'দীঘজানু সুত্তং'-এ বুদ্ধ নৈতিক উপদেশ দিয়েছেন।[১৩২]এছাড়া বুদ্ধ গৃহপতি[১৩৩] বর্গে গৃহীদের (laymen-women)অধিকার সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করেছেন। গৃহিরী যদি উপরি-উক্ত অধিকারগুলো যথাযথভাবে জেনে সেই অনুযায়ী নিজেদের মধ্যে শৃঙ্খলা আনয়ন করা যায় তাহলে সর্বত্র তাদের যশঃ-খ্যাতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এমনটি আশা করা যায়। বুদ্ধের নৈতিকতা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মানুষের মানবিক আচার-আচরণের মানদণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। নীতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করা এবং নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলার

Dhaka University Institutional Repository

আগ্রহ কিংবা উৎসাহ সৃষ্টি করাই হলো বুদ্ধের নৈতিকতা প্রতিষ্ঠার অন্যতম শর্ত। প্লেটোর কথা দিয়ে বলা যায়, নৈতিক গুলবলী বিকাশের পরিপন্থী কোনো কিছু শিক্ষার মধ্যে থাকবে না।[১৩৪]

১. ঝ. অর্থনৈতিক অধিকার

ব্যক্তির সামাজিক নিরাপত্তার মধ্যে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা অন্যতম। অর্থনৈতিক নিরাপত্তার বিষয়টি মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে সুপ্রসারিত। মানবজীবনের সবদিক এর সাথে অর্থচিন্তা সম্পর্কযুক্ত। জীবিকা অন্বেষণ, ধন অর্জন উৎপাদন ইত্যাদির ক্ষেত্রে নিরাপত্তার প্রয়োজন। পৃথিবীর অন্যান্য সব দেশের মতো ভারতীয় উপমহাদেশে পশু শিকার করার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক জীবনের যাত্রার বিকাশ লাভ করে। পরবর্তী সময়ে ক্রমান্বয়ে হরপ্পা-মহোঞ্জাদাড়ের প্রথম নগর সভ্যতা, পশুচারণ অর্থনীতি, কৃষি অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার পর খ্রি. পূ. ৬ষ্ঠ থেকে খ্রি. পূ. তৃতীয় শতাব্দীতে কৃষি অর্থনীতির প্রসার ও দ্বিতীয় নগরজীবন পদ্ধতির ক্রমুত্থান ঘটে। প্রাচীন ভারতে ষোড়শ মহাজনপদের নাম দেখা যায়। এগুলো[১৩৫] হলো : ১. অঙ্গ, ২. মগধ, ৩. কাশী, ৪. কোশল, ৫.বৃজ্জি, ৬. মল্ল, ৭. চেদি, ৮. বৎস, ৯. কুরু, ১০. পাঞ্চাল, ১১. মৎস্য, ১২. শূরসেন, ১৩. অশ্মক, ১৪. অবন্তী, ১৫. গান্ধার, এবং ১৬. কম্বোজ। এ সব মহাজনপদের বেশীর ভাগই ছিল রাজতন্ত্র। তবে, কয়েকটিতে গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল।

উপরি-উল্লিখিত মহাজনপদের উদ্ভাবন এটাই প্রমাণ করে যে, তৎসমকালীন সময়ে ক. কৃষি প্রধান গ্রামীণ অর্থনীতির প্রসার ঘটেছে, খ. উদ্বৃত্ত উৎপাদন যথাযথ আহরণ করে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ক্রমশ সজ্ঘতরূপকরণে সহায়তা করছে।[১৩৬] বৌদ্ধগ্রন্থ বিনয় পিটক, দীর্ঘ নিকায় ও মধ্যম নিকায়, সুত্ত নিপাত, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে জানা যায়, বুদ্ধের সময়কালে কৃষি কাজের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল, লাঙ্গলের ফলা কাস্তে, বিভিন্ন কৃষিজ যন্ত্র তৈরীতে লোহার ব্যবহার ছিল। ধানের উৎপাদন ছিল সবচেয়ে বেশী।

খ্রি. পূ. ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে যাগযজ্ঞে পশুবলীর কারণে গো সম্পদ হ্রাস পেয়েছিল যার কারণে গবাদি পশুর স্বল্পতায় কৃষি কাজের ব্যাঘাত ঘটেছিল। এই কারণেই বৌদ্ধধর্মে পশু হত্যাকে নিরুৎসাহিত করা হয়। ফলে, কৃষি অর্থনীতির বিকাশ সাধিত হয়। মানবের অধিকার নিশ্চিতকরণে উপায় হিসেবে দীর্ঘ নিকায়ের কূটদন্ত সূত্রে[১৩৭] বুদ্ধ বলেন ; শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত অশান্ত রাজ্যে জেল-জরিমাণা, শিরচ্ছেদ দিয়ে চুরি, ডাকাতি, লুণ্ঠন, হত্যা নির্যাতন, বিশৃঙ্খলা পুরোপুরি বন্ধ করা যাবে না এবং এ সময় রাজা কর্তৃক জনগণের কাছ থেকে কর গ্রহণ জনগণের প্রতি রাজা দায়িত্ব কর্তব্যহীনতার পরিচয় বহন করবে। উচ্ছৃঙ্খলা পুরোপুরি দূর করে রাজ্যে চিরস্থায়ী শান্তি আনার উপায়সমূহ হচ্ছে : কৃষিকাজ করতে সমর্থ কৃষকদেরকে চাষাবাদের সুবিধার জন্য বীজধান প্রদান, যারা ব্যবসা করতে চায় তাদেরকে মূলধন/ঋণ দিয়ে সহযোগিতা করা, বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য যারা সরকারী চাকুরী করতে চায় তাদেরকে উপর্যুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

বেতন দিয়ে চাকুরীতে নিযুক্ত করা। তবে রাজ্যে চুরি ডাকাতি, লুণ্ঠন, হত্যা, নির্যাতন বিশৃঙ্খলা বন্ধ হয়ে যাবে। রাজা কর্তৃক প্রজার অধিকার সম্পর্কে 'দীর্ঘ নিকায়' নামক গ্রন্থের চক্কবত্তিসীহনাদ[১৩৮] নামক সূত্রে দেখা যায় ; রাজার উচিত প্রজাদিগকে ন্যায় সমতার সহিত রক্ষা করা, রাজ্যে অন্যায়ের দিকে লোকদের প্রবৃত্তি হতে না দেওয়া। যারা দরিদ্র তাদেরকে অর্থ উপার্জন করার মতো কাজে লাগিয়ে দেওয়া ; রাজ্যের সৎ শ্রমণ ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে কী কর্তব্য কী অকর্তব্য বুঝে নেওয়া এবং সেই উপদেশ মোতাবেক রাজাকে নিজ কর্তব্যে রত থাকতে হবে। এখানে দেখা যায় কোনো ব্যক্তি সম্পদ সৃষ্টি করতে না পারলে সে দরিদ্র হয় এবং দরিদ্রতাই দুর্নীতি এবং নানাবিধ অপরাধের (চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার উত্যাদি) অন্যতম মূল উৎস। তাছাড়া এখানে রাজনৈতিক অধিকারের প্রতিফলন দেখতে পাই।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার জন্য বুদ্ধ অঙ্গুত্তর নিকায়ের অষ্টম নিপাতের 'দীঘজানু সুত্তং' (এটি ব্যগঘ্পজ্জ সূত্র বহুল পরিচিত)-এ গৃহীদের উপলক্ষ্য করে বুদ্ধ একটি সুন্দর সর্বজন গ্রহণযোগ্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন চার ধরনের সম্পদ ইহজগতে সুখ ও হিত আনয়ন করতে সক্ষম। এগুলো হলো[১৩৯] : ক. উত্থান বা উৎসাহ সম্পদ, খ. সংরক্ষণ সম্পদ, গ. কল্যাণমিত্রতা বা সৎলোকের সংশ্রব সম্পদ এবং ঘ. সমজীবিকা সম্পদ বা শৃঙ্খলাবদ্ধ সম্পদ।

ক. উত্থান বা উৎসাহ সম্পদ : উত্থান বা উৎসাহ হলো ধন-সম্পদ সংগ্রহের ব্যাপারে যে কর্ম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, সেটা কৃষি হোক বা বাণিজ্য দ্বারা হোক, গো পালন দ্বারা হোক বা তীরন্দাজ কর্ম দ্বারা হোক বা অন্য কোনো শিল্পকর্ম দ্বারা হোক সে হয় দক্ষ, নিরলস ; সে হয় প্রতিভাদীপ্ত, যে কোনো ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসুমনা, সে তার কর্মব্যবস্থা করতে এবং চালিয়ে যেতে সক্ষম কিনা খোঁজ-খবর নেওয়া প্রয়োজন। একে বলা হয় 'উত্থান বা উৎসাহ সম্পদ' ।

খ. সংরক্ষণ সম্পদ : যে ব্যক্তি নিজ উদ্যম, উৎসাহ ও কঠোর পরিশ্রম দ্বারা যে সম্পদ লাভ করে তা শ্রমলব্ধ সেই ধন-সম্পদ কীভাবে সুরক্ষিত থাকে ; অন্যায়ভাবে কেই অধিকার কতে না পারে ; চোর কর্তৃক হরণ না হয় কিংবা অগ্নি দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয় ; পানি দ্বারা বিনষ্ট না হয় ; ঈর্ষাপরায়ণ জ্ঞাতি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সে ব্যাপারে সর্তক থেকে নিজ দন-সম্পদ রক্ষায় সচেতন থাকা উচিত। এটাকে বলা হয় 'সংরক্ষণ সম্পদ'।

গ. কল্যাণমিত্রতা বা সৎলোকের সংশ্রব সম্পদ : যে গ্রামে বা নিগমে বাস তথায় যে গৃহপতি যে গৃহপতি বা গৃহপতিপুত্র বা যুবক বা বৃদ্ধ শ্রদ্ধাসম্পন্ন, শীলসম্পন্ন, ত্যাগশীল, প্রজ্ঞাসম্পন্ন তাদের সাথে অবস্থান করে,

Dhaka University Institutional Repository

কথা বলে, আলাপ-আলোচনা করে, শ্রদ্ধা সম্পন্নদের যে শ্রদ্ধা তা অনুকরণ করে, শীলসম্পন্নদের যে শীল সম্পদ তা শিক্ষা করে, ত্যাগীশীলদের যে ত্যাগসম্পদ তা শিক্ষা করে, প্রজ্ঞাসম্পন্নদের যে প্রজ্ঞাসম্পদ তা অনুকরণ করে। একই বলা হয় 'কল্যাণমিত্রতা বা সৎলোকের সংশ্রব সম্পদ'।

ঘ. সমজীবিকা সম্পদ বা শৃঙ্খলাবদ্ধ সম্পদ : যখন যে ব্যক্তি সমাদর লাভ এবং ক্ষতি উভয়ই প্রত্যক্ষ করে সে সমজীবিকা নির্বাহ করে, অতি উচ্চও নহে অতি নিম্ন নহে। সে চিন্তা করে ' এরূপ আমার আয়, খরচ বাদ দিয়ে আমার থাকবে এতো এবং আমার খরচ আয় ছাড়িয়ে যাবে না। একে বলা হয় 'সমজীবিকা সম্পদ বা শৃঙ্খলাবদ্ধ সম্পদ'।

উত্থান বা উৎসাহে দেখা যায় যে, সম্পদে কৃষি, বাণিজ্য, গো-পালন, সৈনিকের কার্য, সরকারী কার্য অথবা অন্য যে কোনো কার্যে জীবনযাপন করা হোক, সেই সব কার্যে নিপুণ পরিশ্রমী ও উপায় কুশল হওয়া উচিত। সংরক্ষণে দেখা যায় যে, সৎভাবে কঠোর পরিশ্রমে অর্জিত সম্পদ চোর, আগুণ, বন্যা ও ঈষাপরায়ণ জ্ঞাতিগণ কর্তৃক যেন নষ্ট না হয় সেভাবে সংরক্ষণ করার উল্লেখ দেখা যায়। কল্যাণমিত্রতা বা সৎলোকের সংশ্রব সম্পদ-এ দেখা যায় যে, প্রতিবেশী সৎলোকের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং আলাপ-আলোচনা তথা পারস্পরিক সম্প্রীতির মাধ্যমে বসবাস করলে সৎসঙ্গীর সংস্রব মানবজীবনের মহাকল্যাণ সাধিত হয়। সমজীবিকা সম্পদ বা শৃঙ্খলাবদ্ধ সম্পদ-এ দেখা যায় যে, কৃপণ নয়, অমিয়ব্যায়ীও নয় মিতব্যয়ী হয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যয় করবে। সর্বদা ব্যয়ের চেয়ে আয় বেশী করবে, নিজের আয় ব্যয়ের পরিমাণ সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান থাকা বাঞ্চনীয়। বুদ্ধের এ ধরনের হিতোপদেশ আধুনিক অর্থনৈতিক উত্তোরত্তর উন্নতি-সমৃদ্ধির ইঙ্গিত বহন করে।

গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উপরি-উক্ত চারটি (উত্থান বা উৎসাহ সম্পদ, সংরক্ষণ সম্পদ, কল্যাণমিত্রত বা সৎলোকের সংশ্রব সম্পদ এবং সমজীবিক বা শৃঙ্খলাবদ্ধ সম্পদ) বিষয় কল্যাণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে সুপ্রযোজ্য। তাই এখনো এগুলোকে প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

ধন-সম্পদ-সম্পত্তি সংরক্ষণে বুদ্ধের উপদেশ এখনো যুগোপযোগী মনে হয়। মানুষ কষ্ট করে ধনসম্পদ করে। ভুল সিদ্ধান্তের কারণে এই সম্পদ আবার বিনষ্টও করে। সম্পদ সুরক্ষা অত্যাবশকীয়। ব্যক্তির অনেক কষ্টে অর্জিত ধন-সম্পদ সুরক্ষা করা প্রসঙ্গে বলেন ; সম্পদ আয়ের চারটি পথ। চারটি পথ[১৪০] হলো : ক. স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি থেকে বিরতি, খ. সুরাপান অর্থাৎ মাদকজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরতি, গ. জুয়া ও পাশা খেলায় বিরতি, এবং ঘ. কল্যাণকর্ম সম্পাদনকারীর সাথে বন্ধুত্ব, সাহচর্য এবং ঘনিষ্টতা। এ বিষয়ে 'সুত্ত নিপাত' নামক গ্রন্থে দেখা যায়, আলবক সুত্তং-এ আলবক যক্ষ বুদ্ধ প্রশ্ন করেন কীভাবে ধন লাভ করা যায়?। উত্তরে বুদ্ধ বলেন; 'পতিরূপকারী

Dhaka University Institutional Repository

ধুরবা উট্ঠাতা বিন্দতে ধনং'। অর্থাৎ প্রতিরূপকারী, অধ্যাবসায়ী উৎসাহী ব্যক্তি ধন লাভ করেন।[১৪১] ধন যেমন লাভ হয় তেমনি আবার ক্ষয়প্রাপ্তও হয়।

পালি সাহিত্যের 'দীর্ঘ নিকায়' নামক গ্রন্থের ' সিগালোবাদ সূত্রে' কি কি কারণে ধনসম্পদ ক্ষয়প্রাপ্ত হতে পারে সেই সম্বন্ধে একটি ধারণা পাওয়া যায়। অধার্মিক গৃহস্থের (মানুষের)[১৪২] কষ্টে অর্জিত সম্পদ ছয়টি কারণে নষ্ট হয় ১. মত্ততাজনক নেশা জাতীয় দ্রব্যে আসক্তি হওয়া ; ২. অসময়ে পথেঘাটে বিচরণ করা ; ৩. নৃত্য-গীত গানের মাধ্যমে হওয়া, ৪. দ্যূতক্রীড়ায় অর্থাৎ পাশা, তাস, জুয়াখেলা ইত্যাদিতে আসক্তি হওয়া ; ৫. পাপমিত্র বা অসৎ মিত্র সংসর্গ লাভ করা ; ৬. আলস্য পরায়ণতা হওয়া। তাছাড়া উপরি-উক্ত সূত্রে এই ধরনের খারাপ প্রবৃত্তি ব্যক্তি ও সমাজের বিভিন্ন মারাত্মক ক্ষতি সাধন করতে পারে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যাও রয়েছে। উল্লিখিত আসক্তিসমূহ পরিত্যাগ করতে পারলে পরিবারে, সমাজে কিংবা রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়। কখনো অর্থনেতিক বিপর্যয় ঘটবে না।

প্রাচীন ভারত ছিল কৃষি প্রধান বা কৃষি প্রবল দেশ। বিভিন্ন বৌদ্ধ সূত্রে[১৪৩] কৃষির সম্পর্কিত আলোচনা দেখা যায়। কৃষিকাজে জলসেচনের ব্যবস্থাও ছিল। ফলে কৃষি কাজ ভালো হতো। এখানে দেখা যায় কৃষি কাজে গবাদি পশু সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচিত ছিল।[১৪৪] পালি সাহিত্যের অন্তর্গত সুত্র পিটকের নিকায় সাহিত্যের 'অঙ্গুত্তর নিকায়' নামক গ্রন্থে দেখা যায়, কৃষি কাজে পশুর ব্যবহার হয়। তাই পশুর সম্যকভাবে সুরক্ষার ব্যবস্থা করার কথা বলেছেন[১৪৫]। এক সময় বুদ্ধ শ্রাবস্তির অনাথপিণ্ডিকের আরামে বাস করছিলেন। এমন সময় কোশলের ধনাঢ্য জরাগ্রস্থ, বৃদ্ধ বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে এসে প্রাচীন ব্রাহ্মণগণের অনুসরণীয় ধর্ম প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে বুদ্ধ বলেন ;

উপট্ঠিতস্মিং যঞ্ঞস্মিং নাস্সু গাবো হনিংসু তে
যথা মাতা পিতা ভাতা অঞ্ঞে বাপি চ ঞাতকা
গাবো নো পরমা মিত্তা যাসু জায়ান্ত ওসধা।[১৪৬]

অর্থাৎ, যজ্ঞ সময়ে উপস্থিত হয়ে তারা (প্রাচীন ব্রাহ্মণরা) গো হত্যা করতেন না। কেননা, মাতা-পিতা, ভাই-বোন এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের ন্যায় গরু আমাদের পরম মিত্র স্বরূপ। তাদের নিকট হতে নানাবিধ ওষুধের সৃষ্টি হয়।

অন্নদা বলদা চেতা বণ্ণদা সুখদা তথা
এতমত্থবসং ঞত্বা নাস্সু গাবো হনিংসুতে।[১৪৭]

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ, গরু অন্ন প্রদানে সহায়তা করে, বল প্রদান করে, বর্ণ শ্রীবৃদ্ধিকরণে সাহার্য করে এবং সুখ প্রদান করে। তাই তারা কখনো গরু হত্যা করতেন না।

তাছাড়া এক সময় উপদেশ প্রদান করার সময় বুদ্ধ উপমায় বলেন ; 'কৃষকেরা বার বার বীজ বপন করে। বার বার কৃষকেরা ক্ষেত্র বপন করে, বার বার রাজ্য ধানে সমৃদ্ধ হয়'।[১৪৮] পরিশ্রম ও উত্থান কৃষিকাজের উন্নতিতে বলিষ্ট ভূমিকা পালনে সহায়ক হয়। মহামানব বুদ্ধ একজন ব্যক্তির পারিবারিকভাবে মঙ্গল-উন্নতির জন্য সামগ্রিকভাবে দশ প্রকার বিষয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। দশটি বিষয় হলো : ক. উৎপাদনশীল ক্ষেত্র (ফলনযোগ্য জমি), খ. ধন ও ধান্য (অর্থ ও শস্য), গ. স্ত্রী-সন্তান, ঘ. দাস-কর্মচারী ও ভৃত্য, ঙ. চতুষ্পদী গৃহপালিত পশু, চ. শ্রদ্ধাগুণ, ছ. শীলগুণ বা নৈতিকতা, জ. শ্রুতি, ঝ. ত্যাগগুণ বা উদারতা এবং ঞ. প্রজ্ঞার অধিকারী হওয়া।[১৪৯] উপরি-উক্ত দশবিধ বিষয় রাষ্ট্রে সামগ্রিকভাবে ভারসাম্যময় অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত বুদ্ধের সুদুর প্রসারী চিন্তা ও চেতনার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। বুদ্ধ সামাজিক জীবনের প্রতিবন্ধকতাগুলো অনেকাংশে বিদূরিত করে জনসাধারণের জন্য গ্রহণযোগ্য, কল্যাণকর, মঙ্গলময়, সুখকর, জীবনযাপন পদ্ধতির গঠনমূলক সুবিন্যাসিত রূপরেখা নির্দিষ্ট করেন। যেখানে কৃষি কাজের কথাও দেখা যায়। ধারণা করা হয়, এধরনের কৃষি কাজের পেছনেও একধরনের কল্যাণবোধ কাজ করেছিল। বুদ্ধ মতে, গরু সকলের পরমমিত্র এবং কৃষি কাজে সহায়তা করে।[১৫০]

মানুষ অতি কষ্টে ধন-সম্পদ অর্জন করে। অর্জিত অর্থ-বিত্ত সংরক্ষণ করে। সেই অর্জিত সম্পদ আবার অপব্যবহারে নষ্ট হয়। বুদ্ধ বলেন ; মানুষের কষ্টে অর্জিত সম্পদ ছয়টি[১৫১] কারণে নষ্ট হয় ১. নেশা দ্রব্যে আসক্তি ; ২. অসময়ে পথে ঘাটে বিচরণ ; ৩. বেশ্যাসক্তি, ৪. পাশা, তাস, জুয়াখেলা ইত্যাদিতে আসক্তি ; ৫. অসৎ মিত্র সঙ্গ আসক্তি ; ৬. আলস্য পরায়ণতা। এধরনের খারাপ প্রবৃত্তি ব্যক্তি ও সমাজের বিভিন্ন মারাত্মক ক্ষতি সাধন করতে পারে, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। উল্লিখিত আসক্তিসমূহ পরিত্যাগ করতে পারলে পরিবারে, সমাজে কিংবা রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়। কখনো অর্থনেতিক বিপর্যয় ঘটবে না। এক সময় শ্রাবস্তির শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক-এর সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধ বলেন ; একজন সাদারণ গৃহস্তের চারটি বিষয়ে নজর কিংবা গুরুত্ব দেওয়া উচিত।[১৫২] যথা : ক. অত্থি সুখ : সৎ পথে অর্জিত ধনসম্পদ, খ. ভোগ সুখ : ব্যক্তির তার পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন-এর ক্ষেত্রে অর্থের যথাযথ ব্যহাহার, গ. অনন সুখ ; সর্ব প্রকার ঋণ থেকে মুক্ত থাকা, এবং ঘ. অনবজ্জ সুখ : যে সুখ বর্জনীয় নয়। অর্থাৎ নিস্পাপ, সুন্দর ও অনিন্দ্য সুখ। এটি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধ অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য গৃহীদের উপদেশ দিতেন। অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বুদ্ধ অর্জিত আয়-সম্পদ চারভাগে ভাগ করে ব্যয় ও ভোগ করতে বলেছেন এভাবে ;

একেন ভোগেন ভূঞ্জেস্য, দ্বীহি কম্মংপযোজযে

চতুত্থং ক নিয়াপিয্য আপদাসু ভবিস্সতী'তি।[১৫৩]

অর্থাৎ, সঞ্চিত ধন হতে চার ভাগের এক ভাগ দিয়ে সুন্দরভাবে জীবনযাত্রা করবে, দুই ভাগ দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করবে। চতুর্থ ভাগ ভবিষ্যতের নানারকম আপদ বিপদের জন্য সঞ্চয় করে রাখবে।

যদি কেউ বুদ্ধের সৎ-পরিপূর্ণ উপদেশ অনুযায়ী চার ভাগের বিভক্ত আয়কৃত ধন-সম্পদ খরচ করে তবে তার প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়। ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগের ফলে উন্নতিজনিত ধন-সম্পদ আয় ক্রমশঃ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। সঞ্চয় করার ফলে নানারকম দুর্ঘটনা ও বিপদের আর্থিক অভাব-অনটন থাকে না। পারিবারিক শান্তি, ছেরে-মেয়ের শিক্ষাগ্রহণেও এটি অসাধারণ ভূমিকা পালন করে। শুধু তাই নয়, সঞ্চয় ভবিষ্যৎ মূলধন সৃষ্টিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থনৈতিক চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে বুদ্ধের এ ধরনের অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি সুদূর প্রসারী ও কালজয়ী।

বুদ্ধের কাছে ধন-সম্পদ অর্জন করার পাশাপাশি মানবিক ও নৈতিকতা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বুদ্ধ বোধিজ্ঞান লাভ করার পর থেকে সমাজ ব্যবস্থাপনায় সুন্দরভাবে জীবন যাপন করার ক্ষেত্রে একটি নান্দনিক আচরণমালা ব্যবহার করার কথা বলেছেন যেটি ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্রে[১৫৪] দেখা যায়। এটি আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ নামে পরিচিত। এগুলো হলো আদর্শ জীবনগঠনের দর্শন। নৈতিক চিন্তা-চেতনার মূলস্তম্ভ। মার্গটির পঞ্চম মার্গের নাম হলো সম্যক জীবিকা সৎভাবে জীবন যাপন করার এক বিশেষ পদ্ধতি। অর্থনৈতিক কার্যক্রম অর্থাৎ উপাদান, ভোগ, বণ্টন, বিনিময়, যদি এ আটটি পথে পরিচালিত হয় তাহলে আধুনিক অর্থনীতি সকল মানুষের কল্যাণ বৃদ্ধি করতে পারবে। মানুষ বেঁচে থাকার জন্য নানারকম পেশাবলম্বন করে। আমাদের এটাও মনে রাখা দরকার যে, অর্থ উর্পাজনের জন্য যে কোনো পেশা গ্রহণ করলে পেশা মহৎ হয় না। মহৎ হবার জন্য দরকার শুদ্ধ পেশা। যে পেশা অন্যকে প্রবঞ্চনা করতে শেখায়, পীড়া দিতে শেখায় সেই পেশা কখনো পুত-পবিত্র হয় না। তাই বুদ্ধ পাঁচ ধরণের ব্যবসা-বাণিজ্যকে[১৫৫] অকল্যাণকর বলে নিষেধ করেছেন।

অনেক মুনাফা লাভের প্রত্যাশায় উপরি-উক্ত পাঁচটি বাণিজ্যের বর্তমানে প্রচার-প্রসার হচ্ছে–এর ফলে মানবজীবনে সুখ-শান্তি নষ্ট হচ্ছে। নিষিদ্ধ বাণিজ্যসমূহ ব্যক্তি, গোত্র, সমাজ, জাতি সর্বোপরি রাষ্ট্র বিনির্মাণে ক্ষতিকর। বুদ্ধ

Dhaka University Institutional Repository

নির্দেশিত উপরি-উক্ত পথ পরিত্যাগ করে চললে অর্থনৈতিক কার্যক্রম উন্নয়ন সাধিত হয় এবং ব্যক্তি জীবনে সুখ-শান্তি কল্যাণ প্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভব। বুদ্ধ অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেন। তিনি চাইতেন সকলে অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল হোক। সবাই অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল হলে মানুষের খারাপ অভ্যাস কমে যাবে। তিনি আসক্তি পরায়ণ হয়ে সম্পদ কিংবা ধন মজুদের পক্ষে কথা বলেননি। বাঁচার তাগিদে বহুরকম ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজন। তবে, জীবনযাপনের জন্য সকল প্রকার বাণিজ্যের কথা বললেও পঞ্চবাণিজ্যের অনুমোদন কিংবা সমর্থন দেননি।

বুদ্ধ তাঁর জীবদ্দশায় জনগণের মহাকল্যাণে যে আটত্রিশ প্রকার মঙ্গলের কথা উল্লেখ করেন। এগুলো মূলত শীল বা সদাচার বা নৈতিকবিধান সংক্রান্ত হলেও তাতে অর্থনৈতিক দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায়। ধন উপার্জন করতে বিভিন্নরকম শিল্পশিক্ষা গ্রহণ করা আবশ্যক। এই সম্পর্কে মহাজ্ঞানী বুদ্ধ তিনি বলেন ;

বাহু সচ্চঞ্চ বিনযো চ সুসিক্খিতো
সুভাসিতা চ যা বাচা এতং মঙ্গলং মুত্তমং।[১৫৬]

অর্থাৎ, বহুবিদ্যা শিক্ষা করা, বহুশিল্প শিক্ষা করা, বিনয়ে সুশিক্ষিত হওয়া, মিথ্যাবাক্য পরিহার করে সত্যভাষণের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করা উত্তম মঙ্গল।

সততার মাধ্যমে অর্জিত ধন-সম্পদের ব্যয় কী করে করা হবে সেই ব্যয় প্রসঙ্গে বুদ্ধের উপদেশ হলো ;

মাতাপিতু উপট্ঠানং, পুত্তদারস্স সঙ্গহো
অনাকুলাচ কম্মন্তা, এতং মঙ্গলং মুত্তমং।[১৫৭]

অর্থাৎ, মাতা-পতিার সেবা , স্ত্রী-পুত্রের যথাযথ ভরণপোষণ করা, অকুশলকর্ম পরিত্যাগ করে সৎ ও সততার ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা উত্তম মঙ্গল।

দানঞ্চ ধম্মচরিয়া চ, ঞাতকানঞ্চ সঙ্গহো
অনবজ্জানি কম্মানি, এতং মঙ্গলমুত্তমং।[১৫৮]

অর্থাৎ, দান দেওয়া ও কায়-বাক্য-মনে ধর্মাচরণ করা, জ্ঞাতিগণের কল্যাণ সাধন করা, নিষ্পাপ কর্ম সম্পাদন করা এবং সদ্ধর্মে অবিচল থাকাই উত্তম মঙ্গল।

অরতি বিরতি পাপা, মজ্জপানা চ সঞ্ঞমো

Dhaka University Institutional Repository

অপ্পমাদো চ ধম্মেসু, এতং মঙ্গলমুত্তমং।[১৫৯]

অর্থাৎ, কায়িক ও মানসিক পাপে অনাসক্তি, শারীরিক ও বাচনিক পাপে বিরতি, মদ্যপানে সংযম ও অপ্রমত্তভাবে কুশলকর্ম সম্পদন করাই উত্তম মঙ্গল।

উপরি-উক্ত উপদেশে বুদ্ধ ধনোপার্জনের জন্য কেবল শাস্ত্রশিক্ষা লাভ করে ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা সৎ জীবনযাপনে পরামর্শ দিয়েছেন এমনটি নয়। এখানে তিনি কষ্টার্জিত ধন-সম্পদ যথাযথরূপে ব্যয় করার পথ প্রদর্শন করে মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র-এর ভরণপোষণ ও আত্মীয়-স্বজনকে আর্থিকভাবে সহায়তা করে কায়িক-বাচনিক ও মানসিক শুদ্ধাচারে জীবন অতিবাহিত করার কথা বলেছেন। সমাজ বিনির্মানেও তিনি সচেতন ছিলেন। তাইতো তিনি মদ্যপান বর্জনের উপদেশ দিয়েছিলেন।

কৃষি অর্থনীতির পাশাপাশি কারিগর শিল্প ও নানাবিধ পেশারা পরিচয় পাওয়া যায় বৌদ্ধ সাহিত্য। কারিগরি শিল্প, মৃৎশিল্প, কর্মকার, স্বর্ণকার, দন্তকার, তাতী, কার্পেন্টার, নাপিত, ভৈষজ চিকিৎসকসহ বিভিন্ন পেশা ও শিল্প ইত্যাদি পেশা পালি সাহিত্যে থেকে জানা যায়।[১৬০] কৃষি শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অগ্রগতির ফলে পুনরায় নগর সভ্যতার আবির্ভাব হয়। সুত্তপিটকের দীর্ঘনিকায় নামক গ্রন্থের 'মহাপরিনির্বাণ সূত্রে' বুদ্ধের সমকালীন ষাটটি নগরের উল্লেখ রয়েছে।[১৬১] অর্থনৈতিক সমৃদ্ধকরণে বনজসম্পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বুদ্ধজীবনের সাথে বনজসম্পদ বা গ্রামীণ অর্থনীতির নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বুদ্ধ যে সমস্ত নগরে পরিভ্রমণ করেছেন তার প্রায় প্রত্যেকটিতে বন রয়েছে যেগুলোকে পণ্ডিতরা তরুবীতি বলে। যেমন : কুশীনারা বা কুশীনগরের উপবত্তন নামক শালবন, [১৬২] পিপ্ফলি বন,[১৬৩] কৌশাম্বীর আম্রবন বা আম্রকানন,[১৬৪] রাজগৃহের বেনুবন[১৬৫] ইত্যাদির নাম অর্থনৈতিক দিক থেকে কার্যকর ছিল। তাছাড়া বৌদ্ধধর্মের সাথে সম্পর্কিত অনেক নগরীর নামকরণ করা হয়েছে কোনো কোনো গাছের নামে। কুশীনগর, কুশাগ্রপুর [এটি রাজগৃহের পুরানো নাম যাকে আদি গিরিব্রজপুরও (গোচারণ ভূমি) বলা হতো], পাটলিগ্রাম যা পাটলিপুত্র নামে সমধিক পরিচিত (এটি ছিল পাটলি গাছের সাথে সম্পর্কযুক্ত), চম্পা নামের সম্পর্ক ছিল চম্পক বৃক্ষের সাথে। এই সমস্ত গাছগুলোও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অসাধারণ ভূমিকা পালন করে।

সামাজিক নিরাপত্তাকে সুদৃঢ়করণ করার জন্য অর্থনৈতিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দরকার। মানবাধিকারের ২২ নং অনুচ্ছেদে দেখা যায় ; সমাজের সদস্য হিসেবে প্রত্যেকেরই সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে।[১৬৬] এখানে সামাজিক নিরাপত্তায় অর্থনৈতিক নিরাপত্তার উল্লেখ রয়েছে। বুদ্ধ পারিবারিক সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধ আনয়ণে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার কথা বলেছেন যা বর্তমান সময়েও প্রযোজ্য। এই সমস্ত উপদেশে তিনি ধনোপার্জনের জন্য কেবল শাস্ত্রশিক্ষা লাভ করে ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা সৎ জীবনযাপনে পরামর্শ দিয়েছেন এমনটি নয়। এখানে তিনি

Dhaka University Institutional Repository

কষ্টার্জিত ধন-সম্পদ যথাযথরূপে ব্যয় করার পথ প্রদর্শন করে মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র-এর ভরণপোষণ ও আত্মীয়-স্বজনকে আর্থিকভাবে সহায়তা করে কায়িক-বাচনিক ও মানসিক শুদ্ধাচারে জীবন অতিবাহিত করার কথা বলেছেন। সমাজ বিনির্মানেও তিনি সচেতন ছিলেন।

বুদ্ধের আগমন যেমন অপূর্ব তেমনি আবার অবিস্মরণীয়ও বটে। ইতিহাসে এটি দুর্লভ স্বাক্ষরও বটে। বুদ্ধকে বুদ্ধ ছাড়া আর অন্য কোনো অলঙ্কারে ভূষিত করা সম্ভব নয়। বুদ্ধের জ্ঞান অসাধারণ। অনন্তগুণের অধিকারী তিনি। তিনি ভিক্ষু সঙ্ঘ-শ্রামণ-ব্রাহ্মণ, বিভিন্ন রাজা, এবং সাধারণ গৃহীদের উপলক্ষ্য করে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে মানবাধিকারের কথা বলেছেন। মানুষ মাত্র জন্মগতভাবে সকল প্রকার অধিকার লাভ করার অধিকার রয়েছে। অধিকার লাভ করার ফলে সকলে মানুষ সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম। বুদ্ধের চিন্তা-চেতনার মূল কেন্দ্র ছিল মানুষ। তাঁর প্রচারিত ধর্ম মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ প্রদর্শন করে ; সাম্যতার পথ প্রদর্শন করে। মানুষের নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের উপায় প্রদর্শন করে। মানুষ নিজেই নিজের চালিকা শক্তি। মানুষ মাত্রই পারে নিজের ভাগ্যকে পরিবর্তন করতে। তার জন্য কারো সহায়তা দরকার হয় না। বুদ্ধ প্রদর্শিত মানবাধিকারে রয়েছে বহুজনের সুখ-বহু জনের কল্যাণ এবং বহুজনের শান্তি, মানব মর্যাদাবোধসহ সকল প্রকার মানবিক কল্যাণবোধের কথা যা মানুষকে আপন মহিমায় বড় করে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা ও তথ্য নির্দেশিকা

১. অহিংসা : অহিংসা অর্থ ; কায়-বাক্য মনে পরপীড়া বর্জন, কারো অনিষ্ট বা ক্ষতি না করা, হিংসাশূন্য (শীলরক্ষিত ভিক্ষু, সংকলিত, বাংলা একাডেমী পালি বাংলা অভিধান, ২০০২, পৃ. ৩৭)। অহিংসার অপর নাম 'জগতে কাউকে হিংসা না করে পরকে আপন করা। সকলের প্রিয়ভাজন হওযা' (পণ্ডিত ধর্মাধারমহাস্থবির অনূদিত, মিলিন্দ প্রশ্ন, কোলকাতা, ২০১৩, পৃ. ১৬১)। হিংসাউন্মুক্ত পৃথিবীতে বুদ্ধের স্বপ্ন শান্তিময় পৃথিবী প্রতিষ্ঠা করা। হিংসামুক্ত পৃথিবী গড়াই এখানে বুদ্ধের অভিযান। বুদ্ধ বলেন ; অক্কোধেন জিনে কোধং, আসাধুং সাধুনা জিনে ; জিনে কদরিযং দানেন সচ্চেন অলিকবাদিনং। অর্থাৎ, ক্রোধকে অক্রোধের দ্বারা, অসাধুকে সাধুতার দ্বারা কৃপণকে দানের এবং মিথ্যাকে সত্য দিয়ে জয় করতে হয়। (ধম্মপদ, ক্রোধবর্গ/৪২) এ বিষয়ে আরো দেখা যায় ; শত্রুতার দ্বারা কখনো শত্রুতার উপশম হয় না, মিত্রতার দ্বারাই শত্রুতার উপশম হয়। (ধম্মপদ, যমক বর্গ/৫)। যার মধ্যে সত্য, ধর্ম, অহিংসা, সংযম, দম গুণসমূহ বিদ্যমান সেই নির্মল ও ধীর ব্যক্তি সৎপুরুষ (ধম্মপদ,ধমস্থবর্গ/২৬১)। প্রাণিহিংসা দ্বারা কখনো সৎপুরুষ হওয়া যায় না। সর্বজীবে অহিংসা দ্বারা সৎপুরুষ পদ লাভ হয় (ধম্মপদ, ধর্মস্থবর্গ/২৭০)। অহিংসায় বহুজনের সুখ ও কল্যাণ কামনা করা হয় (ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, তৃতীয় খণ্ড, দীর্ঘনিকায়, রাঙ্গামাটি, ২০০৭)। সবদিকে নিজের চেয়ে প্রিয়তর কোনো কিছু পাওয়া যায় না। অন্যান্য সবার নিকট তেমনি নিজ খুব প্রিয়। তাই নিজের সাথে তুলনা করে কাউকে হিংসা করা উচিত নয় (শীলানন্দ ব্রহ্মচারী অনূদিত, সংযুক্ত নিকায়,কলকাতা, ১৪০০ বাংলা, পৃ. ৫১)। যে ব্যক্তি কায়-বাক্য-মনে কারো অমঙ্গল কামনা করে না। অশুভ চিন্তা করে না। অনিষ্ট চিন্তা করেনা। সেই ব্যক্তিই অহিংসা পরায়ণ হয়। (শীলানন্দ ব্রহ্মচারী অনূদিত, সংযুক্ত নিকায়,কলকাতা, ১৪০০ বাংলা, পৃ. ১১৩)।

২. Richard Dagger, Rights' in Political Innovation and Conceptual Change Ed. (Cambridge : 1989), P. 293

৩. নুরুল ইসলাম, মানবাধিকার ও সমাজকর্ম (ঢাকা : ১৯৯৮), পৃ, ১২

৪. লা লেভিন, মানবাধিকার : প্রশ্ন ও উত্তর (নয়াদিল্লী, : ২০০২), পৃ. ৭

৫. চিন্ময় চৌধুরী, প্রসঙ্গ মানবাধিকার (কলকাতা : ২০০৬), পৃ. ০৭

৬. cf. পারভীন আক্তার, মানব উন্নয়নে মানবতাবাদ, দর্শন ও প্রগতি, ২৩শ বর্ষ, ১ম ২য় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর, ২০০৬, পৃ. ১৮১

৭. গাজী শামছুর রহমান, মানবাধিকার ভাষ্য (ঢাকা : ১৯৯৪), পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

৮. আফতাব হোসেন, মানবাধিকারের তাৎপর্য (ঢাকা : ১৯৯৬), পৃ. ১-২ ; এম. এ এরশাদুল বারী, মানবাধিকারের সর্বজীনন ঘোষণা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ৪৩শ সংখ্যা, জুন-১৯৯২, পৃ. ২

৯. Ed Honderich, The Oxford Companion (Oxford: 1995), P. 776

১০. Sankar Sen, Human Rights in Development Society (New Delhi: 1998), P. 3

১১. Gealirth Alan, Human Rights Essays on Justification Application (Chicago: 1992), P. 1

১২. Dr. Tapan Biswal, Human Rights Gender and Environment (2008) P. 44-45

১৩. Muhammad Zamir, Human Rights: Issues and international Law (Dhaka: 2990), P. 1

১৪. মো. সাইফুল ইসলাম দিলদার, মানবাধিকার তদন্ত (ঢাক : ১৯৯৭), পৃ. ১৭০-১৭৫

১৫. বুদ্ধদেব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঢাকা : ২০১২), পৃ. ১১-১২

১৬. মানবাধিকার ভাষ্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

১৭. পঞ্চশীল– 'শীল' শব্দের অর্থ 'চরিএ', 'স্বভাব সংযম', 'নিয়ম-নীতি', 'চারিত্রিক শুদ্ধতা' প্রভৃতি। শীলাভ্যাসই তার স্বভাব। শীলপালনের দ্বারা দেহ-মন এবং বাক্যকে সুন্দরভাবে গঠন করা যায়। তাই শীলকে মানুষের অলংকারও বলা হয়। সচরাচর গৃহীদের পাঁচটি শীল পালন করতে হয়। পাঁচটি শীলসমূহ হলো যথাক্রমে –

ক. প্রাণিহত্যা হত্যা থেকে বিরত থাকা ;

খ. মিথ্যাকথা বলা থেকে বিরত থাকা ;

গ. পরের ধন সম্পদ হরণ বা চুরি থেকে বিরত থাকা ;

ঘ. ব্যভিচার থেকে বিরত থাকা এবং

ঙ. সুরা এবং মাদকজাতীয় দ্রব্যাদি গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা।

১৮. গিরিশচন্দ্র বড়ুয়া অনূদিত, ধর্মপদ (ঢাকা : ১৯৭৭), পৃ. ১১০

১৯. শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির অনূদিত, সুত্ত নিপাত (বান্দরবান : ২০০৭), পৃ. ৩

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

২১. শ্রী ঈশান চন্দ্র ঘোষ অনূদিত, জাতক, তৃতীয় খণ্ড (কলকাতা : ১৯৯১), পৃ. ৮৭

২২. শ্রী ঈশান চন্দ্র ঘোষ অনূদিত, জাতক, প্রথম খণ্ড (কলকাতা : ১৩৮৪ বাংলা), পৃ. ৪৫

২৩. সুমনপাল ভিক্ষু অনূদিত, সদ্ধম্মোপায়ন (কোলকাতা : ২০১২), পৃ. ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

২৪. শীলানন্দ ব্রহ্মচারী অনূদিত, সংযুক্ত নিকায়, প্রথম খণ্ড (কলকাতা : ১৪০০ বাংলা), পৃ. ৫১

২৫. শ্রী ঈশান চন্দ্র ঘোষ অনূদিত, জাতক, প্রথম খণ্ড (কলকাতা : ১৩৮৪ বাংলা), পৃ. ৪৭

২৬. শীলানন্দ ব্রহ্মচারী অনূদিত, সংযুক্ত নিকায়, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

২৭. জ্যোতিপাল ভিক্ষু অনূদিত, উদানং (খাগড়াছড়ি : ২০১৩), পৃ. ৮-৯

২৮. আরো দ্রষ্টব্য -

যো ন হনতি ন ঘাতেতি ন জিনাতি ন জাপযে

অহিংসা সব্বভূতেসু বেরং তস্স ন কেনচি।

চক্রবাক জাতক, চতুর্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২ ও ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত, মিলিন্দ প্রশ্ন (কলিকাতা : ১৯৮৭), পৃ. ২১৭

২৯. চারুচন্দ্র বসু অনূদিত, ধম্মপদ (কোলকাতা : ২০১০), পৃ. ৩

৩০. জ্যোতিপাল স্থবির অনূদিত, বোধিচর্যাবতার (ঢাকা : ১৯৯৪), পৃ. ১৪৫

৩১. শীলানন্দ ব্রহ্মচারী অনূদিত, সংযুক্ত নিকায়, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

৩৩. একের অধিক বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরকে 'সঙ্ঘ' বলে সম্বোধন করা হয়।

৩৪. কপিলাবাস্তুর রাজকূলের ক্ষৌরকার বংশে জন্মগ্রহণ তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর গৃহী নাম ছিল পূর্ণ। রাজপুত্রদের পূর্বেই তাঁকে প্রথমেই প্রব্রজ্যা দেয়া হয়। রাজপুত্রের সাথে প্রব্রজিত হয়েছিল বলে তার নাম হয় উপালি। ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত, মধ্যম নিকায় দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩১]

৩৫. স্থবির অনূদিত, থের গাথা (তাইওয়ান : ১৯৯৮) পৃ. ৩৬৫-৩৬৭

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

৩৭. শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির অনূদিত, সুত্ত নিপাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২-১৭৩

৩৮. চারুচন্দ্র বসু অনূদিত, ধম্মপদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪

৩৯. শ্রী ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত, মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ, ২৭৭-২৮৩

৪০. স্থবির অনূদিত, থের গাথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

৪১. রবীন্দ্র রচনাবলী, চণ্ডালিনী গীতি নাট্য দ্রষ্টব্য।

৪২. শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু অনূদিত, উদানং, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

৪৩. শীলানন্দ ব্রহ্মচারী অনূদিত, সংযুক্ত নিকায়, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

৪২. মানবাধিকার ভাষ্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

৪৬. Petter Harvey, An introduction to Buddhist Ethics (Cambridge : 2000), P. 121

৪৭. Quote by Khalid Tanvir, Education: an introduction to Educational Philosophy and History (Karachi : 1975), P. 4

৪৮. সুকোমল চৌধুরী, মহামানব গৌতম বুদ্ধ (কলিকাতা : ১৯৯৫), পৃ. ২০-২১

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

৫০. শ্রী ঈশান চন্দ্র ঘোষ, জাতক চতুর্থ খণ্ড (কলকাতা : ১৩৯১ বাংলা), পৃ. ১৯৩ ফৌজবল, জাতক, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৩৯১

৫১. ত্রিবেদ হলো : ক. ঋগবেদ, খ.সামবেদ, এবং গ. যর্জুবেদ।

৫২. স্থবির অনূদিত, থেরগাথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫

৫৪. শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত, মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮

৫৫. রাজগুরু শ্রীমৎ ধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির অনূদিত, দীর্ঘ নিকায়, প্রথম খণ্ড (কলিকাতা : ১৯৬২), পৃ. ১১১

৫৬. সাম্য, বঙ্কিম রচনাবলী সাহিত্য সমগ্র, তুলি কলম (কলিকাতা : ১৩৯৩ বাংলা), পৃ. ৩৮২

৫৭. রাজগুরু শ্রীমৎ ধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির অনূদিত, দীর্ঘ নিকায়, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১-৩৯

৫৮. উপসোথ-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে 'উপবাস'। ইংরেজীতে এটাকে Fasting বলা হয়।
মাসের অষ্টমী অমাবশ্যা , অষ্টমী ও পূর্ণিমা তিথিতে উপবাস গ্রহণ কর।

৫৯. শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত, মিলিন্দ প্রশ্ন (কোলকাতা : ২০১৩), পৃ. ৪

৬০. অনুকূল চন্দ্র বন্দ্যোপধ্যায়, বৌদ্ধ সাহিত্য ও শিক্ষ-দীক্ষার রূপরেখা (কলিকাতা : ১৯৭৮), পৃ. ৬৩-৬৪

Dhaka University Institutional Repository

৬১. http://ibc.ac.then/content/history-buddhist-education-convocation-a...

৬২. ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, থেরী গাথা (তাইওয়ান : ২০০৬), পৃ. ৯-১০

৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১০

৬৪. অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া অনূদিত, অঙ্গুত্তর নিকায়, প্রথম খণ্ড (রাঙ্গামাটি : ২০০৪), পৃ. ৩০-৩১

৬৫. প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত, মহাবর্গ (কলিকাতা : ১৯৩৭), পৃ. ৩৫৫

৬৬. ড. প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস (কলকাতা : ১১৪১২ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১১৬

৬৭. গুরুর আদেশ পালন করতে গিয়ে তিনি যখন নির্বিচারে মানুষ হত্যা শুরু করলেন তখন তার নাম হলো অঙ্গুলিমাল। পরবর্তী সময়ে বুদ্ধের সান্নিধ্যে এসে তিনি নবজীবন লাভ করেন।

৬৮. স্থবির অনূদিত, থের গাথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৯

৬৯. রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রবন্ধ : শিক্ষা (জন্মশত বার্ষিকী সংস্করণ), একাদশ খণ্ড (কলিকাতা), প. ৬৮১

৭০. রাজগুরু শ্রীমৎ ধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির অনূদিত, দীর্ঘ নিকায়, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫-১৯

৭১. মানবাধিকার ভাষ্য, প্রাগুক্ত পৃ. ৫২৪

৭২. সাধনানন্দ মহাস্থবির, সুত্ত নিপাত, প্রাগুক্ত, পৃ.৭১

৭৩. উদ্ধৃত, মানবাধিকার ভাষ্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১১।

৭৪. সত্যসাধন চক্রবর্তী ও নির্মল কান্তি ঘোষ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান (কলকাতা : ১৯৯৪), পৃ. ৩১৪

৭৫. মানবাধিকার ভাষ্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১০

৭৬. পঞ্চবর্গীয় শিষ্য হলো : বপ্প, ভদ্দিয়, মহানাম, অশ্বজিৎ, এবং কৌণ্ডিন্য

৭৭. বিনয় : বিনয় শব্দের শব্দগত অর্থ 'নিয়ম', 'নীতি' বা 'শৃঙ্খলা'। বিনয় বুদ্ধশাসনের আয়ু স্বরূপ। বিনয় ব্যতীত বুদ্ধশাসনের স্থিতি অপরিকল্পনীয়। মহামতি বুদ্ধের পরিনির্বাণের অব্যবহিত পরে বিষয়টি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করেই মহাকাশ্যাপ স্থবির প্রমুখ সঙ্গীতিকারকবৃন্দ রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহার সঙ্গীতিমণ্ডপে সর্ব প্রথম বিনয়পিটক সংগ্রহ করেন। (মহাবংশ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

৭৮. ত্রিশরণ : বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি অর্থাৎ আমি বুদ্ধের শরণ নিচ্ছি।

ধম্মং সরণং গচ্ছামি অর্থাৎ আমি ধর্মের শরণ নিচ্ছি।

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি অর্থাৎ আমি সঙ্ঘের শরণ নিচ্ছি।

ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠিত হলো বা আশ্রয় হলো বৌদ্ধ ধর্মের মূল আশ্রয়। ত্রিশরণ গ্রহণের মাধ্যমে বুদ্ধের ধর্মে প্রবেশ করতে হয়।

৭৯. রাজগুরু শ্রীমৎ ধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির অনূদিত, মহপরিনিব্বাণ সুত্তং (চট্টগ্রাম : ১৯৫৪), পৃ. ৪-৮

৮০. প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির, ভিক্খু পাতিমোক্খং (কলিকাতা : ১৯৮৭) পৃ. ৩৪

৮১. চীবর : বৌদ্ধভিক্ষুদের ব্যবহৃত একধরনের গৌরিক, খয়েরবর্ণ বিশিষ্ট বসন। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ত্রিচীবর পরিধান করে। যথা : অন্তরবাসিক চীবর. উত্তরাসঙ্গ চীবর এবং সঙ্ঘাটি চীবর। এগুলোকে চীব বলা হয়।

৮২. প্রজ্ঞালোক স্থবির, বুদ্ধের অভিযান (কলিকাতা : ১৩৯৯ বাংলা), পৃ. ৪

৮৩. চারুচন্দ্র বসু অনূদিত, ধম্মপদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

৮৪. প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত, মহাবর্গ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

৮৫. জোতিপাল ভিক্ষু, উদানং, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

৮৬. বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান (ঢাক : ২০১৪) পৃ . ১১৮৮ '

৮৭. উদ্ধৃত, মানবাধিকার ভাষ্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

৮৮. রাজগুরু শ্রীমৎ ধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির অনূদিত, মহাপরিনিব্বাণং সুত্তং, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

৮৯. চারুচন্দ্র বসু অনূদিত, ধম্মপদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১ ও ১৮৭

৯০. অষ্টবিধ লোকধর্ম : লাভ-অলাভ, যশ-অযশ, নিন্দা-প্রশংসা, সুখ-দুঃখ। শ্রীমৎ সাধননন্দ মহাস্থবির অনূদিত, সুত্ত নিপাত, প্রাগুক্ত, পৃ.৭১

৯১. সুদর্শন বড়ুয়া, প্রশ্নোত্তরে ত্রিপিটক, তৃতীয় খণ্ড, চট্টগ্রাম, ২০০৮, পৃ. ২৩২ কালাম সূত্র দেখা যেতে পারে।

৯২. রাজগুরু শ্রীমৎ ধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির অনূদিত, মহাপরিনিব্বাণং সুত্তং, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২

৯৩. প্রাগুক্ত, ১৯৯৮ পৃ. ১৪২

৯৪. উদ্ধৃত, মানবাধিকার ভাষ্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৯

৯৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (ঢাকা : ২০১১), পৃ. ৪

৯৬. আশা দাস, ভারত-ভারতবোধ ভারত সংস্কৃতি (কলিকাতা : ২০০১), পৃ. ৪০

Dhaka University Institutional Repository

৯৭. অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া অনূদিত,অঙ্গুত্তর নিকায়, চতুর্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০ Bapat, P. V Ed, 2500 Years of Buddhism (Delhi: 1956), P. 6

৯৮. ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, দীর্ঘ নিকায়, তৃতীয় খণ্ড (কলকাতা : ১৯৯৮), পৃ. ৩০৯

৯৯. R. S Tripatty, History of Ancient India (Delhi: 1967), P. 47

১০০. K. N Joysowal, An Introduction to Hindu Polity (Calcutta: 1913), P, 664

১০১. রাজগুরু শ্রীমৎ ধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির অনূদিত, মহাপরিনিব্বাণং সুত্তং, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪-৮

১০২. Bela Bhatachary, Facts of Early Buddhism, Calcutta, 1995, P. 41

১০৩. শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, মহাশান্তি মহাপ্রেম (চট্টগ্রাম : ২০০২), পৃ. ১১১

১০৪. সুত্ত নিপাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

১০৫. ধর্মপদ/আত্মবর্গ-৪

১০৬. ধর্মপদ/ব্রাহ্মণ বর্গ-১১

১০৭. সাধনানন্দ মহাস্থবির, সুত্ত নিপাত, প্রাগুক্ত ,পৃ. ৩৪

১০৮. শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, সংযুক্ত নিকায়, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

১০৯. রাজগুরু শ্রীমৎ ধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির অনূদিত, দীর্ঘ নিকায়, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

১১০. মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০

১১১. সমঞ্ঞা হেসা লোকস্মিং নাম গোত্ত পকম্পিতং

সমুচ্চা সমাগতা সমুদাগতং তথ তথ পকম্পিতং। সুত্ত নিপাত/৬৫৩

১১২. কম্মুনা বত্ততি লোকো কম্মুনা বত্ততি পজা

কম্ম নিবন্ধনা সত্তা রথস্সানীব যাযত। সুত্ত নিপাত/৬৫৯

১১৩. ৪৩ নং ফুট নোট দ্রষ্টব্য। বিস্তারিত : শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত, মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০

১১৪. শ্রী বিমলাচরণ লাহা, বৌদ্ধ রমণ (কলিকাতা : ১৯৯৪) পৃ. ২৯

১১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

১১৬. প্রাগুক্ত,পৃ. ৩১

১১৭. প্রাগুক্ত. পৃ. ৩২

Dhaka University Institutional Repository

১১৮. প্রাগুক্ত,পৃ. ৩৩

১১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

১২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

১২১. শান্তরক্ষিত মহাস্থবির, বাংলা একাডেমী পালি বাংলা অভিধান (ঢাকা : ২০০২), পৃ. ২১১

১২২. মানবাধিকার ভাষ্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

১২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮০

১২৪. শিক্ষার ভিত্তি, ড. মো. আবদুল আউয়াল খান, ড. আজাহার, আলী, মো. আব্দুস সামাদ ও মো. মিজানুর রহমান (ঢাকা : ১৯৯৯), পৃ. ৬৩

১২৫. শিক্ষার ভিত্তি, প্রাগুক্ত, ৬৬

১২৬. বাংলা একাডেমী পালি-বাংলা অভিধান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫

১২৭. ধর্মপদ/প্রিয় বর্গ-২১৭

১২৮. ধর্মপদ/যমক বর্গ-১

১২৯. ধর্মপদ/যমক বর্গ-২

১৩০. ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, দীর্ঘ নিকায়, তৃতীয় খণ্ড (রাঙ্গামাটি : ২০০৭), পৃ. ১৫৮

১৩১. সাধনানন্দ মহাস্থবির, সুত্ত নিপাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

১৩২. অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া অনূদিত, অঙ্গুত্তর নিকায়, চতুর্থ খণ্ড (রাঙ্গামাটি ; ২০০৫), পৃ. ২৭৩, ৩০৯-৩১০

১৩৩. অঙ্গুত্তর নিকায়, চতুর্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

১৩৪. শিক্ষার ভিত্তি, প্রাগুক্ত, ৭৯

১৩৫. অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া অনূদিত, অঙ্গুত্তর নিকায়, চতুর্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০

১৩৬. রণবীর চক্রবর্তী, প্রাচীন ভারতে অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধান (কলকাতা : ১৩৯৮ বাংলা), পৃ. ৬৯

১৩৭. রাজগুরু শ্রীমৎ ধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির অনূদিত, দীর্ঘ নিকায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯-১১৬

১৩৮. প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১-৬৯

১৩৯. অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া অনূদিত, অঙ্গুত্তর নিকায়, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ২৭৩

Dhaka University Institutional Repository

১৪০ অঙ্গুত্তর নিকায়, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ২৭৫

১৪১. সাধনানন্দ মহাস্থবির, সুত্ত নিপাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

১৪২. ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, দীর্ঘ নিকায়, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

১৪৩. বিভিন্ন সূত্রের জন্য দেখুন :

সুমঙ্গল বড়ুয়া ও বেলু রানী বড়ুয়া অনূদিত, দ্বীপবংস, ঢাকা, পৃ. ২২৩, সাধনানন্দ মহাস্থবির অনূদিত, সুত্ত নিপাত, বান্দরবান, ২০০৭, পৃ. ১৭১, সুমঙ্গল বড়ুয়া অনূদিত, অঙ্গুত্তর নিকায়, প্রথম খণ্ড, রাঙ্গামাটি, ১৯৯৪, পৃ. ২৮৫, সুমঙ্গল বড়ুয়া অনূদিত, অঙ্গুত্তর নিকায়, চতুর্থ খণ্ড, রাঙ্গামাটি, ১৯৯৪, পৃ. ২৮৫, রাজগুরু শ্রীমৎ ধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির অনূদিত, দীনিকায়, প্রথম খণ্ড, পূর্বপাকিস্তান, ১৯৬২, পৃ. ১০৫)

১৪৪. Gems of Buddhist Wisdom (Taiwan :2006), P. 411

১৪৫. অঙ্গুত্তর নিকায়, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২

১৪৬. সাধনানন্দ মহাস্থবির, সুত্ত নিপাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

১৪৭. সুত্ত নিপাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

১৪৮. শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, সংযুক্ত নিকায়, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

১৪৯. প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু, অঙ্গুত্তর নিকায় অনূদিত, পঞ্চম খণ্ড (রাঙ্গামাটি : ২০১১), পৃ. ৬৬

১৫০. সাধনানন্দ মহাস্থবির, সুত্ত নিপাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০, ৮১

১৫১. ভিক্ষু শীল ভদ্র অনূদিত, দীর্ঘ নিকায়, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

১৫২. Walpola Rahula, What the Buddha Thought (Taiwan :2009), P. 83

১৫৩. জিনবোধি ভিক্ষু, ইসলামিক ফাউন্ডেশেন কর্তৃক আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি বিষয়ে সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ ; বুদ্ধের ধর্মে নারীর অধিকার, (ঢাকা : ২০০৮), পৃ. ৪

১৫৪. ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, ধর্ম্মচক্র প্রবর্তন সূত্র (কলিকাতা : ১৯৫১), পৃ.৬-১৯

১৫৫. পঞ্চবিধ বাণিজ্য সমূহ হলো : ক. অস্ত্র ব্যবসা হতে বিরত থাকা, খ.প্রাণি ব্যবসা হতে বিরত থাকা, গ. মাংস ব্যবসা হতে বিরত থাকা, ঘ. নেশা জাতীয় দ্রব্য বাণিজ্য থেকে বিরত থাকা, এবং বিষ জাতীয় দ্রব্যাদি ব্যবসা থেকে বিরত থাকা।

Dhaka University Institutional Repository

১৫৬. শ্রী ধর্ম্মজ্যোতি স্থবির, খুদ্দক পাঠো (কলিকাতা : ১৯৫৫), পৃ. ১৯

১৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

১৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

১৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

১৬০. রাজগুরু শ্রীমৎ ধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির অনূদিত, দীর্ঘ নিকায়, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩, জাতক সংখ্যা-৫৩৯, ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত, মিলিন্দ প্রশ্ন, কলিকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ২২২-২২৩

১৬১. ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, দীর্ঘ নিকায়, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

১৬২. ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, দীর্ঘ নিকায়, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

১৬৩. ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, দীর্ঘ নিকায়, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

১৬৪. রাজগুরু ধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির অনূদিত, দীর্ঘ নিকায়, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭, রাজগুরু ধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির অনূদিত, মহাপরিনিব্বানং সুত্তং (চট্টগ্রাম : ১৯৫৪), পৃ. ৪

১৬৫. সাধনানন্দ মহাস্থবির, সুত্ত নিপাত প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

১৬৬. মানবাধিকার ভাষ্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানবতার সাধনায় বুদ্ধের শিক্ষা : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

ল্যাটিন 'Humanism'- এর প্রতিশব্দ হলো 'মানবতাবাদ'। বর্তমান বিশ্বে বহুল আলোচিত, নন্দিত, প্রশংসিত শব্দের অর্থবোধক নাম এটি। মানবের কল্যাণবোধ, শুভ কামনা, মঙ্গল কামনার অনুসন্ধান বা অন্বেষণ করাই হলো মানবতাবাদের অন্যতম মূখ্য উদ্দেশ্য। ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপীয় রেনেসাঁর সময় মানবতাবাদ শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়। সে সময় প্রাচীন গ্রিক, ল্যাটিন জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য অনুশীলন ও চর্চাকারীদের মানবতাবাদী বলা হতো। ১৯৩৩ খ্রি. হিউম্যানিস্ট ম্যানিফেস্টো স্বাক্ষরিত হয়। এটা স্বাক্ষরিত হবার ফলে মানবতাবাদ বলতে এমন এক ধরনের জীবনদর্শনকে বোঝায় যেখানে ধর্মীয় বাণী ও ধর্মীয় সাহিত্যের অতিপ্রাকৃত উপাদানকে বর্জন করে।

মানবতাবাদ সম্পর্কিত অভিমত

মানবতাবাদে দেখা মানবজীবনের যাবতীয় বিষয়ের বিবেচনায় মানুষই মূল কেন্দ্রবিন্দু। বিভিন্ন গ্রন্থের মানবতাবাদ সম্পর্কিত কয়েকটি মন্তব্য তুলে ধরা হলো। যেমন : 'Webster's New International Dictionary of English Language' নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে উক্ত হয়েছে ; 'Contemporary cult or belief calling itself religious but substituting faith in man for faith in god.[১] তাছাড়া ' Illustrated Oxford Dictionar' নামক গ্রন্থেও দেখা যায় ; 'a system of thought that regards their intelligence to live their lives, rather than relying on religions belief'[2]. আরো উক্ত হয়েছে ; 'a system and philosophy based on ethical but not religious standards'.[৩]

মানবতাবাদের স্বরূপ

মানবতাবাদ একটি দর্শনের বিষয় যা নৈতিকতার উপর নির্ভরশীল। আত্মপীড়িত, নির্যাতিত, অবহেলিত, অচ্ছ্যুত, অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীর সেবা করা, অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং কাল্পনিক চিন্তা-চেতনা পরিহার করে মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মানবসেবা করাই হলো মানবতাবাদের প্রধান ও অন্যতম লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। বর্তমান সময়ে মানবতাবাদ মানবকেন্দ্রিক যা মানবিক কল্যাণবোধকে বোঝায়। এককথায় বলা যায়, মানবতাবাদ শব্দটির মর্মকথা হচ্ছে - 'মানুষই সবকিছুর মাপকাঠি'। মানুষের কল্যাণ সাধন ও অগ্রগতির ধারণাকে বেগবান করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে আলোচিত বিষয়ের নাম 'মানবতাবাদ'। কাজেই সর্বসাধারণের নিকট শব্দটি খুবই পরিচিত।

Dhaka University Institutional Repository

মানবতাবাদের মৌল ও মূখ্য উপাদান হলো মানুষের একত্ব, অখণ্ডত্ব ও সাম্যবাদের ধারণা। মানবতাবাদীরা মানুষের কল্যাণের জন্য সবকিছু ব্যয় করতে পারেন। মানবতাবাদের স্বরূপ সম্পর্কে দেখা যায় কবি নজরুল-এর 'মানুষ' বিষয়ক কবিতায়। এখানে তিনি উচ্চারণ করলেন ;

গাহি সাম্যের গান-
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি,
সব দেশে সব কালে ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি[৪]।

মানবতাবাদ বিজ্ঞান, বুদ্ধি এবং গণতন্ত্রের মূল্যবোধের প্রেক্ষিতে মানুষের বহুবিধ সমস্যার সমাধান করে। আরো স্পষ্ট করে বলা যায়, মানুষ তার নিজের জন্য দায়িত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম। নৈতিক আদর্শ, শ্রেয়োনীতিবোধ, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, বন্ধুত্ব সহানভূতিশীলতা মানুষের অভিজ্ঞতাজাত। মানুষ এটা তার অভিজ্ঞতা দিয়ে অর্জন করেছে–মানুষের জীবন চলার পথে অতিপ্রাকৃত কোনো সাহায্যের আবশ্যকতা নেই বা অতিপ্রাকৃত শক্তি বা সাহায্যকারী বলে কিছু নেই। এই বোধের/জ্ঞানের অধিকারীকে আমরা মানবতাবাদী বলতে পারি। মানবতাবাদীরা এটা বিশ্বাস করে না যে, মানুষকে ঈশ্বর বা কোনো অতিপ্রকৃত শক্তি সৃষ্টি করেছে ; কিংবা ঈশ্বরের আদেশ-নির্দেশ প্রতিপালন করলে পুরস্কার আর প্রতিপালন বা করলে তিরস্কার বা শাস্তি ভোগ করতে হয়। বরং মানবতাবাদীরা বিশ্বাস করে মানুষের সমস্যা সমাধানে বিধাতার কোনো রকম হাত নেই–পারস্পরিক সহযোগিতা ও সাম্য মৈত্রীর দ্বারা ব্যক্তির সাংসারিক সমস্যা, পারিবারিক সমসা, রাষ্ট্রীয় সমস্যা সর্বোপরি বিশ্বসমস্যা সমাধান করা সম্ভব। মানবতাবাদের প্রধানতম বক্তব্য হচ্ছে মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সবার সমান অধিকার ও সমান সুযোগ থাকা চাই[৫]। বুদ্ধের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণার মৌলনীতি একই কথা বলে। মানবতাবাদে মানুষের মর্যাদার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। এ মতবাদে বিশ্বাস করা হয় যে, মানবতাবাদী পরিবেশে মানুষের মুক্তবুদ্ধি ও সৃজনশীলতার বিকাশ সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে ঘটে। মুক্তবুদ্ধির প্রধান লক্ষণ হলো মনুষ্যত্ব, মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা। এ প্রসঙ্গে দেখা যায়, 'মানবতাবাদ বলতে এমন একটা দার্শনিক মতবাদ বোঝায় যা মানুষের সৃষ্টিধর্মী ক্ষমতা, স্বাধীনতা ও কল্যাণের পথ নির্দেশ করে'।[৬] প্রায় আজ থেকে আড়াই হাজার বছরেরও পূর্বে বুদ্ধ বর্তমান নেপালের লুম্বিনী কাননে জন্মগ্রহণ করেন। গৌতম বুদ্ধ নবদিগন্তের দ্বার উন্মোচন ও মানবতার বিকাশ সাধনে একই ধরনের অঙ্গীকারের কথা বলেছিলেন। মানবিকতা প্রাথমিকভাবে সামাজিক বিষয় হিসেবে ধরা যায়। তবে, মানবতা কিংবা মানবিকতা বা কল্যাণ কামনা পুরোপুরি নিজের মনের উপর নির্ভরশীল। সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

এটি মঙ্গলজনক হিসেবে কাজ করে। B. Russel বলেন ; The performance of public duty is not the whole of what makes a good life; there is also the pursuit of private excellence. For man, though partly social, is not wholly so.[৭]

মানবতাবাদে শুধু মাত্র মানুষের গুণগান প্রকাশ হয় না একই সঙ্গে মানবকল্যাণের আদর্শের কথাও প্রচার করা হয়। এখানে সবার উপরে মানবপ্রেমকে স্থান দেওয়া হয়। মানবপ্রেমই ধনী-গরীব, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়, বৈশ্য-শূদ্র -এর ভেদাভেদ ঘুচিয়ে দিতে পারে।

মানবতার বিকাশে বুদ্ধের শিক্ষার স্বরূপ

পৃথিবীতে যে কজন মহামানব রয়েছে তন্মধ্যে গৌতম বুদ্ধ অন্যতম। তিনি প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। কোনো রকম ইন্দ্রিয়জনিত কামনা-বাসনা তাঁকে সংসারবন্ধনে আবদ্ধ করতে পারেননি। বাল্যকাল থেকেই তিনি সকলের মঙ্গল, কল্যাণ, পরোপকার কামনায় মনোনিবেশিত ছিলেন। বুদ্ধকে মহামতি বলা হয়। তিনি একজন অস্থি-মাংসে গড়া মানুষ। তিনি মানবতার জয় ও মানবকল্যাণের জন্য জীবনের পরমসত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। জীবন দুঃখময়। জীবন বাস্তবতায় মানবজীবনের সবচেয়ে কঠিন ও রূঢ় বাস্তবসত্যের নাম হলো দুঃখ। তিনি সেই দুঃখকে উপলব্ধি করেছিলেন কঠোর সাধনার মধ্য দিয়ে। মানুষকে দুঃখ মুক্তি পথ প্রদর্শন করে তিনি পৃথিবীতে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় দেদীপ্যমান হয়ে রয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে ;

> A unique begin, an extraordinary man arises in this world for the benefit of the many, for the happiness of the many, out of compassion for the world for the good, benefit and happiness of gods and men. Who is the unique being? It is the Tathagata, the Exalted, and fully enlightened one[৮].

সুখ-শান্তি ও কল্যাণ কামনায় প্রতিষ্ঠাকরণ করার ক্ষেত্রে বুদ্ধ অদ্বিতীয়। তাই তাঁকে মহাজ্ঞানী হিসেবে অভিহিত করা হয় ।

বুদ্ধকে লোকশিক্ষক বলা হয়। তাঁর প্রদেয় নৈতিক শিক্ষা সুন্দর জীবনযাপনে, সমাজগঠনে যেমন উদ্বুদ্ধ করে তেমনি আবার রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তাঁর নৈতিক শিক্ষা সর্ম্পকে 'Buddhist Concept Old and New' নামক গ্রন্থে দেখা যায় ;

Dhaka University Institutional Repository

> The Buddha is such a great benefactor because he taught man that there is no need for them to look outside themselves for help to reach the highest condition of mind and heart possible for them[৯].

বুদ্ধের জীবন সাধনা ও দর্শন চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল মানবসমাজ এবং মানবের মঙ্গল ও কল্যাণ সাধন। মানবতাবাদ ও মানবল্যাণের পরিপূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য করা যায় বুদ্ধের উপদেশে। এ প্রসঙ্গে উক্ত হয়েছে ; ভারতীয় চিন্তা-ধারায় মানবকেন্দ্রিক দর্শন তথা মানবতাবাদের পরিপূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য করা যায় মহামানব বুদ্ধের দর্শন ও জীবন সাধনায়। তাঁর দর্শন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, জীবের মুক্তির প্রশ্নটির উপর তিনিই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁর দর্শনে ঈশ্বর অতীন্দ্রিয় সত্তার কোনো উল্লেখ নেই। জীবের মুক্তির জন্য জীবই যথেষ্ট। তার মানে বৌদ্ধ দর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল মানুষ ও মানুষের কল্যাণ প্রতিষ্ঠা, কোনো অতিপ্রাকৃত সত্তার পূজা-অর্চনা নয়। মানুষ এক বিরাট সম্ভাবনাময় সত্তা, সে নিজেই নিজের ভাগ্য নিয়ন্তা। একথা সম্ভবত তথাগত বুদ্ধই প্রথম গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন।[১০]

বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধদশনে ঈশ্বরের কোনো স্থান নেই। এরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না।[১১] বাংলাদেশের অধ্যাপকবৃন্দ বিশেষ করে ড. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ দেওয়ান, মোহাম্মদ আজরফ, ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব, ড. নুরুল ইসলাম প্রমুখ বৌদ্ধ চিন্তার যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা দিয়ে গৌতম বুদ্ধকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী চিন্তাবিদ বলে উল্লেখ করেন।[১২] বর্তমান বিশ্বে গান্ধাজীর অহিংসবাদ লালন শাহসহ অন্যান্যদের মানবতাবাদের পেছনে একান্ত সহায়ক ছিল হাজার হাজার বছর ধরে লালিত-পালিত বৌদ্ধ উর্বর সমাজমন। আড়াই হাজার বছরেরও বেশী বছর আগে জন্ম গ্রহণকারী বুদ্ধের জীবনদর্শনে মানবতাবাদের যে স্ফুরণ ঘটেছিল তা আজো একইভাবে প্রবাহমান। পালি সাহিত্য কিংবা বৌদ্ধ সাহিত্যের সর্বত্রই মানবকল্যাণ ও মানবতাবাদের কথা রয়েছে। বুদ্ধের চারি আর্যসত্য, পঞ্চনীতি বা পঞ্চশীল, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ নির্বাণসহ মৌলিক তত্ত্বগুলো পর্যালোচনা করলে মানবকল্যাণ ও মানবতাবাদের বিষয় আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। এ সমস্ত বিষয়ের নৈতিক তাৎপর্য মানবতার মুক্তির পথকে আরো সুগম ও প্রসারিত করে। তৎকালীন সময়ে যে বর্ণপ্রথা বিদ্যমান ছিল তার মূলে বুদ্ধ কুঠারাঘাত করেছেন। এভাবে তিনি বিশ্বমানবতাকে উন্মোচন করেছে। বুদ্ধের মানবতাবাদে বিশ্বপ্রেমের দিক নির্দেশনা রয়েছে। এ আবেদন রাজা প্রসেনজিৎ, বিম্বিসার ও উদয়নের কাছে যেমন : সর্বহারা উন্মাদিনী পটাচারা, বারবণিতা, আম্রপালি ও পুত্র শোকে ক্রন্দনরতা কৃশা গৌতমীর কাছে ছিল একই রকম তেমন প্রযোজ্য, এর চেয়ে বড় বিশ্বপ্রেমিক কে হতে পারে।[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধ ছিলেন কল্যাণধর্মের প্রতিষ্ঠাতা যেখানে সর্বত্র মানুষকে প্রাধান্য দিয়েছেন তিনি। তাঁর উপদেশে মানবের জয়গান করা হয়েছে। মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসাকে তিনি গভীরভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে জি. সি দেব বলেন ;

> 'Buddha's claim that he was a human being struggling for peace and not a god unmistakably shows he had a keen senese of dignity of man and was dedicated to human welfare. Indeed here he reveals himself as a humanist in our senese of world. This is a great discovery for modern man'.[১৪]

এখানে মানুষের জন্য যে বুদ্ধ নিজেকে উৎসর্গ করেছেন তিনি তা দেখিয়েছেন। তাছাড়া গোবিন্দ চন্দ্র দেব মহোদয় বুদ্ধকে মানবতাবাদী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে তাঁকে আধুনিক মানুষের জন্য এক মহান আবিষ্কার হিসেবে অভিহিত করেছেন। শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় বর্তমান বিশ্ব তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর। এককথায় সবকিছুই এখন হাতের মুটোয়। শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-দর্শনে, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে এগিয়ে যাচ্ছে সবাই। সর্বোপরি রয়েছে বস্তুগত সম্পদও। তারপরও মানুষের কোনো রকম বিবেকবোধ নেই। মানবিকতা নেই। সর্বত্র কেন যেন প্রকৃত সদচ্ছিার অভাব। সুন্দর হৃদয় তথা উন্নত মননশীলতার অধিকারী না হলে এবং অশোভনীয়-অকল্যাণীয়-অনৈতিক কর্ম স্বেচ্ছায় চিরতরে ত্যাগ করতে না পারলে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ কিংবা মানবিকতার উন্মেষ হবে না। তা যদি না হয় তবে কোনো অবস্থাতেই ব্যক্তি-ব্যক্তি, পাড়ায়-পাড়ায়, সমাজে-সমাজে, জাতিতে-জাতিতে কিংবা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোনোরূপ কল্যাণ আশাকরা যায় না। তাঁর ধর্ম হচ্ছে মানবিকতায় ঘেরা আবরণ যা বর্তমান বিশ্বে মানবতবাদের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে মিলে য়ায়। নিম্নে তাঁর দর্শনের মধ্যে মানবিকতার যে ছোঁয়া রয়েছে তারই বর্ণনার আলোকে তুলে ধরার প্রয়াস করা হলো।

চারি আর্যসত্য

চার প্রকার শ্রেষ্ঠ সত্যকে তিনি চারি আর্যসত্য বলেছেন। এগুলো হলো : দুঃখ সত্য, দুঃখ উৎপত্তির কারণ সত্য বা দুঃখ সমুদয়, দুঃখ নিরোধ সত্য এবং দুঃখ নিরোধের উপায় সত্য। আর্যসত্য সকলের বোধগম্য করার বিষয় নয়। বুদ্ধের ধর্মদর্শনে এটি এক অভিনব আবিষ্কার। বুদ্ধের ধর্ম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ করতে হলে আর্যসত্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা অত্যাবশকীয়। মানুষ সুখ-দুঃখকে আলিঙ্গন করেই প্রাত্যহিক জীবন নির্বাহ করে। অনেকে দুঃখের মধ্যে সুখ অন্বেষণ করে। অনেকে সুখের মধ্যে দুঃখের সাথে বসবাস করে। প্রকৃতপক্ষে সুখ-দুঃখ মানবজীবনে আলো-ছায়ার মতো দৃশ্যমান। বলা যায়, জীবন মানেই দুঃখ। অর্থাৎ সীমাহীন ও নিদারুণ যন্ত্রণা। মানুষ সাগরে

Dhaka University Institutional Repository

ভাসমান অবস্থার ন্যায় দুঃখ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে দুঃসহ জীবনযাপন করে চলছে প্রতিনিয়ত। সমাজ ব্যবস্থাপনায় দুঃখই যেন নিত্যদিনের সাথী। জ্ঞানচক্ষুর উদয় না হলে চর্মচক্ষু দিয়ে দুঃখকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। বুদ্ধ আরো বললেন ; 'দুঃখ জ্ঞান উদয় হলে দুঃখ নিরোধের ইচ্ছা জাগে। তাই দুঃখ কি, দুঃখের উৎপত্তি কি করে হয়, দুঃখ কি করে নিরোধ করা যায়, দুঃখ নিরোধের উপায় কি তা জানতে হয়'।[১৫]

বুদ্ধ ছয় বছর কঠোর সাধনার মধ্য দিয়ে এগুলো অর্জন করেছিলেন এবং জীব-জগতের কল্যাণ, সুখ, মঙ্গল এবং মুক্তির জন্য প্রচার করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মূলভিত্তি হলো চারিসত্য বিষয়ক শিক্ষা। বুদ্ধ সত্য-এর স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে মানব অস্তিত্বের স্বরূপ ও মানুষের দুঃখ-কষ্টের কারণসমূহ নিরূপন করেছেন এবং পথনির্দেশ করেছেন মানবমুক্তির যা মুলতঃ মানবিকতার কথা বলে। অর্থাৎ মানবিকতা দিয়ে বুদ্ধ তাঁর দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

প্রথম আর্যসত্য : দুঃখ

বুদ্ধের প্রথম আর্যসত্যে দেখা যায় দুঃখের অস্তিত্ব ঘোষণা। জীবনে দুঃখ আছে, ছিল এবং থাকবে। বুদ্ধ বলেছেন ; জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ, শোক-পরিবেদন দুঃখ, দৌর্মনস্য-হতাশা দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, প্রিয় বিয়োগ দুঃখ, আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ না করা তাও দুঃখ, সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদান স্কন্ধই দুঃখ[১৬]। পৃথিবীতে সবকিছুই দুঃখময়। মানুষ যাকে সুখ বলে মনে করে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় সেখানে থাকে দুঃখের বীজ। মানুষ জন্ম-জন্মান্তরে দুঃখ ভোগ করে আসছে প্রতিনিয়ত। দুঃখ সর্বজনীন ও সর্বকালীন। প্রকৃতপক্ষে অনন্ত দুঃখের বর্ণনা দেওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়। অন্তহীন দুঃখের মূল হলো পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ। সংক্ষেপে বলা যায় পঞ্চস্কন্ধ[১৭] দুঃখ উপাদান স্বপ্ন দুঃখ। দুঃখে হতাশ হবার কোনো কারণ নেই। কারণ দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

দ্বিতীয় আর্য সত্য : দুঃখ উৎপত্তির কারণ সত্য বা দুঃখ সমুদয়

যে তৃষ্ণা পুনর্জন্মসাধিকা নন্দিরাগসহগতা তত্রতত্র অভিনন্দিনী (জন্ম-জন্মান্তর অভিলাষিনী) তাই দুঃখ উৎপত্তির কারণ সত্য বা দুঃখ সমুদয়।[১৮] জগতে দুঃখ আছে এমন তা শুধু নয়, দুঃখের কারণও রয়েছে। তাঁর এই আর্যসত্যটি কার্যকারণ নীতিমালা হতে নিঃসৃত। পৃথিবীর কোনো কিছুই বিনা কারণে উৎপন্ন হয় না। প্রতিটি ঘটনার পিছনে কোনো না কোনো প্রকৃত কারণ রয়েছে এবং সেই কারণের ফলে কার্যের উদ্ভব হয়। কার্য সর্বদা কারণ সাপেক্ষ। কারণ না থাকলে কার্যের উৎপত্তি অসম্ভব। কারণের নিয়মাকতাই কার্যকে বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। এধরনের স্বাভাবিক নিয়মকে বুদ্ধ প্রতীত্যসমুৎপাদনীতি বা কার্যকারণ নীতি বলে অভিহিত করেছেন। তিনি

Dhaka University Institutional Repository

অনুসন্ধান করে শুধুমাত্র একটি কারণ পাননি পেয়েছেন কারণমালা যেগুলো একটি অপরটির সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। তারা পরস্পর চক্রাকারে বিশেষভাবে যুক্ত হয়ে মানুষকে জন্ম হতে জন্মান্তরে আকর্ষণ করে। বুদ্ধ বলেন ;

ইমস্মিং সতি ইদং হোতি, ইমস্স উপ্পাদা ইদং উপ্পজ্জতি
ইমস্মিং অসতি ইদং ন হোতি, ইমস্স নিরোধা ইদং নিরুজ্ঝতি।[১৯]

অর্থাৎ, ইহা থাকলে উহা হয়, ইহার উৎপত্তিতে উহার উৎপত্তি, ইহা না থাকলে উহা হয় না, ইহার নিরোধে উহার নিরোধ হয়।

এটাই প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি বা কার্যকারণ নীতিমালার মূলসূত্র। জড়জগৎ এবং মনোজগৎ উপরি-উক্ত নীতির মাধ্যমেই পরিচালিত। হেতুর উৎপত্তিতে ফলের উৎপত্তি, হেতুর নিরোধে ফলের নিরোধ।[২০] দুঃখের কারণ হিসেবে তিনি বারোটি কারণের কথা বলেছেন যা দ্বাদশ নিদান নামে পরিচিত। দ্বাদশ নিদানটি নিম্নরূপ[২১] :

> অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কার প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান প্রত্যয়ে নাম-রূপ, নামরূপ প্রত্যয়ে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শ প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনা প্রত্যয়ে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা প্রত্যয়ে উপাদান, উপাদান প্রত্যয়ে ভব, ভব প্রত্যয়ে জাতি, জরা, মরণ, শোক, পরিবেদন, ইত্যাদি।

উপরি-উক্ত বারোটি কারণ মানবজীবনকে অতীত, বর্তমান, ও ভবিষ্যতের মধ্য দিয়ে সংসারে চাকার মতো ঘোরাচ্ছে। এ কারণেই প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি বা কার্যকারণনীতিকে ভবচক্র নামেও অভিহিত করা হয়।

দুঃখের কারণ হলো তৃষ্ণা। তৃষ্ণা জাগতিক সকল প্রকার দুঃখের কারণ। তৃষ্ণা মানেই দুঃখ অবধারিত। তৃষ্ণা তিন প্রকার। এগুলো হলো : ক. কাম তৃষ্ণা, খ. বিভব তৃষ্ণা এবং গ. ভব তৃষ্ণা। প্রথম দুই প্রকার তৃষ্ণা শ্বাশতবাদ দৃষ্টির উপর প্রতিষ্ঠিত। তৃতীয় প্রকার তৃষ্ণা নাস্তিক (উচ্ছেদবাদ) দৃষ্টির উপর প্রতিষ্ঠিত।[২২] তৃষ্ণাই বিভিন্ন প্রকার কর্ম সৃষ্টি করে। একত্রে গ্রথিত করে। ইহাই সংস্কার চক্রের নির্ধারক। তৃষ্ণাকে চিরতরে বিনষ্ট করতে না পারলে জীবন সংগ্রামে উত্তীর্ণ হওয়া যাবে না। বহুরূপী তৃষ্ণাকে আত্মসংযত করতোঃ জীবনকে সুন্দর করে তোলাই যুক্তিযুক্ত। নতুবা জীবন অসার কিংবা অর্থহীন হয়ে পড়বে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় আর্যসত্য : দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য

তৃতীয় আর্যসত্যে বুদ্ধ দুঃখ বিনাশ সাধনের কথা বলেছেন। এখানে তিনি দ্বিতীয় আর্যসত্য থেকে নৈয়ায়িক পদ্ধতির অনুসরণে তৃতীয় আর্যসত্যের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। দুঃখের যে বারোটি কারণ রয়েছে তার অবসান ঘটাতে পারলেই দুঃখের নিরোধ সম্ভব। এখানে তৃষ্ণার নিরোধ বা বিনাশ সাধনই দুঃখনিরোধ। দুঃখ নিরোধ হলো নির্বাণ। ইহা অস্তিত্বহীন কোনো অবস্থা নয়। উপরন্তু নির্বাণ হলো অনুৎপন্ন, অচ্যুত, অনির্মিত এবং অসংস্কৃত। নির্বাণ আর্যসত্য উৎপন্ন করে না। বরং নির্বাণ উপলব্ধিতে আর্যসত্য এগিয়ে দেয়। তৃষ্ণার অশেষ বিরাগ-নিরোধ, ত্যাগ-বির্সজন তা হতে মুক্তি ও তৎপ্রতি অনাসক্তি-ই হলো দুঃখ নিরোধ।[২৩] সংসার একটি বহমান নদী সদৃশ। বলা যায় দুঃখের নদী। প্রতিনিয়ত এখানে দুঃখের সাথে পাঞ্জা দিয়ে সবাইকে লড়াই করতে হয়। সংগ্রাম করতে হয়। দুঃখ উৎপত্তির পিছনে রয়েছে অবিদ্যা (ignorance)। যে সমস্ত কারণ হতে দুঃখ জন্মে তাদের ধ্বংস হলেই দুঃখের নিবৃত্তি হয়। তাই বলা হয়েছে ;

যথাপি মূলে অনুপদ্দবে দল্হে ছিন্নোপি রুক্খো পুনরেব রুহতি
এবম্পি তণ্হানুসযে অনূহতে নিব্বত্ততি দুক্খমিদং পুনপ্পুনং।[২৪]

অর্থাৎ, মূল একেবারে উৎপাটিত না হলে ও দৃঢ় থাকলে ছিন্ন বৃক্ষ যেমন পুনরায় বৃদ্ধি পায়, সেরূপ তৃষ্ণামূল বিনষ্ট না হলে দুঃখও পুনঃপুন উৎপন্ন হয়।

মানবজীবনে তৃষ্ণা হলো মূল শিকড়। তৃষ্ণাকে সমূলে ধ্বংস করতে না পারলে দুঃখের উৎপত্তি হবেই। তৃষ্ণার মূলে রয়েছে অবিদ্যা (ignorance)। অবিদ্যা ধ্বংস হলেই প্রজ্ঞা (wisdom) উৎপন্ন হয়। জ্ঞান (knowledge) এবং প্রজ্ঞাকে (wisdom) এক করে দেখা কখনো উচিত নয়। জ্ঞানের মধ্যে কুশল এবং অকুশলের সংমিশ্রণ থাকে কিন্তু প্রজ্ঞা হচ্ছে বিশুদ্ধ জ্ঞান বা পরিশীলিত জ্ঞান যার মধ্যে অকুশলের ছোঁয়া নেই। সুতরাং অবিদ্যা এবং তৃষ্ণার নিরোধ হলেই দুঃখ নিরোধ হয়। মানুষ আপন চিত্তকে সংযতকরণের মধ্য দিয়ে সত্যের অনুশীলনের মাধ্যমে আপন প্রচেষ্টায় দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে।

চতুর্থ আর্যসত্য : দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যসত্য

দুঃখ, দুঃখের কারণ এবং দুঃখ নিরোধ বুদ্ধের চূড়ান্ত কথা নয়। তিনি দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যসত্যের কথা বলেছেন। তিনি এটাকে মার্গ বা পথ হিসেবে অভিহিত করেছেন। দুঃখ নিরোধের উপায় হিসেবে তিনি আট প্রকার

Dhaka University Institutional Repository

কর্মপদ্ধতির কথা বলেন যা বৌদ্ধ সাহিত্য কিংবা দর্শনে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ নামে সুপরিচিত। জগৎ সংসার দুঃখময়। এটাকে অতিক্রম করতে হলে দরকার অষ্টাঙ্গিক মার্গ। মার্গসমূহে কোনো রকম অনাবশ্যক কৃচ্ছসাধন যেমন নেই তেমনি নেই অসংযত ভোগবিলাস। অথচ এদের মধ্যবর্তী এক পন্থা উদ্ভাবন করে মুক্তি লাভের এক সুন্দর পথ নির্দেশ করা হয়েছে। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের মধ্যেই বৌদ্ধদর্শনের নীতিতত্ত্বকে প্রকাশ করা হয়েছে। এভাবে বৌদ্ধদর্শনের দুঃখ থেকে মানুষের মুক্তির পথ নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[২৫] মুক্তির উপায়টি মানুষের মঙ্গল কিংবা কল্যাণের সাথে জড়িত যা সবার জন্য উন্মুক্ত।

যিনি আর্যসত্যকে প্রজ্ঞাময় দৃষ্টিতে গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেন তিনিই পঞ্চস্কন্ধের কিংবা নাম-রূপের যথার্থ উপলব্ধি করেন। আর্যসত্যের অনুভূতি ছাড়া কেউ আর্য হতে পারে না। আর্য মাত্রই সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করেন। এ প্রসঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ 'ধর্মপদ' নামক গ্রন্থে দেখা যায়,

ন তেন অরিযো হোতি যেন পাণানি হিংসতি
অহিংসা সব্বপাণানং অরিয়ো'তি পবুচ্ছতি।[২৬]

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি প্রাণির প্রতি হিংসা বা ক্রোধ করে তার দ্বারা সে আর্য হতে পারে ন। যিনি সকল প্রকার প্রাণীর প্রতি অহিংসা ভাব প্রদর্শন করেন তিনিই আর্য নামে কথিত হন।

এ জন্য চার প্রকার চিরন্তন চিরশাশ্বত সত্যের নামকরণ করা হয়েছে আর্যসত্য যা গভীরভাবে বিশ্বাস কিংবা উপলব্ধি করলে ব্যক্তি মাত্রই আর্যসত্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞান লাভ করতে পারে। বস্তুত সংসার নামক সাগরে ভবদুঃখ যার অপ্রিয় তাঁর পক্ষে আর্য সত্যানুসন্ধান সহজতর হয়। বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মানব দুঃখ, মানব দুঃখের বিষয়, মানব দুঃখের কারণ ও তা থেকে পরিত্রাণের উপায়ও বুদ্ধ সুচারুরূপে বর্ণনা করেছেন যা কিনা মানবতার কথা বলে

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ

যে মার্গ বা পথ অনুসরণ করে দুঃখ থেকে চিরমুক্তি লাভ করা যায় সেই দর্শনকে বৌদ্ধদর্শনে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ নামে অভিহিত করা হয়। মার্গটি অনুসরণ করতে হলে আট প্রকার কর্মপদ্ধতি বা নিয়মাবলি অনুসরণ করা প্রয়োজন। এটি মধ্যমপথ নামেও সমধিক পরিচিত। এটাকে ব্যবহারিক পথনিদের্শনা হিসেবে অভিহিত করা হয়। এগুলো হলো : ক. সম্যক দৃষ্টি, খ. সম্যক সংকল্প, গ. সম্যক বাক্য, ঘ. সম্যক কর্ম, ঙ. সম্যক জীবিকা, চ. সম্যক প্রচেষ্টা, ছ. সম্যক স্মৃতি, এবং জ. সম্যক সমাধি। এখানে 'সম্যক' অর্থ সঠিক, যথার্থ, শুদ্ধ, সুন্দর, এবং

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্রতাকে বোঝায়। অন্যভাবে বলা যায়, 'সম্যক' অর্থ হচ্ছে নির্মল, নির্দোষ এবং নিষ্কলুষ। উপরি-উক্ত মার্গ অনুসরণকারীরা সংসারের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে নিরোধ করে পরম শান্তি নির্বাণ সুখ অধিগত করতে সমর্থ হন। সুপ্রসিদ্ধ ধর্মপদ নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে- 'মগ্গানট্ঠঙ্গিকো সেট্ঠো'। এখানে অষ্টবিধ মার্গের শ্রেষ্ঠতার কথা বলা হয়েছে। বুদ্ধ প্রদর্শিত মার্গসমূহ হলো অন্ধবিশ্বাস বর্জিত। এখানে ভ্রান্ত ধারণা নেই। নেই অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস কিংবা আস্থা রাখা। এখানে মিথ্যাচারের কোনো রকম আশ্রয় নেই। আছে শুধু দুঃখ থেকে মুক্তিলাভের যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক অনুশীলন। বুদ্ধ বলেছেন ; 'তুমহেহি কিচ্চং আতপ্পং অক্খাতারো তথাগতো'।[২৭] অর্থাৎ, 'তোমাদের কাজ করতে হবে। তথাগত পথ প্রদর্শক মাত্র'। পথটি হলো সর্ব সাধারণের প্রস্তুতির পথ। যে পথের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব। এটি নৈতিক জীবনের যেমন ভিত্তি তেমনি আধ্যাত্মিক ধ্যান সাধনার মাধ্যমে বিমুক্তি সুখ উপভোগ করার একমাত্র সোপান বিশেষ। বুদ্ধ সর্বপ্রথম পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের[২৮] উপলক্ষ্য করে সারনাথের মৃগদাবে যে ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র দেশনা করেছিলেন তন্মধ্যে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের ব্যাখ্যা রয়েছে। অষ্টবিধ মার্গের মাধ্যমে যে কেবল শান্তি, দিব্যজ্ঞান, সম্বোধি, নির্বাণ লাভ হয় তা নয় ; জীবনের অভ্যুদয়ও লাভ হয়। শুধু কি তাই? না। সুখ, কীর্তি এবং যশও লাভ হয়। এ প্রসঙ্গে সূত্রপিটকের অন্তর্গত 'থেরগাথা' নামক গ্রন্থে দেখা যায় ;

সুখং সুখখো লভতে তদাচরং
কিত্তিঞ্চ পপ্পোতি যস্স বড্ঢতি,
যে অরিয়ট্ঠঙ্গিকমগ্গং উজুং
ভাবেতি মগ্গং অমতস্স পত্তিযা'তি[২৯]।

অর্থাৎ, যিনি সরল আর্য অষ্টবিধ মার্গ নির্বাণ প্রাপ্তির জন্য একাগ্রচিত্তে ভাবনা করেন, সেই সুখার্থী তদানুরূপ আচরণ করে ধ্যান-সুখ ও নির্বাণ সুখ লাভ করেন। সেই কারণে তিনি সুখ্যাতি অর্জন করে এবং পরিবার সম্পদ-সম্পত্তিতে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেন।

ক. সম্যক দৃষ্টি : যথাযথ দৃষ্টি বা অভ্রান্ত দৃষ্টি। অন্যভাবে বললে বলা যায় ; সম্যক দৃষ্টি অর্থ যর্থাথ জ্ঞান। এখানে সম্যক দৃষ্টি বলতে কর্ম ও কর্মফল সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানকে বোঝায়। চারি আর্যসত্য সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানকে বোঝায়। এক সময় বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে উপলক্ষ্য করে বলেন ; কেউ মিথ্যা কর্মকে মিথ্যাকর্ম এবং সম্যক কর্মকে সম্যক কর্ম বলে জানে তা-ই সম্যক দৃষ্টি।[৩০] এটি মোহ (delusion) এবং অবিদ্যার (ignorance) সমুচ্ছেদ করে। অবিদ্যা

Dhaka University Institutional Repository

আর মোহ হলো সকল প্রকার দুঃখের মূল কারণ। সুতরাং জগৎ ও জীবনের স্বরূপ এবং দুঃখের উৎপত্তি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান ভিন্ন মুক্তিলাভ কখনো সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে দেখা যায় ;

> 'It is the knowledge of these truths alone and not any theoretical speculation regarding nature and self, which, according to Buddha helps moral reformation, and leads us towards the goal nirvāna'[৩১]

খ. সম্যক সংকল্প : 'সম্যক' বলতে সৎ বা যথাযথ আর 'সংকল্প' বলতে প্রতিজ্ঞা, স্থিরীকৃত কাজ, মানসকর্ম ইত্যাদিকে বোঝায়। অন্যভাবে বলা যায়, সম্যক সংকল্প মানে সর্বোত্তম সৎ সংকল্প। আদর্শ, শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন এবং সত্য জ্ঞানানুসারে জীবনগঠনের জন্য সৎ সংকল্প পরায়ণ হওয়া উচিত। সংকল্প যত সুন্দর ও মহৎ হয় মানুষের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা ততোধিক উন্নত হবে। এ ধরনের সংকল্প গ্রহণকারীরা সর্বত্র নন্দিত-বন্দিত এবং সুখে দিনাতিপাত করে। বুদ্ধ এ বিষয়ে বলেন ; নৈষ্কম্য সংকল্প,[৩২] অব্যাপাদ সংকল্প[৩৩] এবং অবিহিংসা[৩৪] সংকল্পকে সম্যক সংকল্প বলা হয়।[৩৫]

গ. সম্যক বাক্য : অসত্য ভাষণই মিথ্যা। লোভের কারণে মিথ্যা ভাষণের প্রবৃত্তি জন্মে। এক মিথ্যা অসংখ্য অসংখ্য মিথ্যার জন্ম দেয়। একটি সত্যকে চাপা দিতে গিয়ে অসংখ্য মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। মিথ্যাভাষণ কখনো কাম্য নয়। বুদ্ধ বলেন ; মিথ্যাভাষণ হতে বিরত, পিশুন বাক্য বা বিদ্বেষ বাক্য হতে বিরত কর্কশ বাক্য হতে বিরত এবং তুচ্ছ বা সম্প্রলাপ বাক্য হতে বিরতই হলো সম্যক বাক্য।[৩৬] মিথ্যা কথা বলা, খারাপ কথা বলা, অযথা বাক্য, কর্কশ বাক্য, ভেদ বাক্য, পরের সমালোচনা করা প্রভৃতি থেকে মুক্ত থাকাই হলো বাক্য সংযম। এ কারণে এস. সি চ্যার্টার্জী এবং ডি. এ দত্ত বলেন ;

> 'The result would be right speech consisting in abstention from lying, slander, unkind words and frivolous talk'.[৩৭]

সৎ বা সত্যসন্ধানী ব্যক্তি মাত্রই মিথ্যা, পিশুন বা বিদ্বেষ পরুষ বা কর্কশ সম্প্রলাপ বা বৃথা বাক্য পরিহার করে সর্বপ্রকার বাক্য দোষ বিরহিত শুদ্ধ সৎ-সুন্দর, মধুর অর্থপূর্ণ বাক্যালাপই করেন। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় মানুষে মানুষে, জাতিতে-জাতিতে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে, গোত্রে-গোত্রে প্রীতি-সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন ও শান্তিময় সহাবস্থানের জন্য বুদ্ধ প্রদর্শিত সম্যক বাক্য প্রয়োগ করাই সর্বোত্তম মঙ্গল।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. সম্যক কর্ম : কর্ম বলতে অনুষ্ঠান করা, নির্মাণ করা বা সম্পাদন করা অর্থাৎ কোনো কাজ করাকে বোঝায়। বৌদ্ধ পরিভাষায় কর্ম বলতে শুভাশুভ বা কুশলাকুশল ইচ্ছা বা প্রবৃত্তিকে কর্ম নামে অভিহিত করা হয়। বুদ্ধ বলেন ; প্রাণিহত্যা হতে বিরত, অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত, ব্যভিচার হতে বিরত থাকাকে বলা হয় সম্যক কর্ম।[৩৮] সৎ কর্ম বা পবিত্র কর্ম সম্পাদন করাই হলো সম্যক কর্ম। অর্থাৎ যে কর্ম সম্পাদন করলে মানুষের নৈতিক ও মানসিক অগ্রগতি বা আত্মিক উন্নতি সাধনে সহায়তা করে তা-ই সম্যক কর্ম। বুদ্ধ প্রদর্শিত কর্মে চিত্ত এবং চৈতসিকের কায়িক-বাচনিক এবং মানসিক অভিব্যক্তি বিরাজমান। বৌদ্ধমতে কর্মই ধর্ম। বুদ্ধ সবসময় কর্মকে প্রাধান্য দিয়েছেন। উত্তম কর্মের মাধ্যমে যে কেউ যশ-খ্যাতি অর্জন করতে পারে। এমন কি বাতাসের বিপরীত দিকেও তাদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। কর্ম সম্পাদনে কে কোন সম্প্রদায়ের, কোন জাতির এবং কোন গোত্রের তা বিবেচেনা করা হয় না।[৩৯] এ প্রসঙ্গে 'সূত্র নিপাত' নামক গ্রন্থের 'বসল সূত্রে' দেখা যায় ;

ন জচ্চা বসলো হোতি ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো
কম্মুনা বসলো হোতি কম্মুনা হোতি ব্রাহ্মণো।

অর্থাৎ , জন্মের দ্বারা কেউ বৃষল বা নিচু জাতি হয় না, জন্মে দ্বারা কেউ ব্রাহ্মণও হন না। কর্মের দ্বারাই কেউ বৃষল বা নীচু জাতি হয়, ব্রাহ্মণও হন কর্মের দ্বারা।

জীবন কর্মময়। কর্মের দ্বার তিনটি। যেমন : ক. কায় দ্বার, খ. বাক্য দ্বার, এবং গ. মনো দ্বার। তিনটি দ্বার দিয়েই মানুষ অহরহ কর্ম সম্পাদন করে চলছে। মানুষ মাত্রই তার কর্মে অধীন। মানুষ মাত্র কর্মের মধ্য দিয়ে নিজেকে তৈরী করে নেয়। ব্যক্তি যেভাবে কাজ করে ঠিক তেমনিই তার স্বভাব-চরিত্র বা ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। সমাজের প্রতিটি লোক যদি ভালো করে ; দেশের মঙ্গলের জন্য উত্তম কাজ সম্পাদন করে তবে পরিবার, সমাজ সর্বোপরি দেশের উন্নতি বা কল্যাণ সাধিত হবে।

ঙ. সম্যক জীবিকা : অষ্টাঙ্গিক মার্গের মধ্যে পঞ্চম মার্গ হলো সম্যক জীবিকা। 'জীবিকা' মানে জীবনধারণের জন্য অবলম্বিত বৃত্তি বা পেশাকে বোঝায়। সম্যক জীবিকা হচ্ছে বিশুদ্ধ জীবিকা যেখানে কোনো রকম পাপের স্পর্শ থাকে না। বুদ্ধ বলেন ; মিথ্যা জীবিকা পরিহারপূর্বক সম্যক জীবিকার মাধ্যমে জীবনযাপন করার নামই হলে সম্যক জীবিকা।[৪০] এতে নিজের এবং অপরের কোনো রকম ক্ষতি হবার আশঙ্কা নেই। রিস ডেভিড্স সম্যক জীবিকার ব্যাখ্যা করেছেন ; in the right way, as it ought to best.[৪১] বিশিষ্ট্য বৌদ্ধ পণ্ডিত Thahissaro সম্যক জীবিকার স্বরূপ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন ; There is the case where a noble disciple having abandoned dishonest livelihood keeps his life going with right livelihood. This is called

Dhaka University Institutional Repository

livelihood.[৪২] যে পেশা বা বৃত্তি কারো মঙ্গল নিয়ে আসে না ; কল্যাণ সাধন করে না, সেই জীবিকা কখনো সুখ প্রদান করে না। আর সে-ই পেশা বা বৃত্তি শুদ্ধ হয় না। মানুষ তার বেঁচে থাকার জন্য বিভিন্ন রকম পেশ বা বৃত্তি অবলম্বন করে। কর্মমূখর জীবনে মানুষের পেশার অন্ত নেই। কিন্তু এটাও স্মরণীয় যে, সৎ ভাবে জীবনযাপন করতে হলে সুন্দর পেশা দরকার। যে পেশা বা জীবিকা অন্যকে প্রবঞ্চনা করতে শেখায় ; পীড়া দিতে শেখায় ; প্রাণহানির আশংকা আছে সেই পেশা শুদ্ধ হয় না কখনো। এমতাবস্থায় বুদ্ধ পঞ্চবিধ বাণিজ্যকে অকল্যাণকর বলে অভিহিত করেছেন। পঞ্চবিধ বাণিজ্যসমূহ[৪৩] হলো যথাক্রমে – ক. অস্ত্র ব্যবসা হতে বিরত থাকা ; খ. প্রাণিহত্যা হতে বিরতি থাকা ; গ. মাংস ব্যবসা হতে বিরত থাকা ; ঘ. মাদক ও নেশা জাতীয় বাণিজ্য হতে বিরত থাকা এবং ঙ. বিষ ব্যবসা থেকে বিরত থাকা। বুদ্ধ কর্তৃক নিষিদ্ধ পঞ্চ বাণিজ্যে ব্যক্তি, গোত্র, সমাজ, জাতি সর্বোপরি রাষ্ট্রের জন্য মহাক্ষতিকর। তাই বুদ্ধ এ সমস্ত বাণিজ্য সম্পাদন থেকে দূরে থাকার কথা বলেছেন। মিথ্যা জীবিকার প্রতি বিরতভাব প্রদর্শন করে সম্যক জীবিকার প্রতি আস্থাশীল হলে জীবন সার্থক হয় এবং সুন্দর হয়। আগাছাহীন ভূমি যেমন বীজবপনের ক্ষেত্র স্বরূপ তেমনি নৈতিক বিশুদ্ধি চিত্তভূমিতে সম্যক জীবিকা বপনের শ্রেষ্ঠ অবদান স্বরূপ। ব্যক্তি সৎ হয়ে জীবিকা অবলম্বন করলে জাতি তথা রাষ্ট্রেরও সুনাম হয়।

চ. সম্যক ব্যায়াম বা প্রচেষ্টা : প্রকৃষ্টরূপে উন্নতি সাধনের প্রবল চেষ্টার নামই ব্যায়াম বা প্রচেষ্টা। এটাকে আবার উদ্যম হিসেবে অভিহিত করা হয়। মিথ্যাদৃষ্টি ত্যাগের জন্য ও সম্যক দৃষ্টি লাভের জন্য যে প্রচেষ্টা তাকে বলা হয় সম্যক প্রচেষ্টা।[৪৪] দৈহিক, মানসিক সকল প্রকার পাপকাজ থেকে বিরত থাকা উচ্চতর সৎকর্মে মননশীলতা, চিত্তবিশুদ্ধির প্রবল অধ্যাবসায়ই সম্যক ব্যায়াম বা প্রচেষ্টা।[৪৫] সম্যক প্রচেষ্টায় মিথ্যা সংকল্প পরিত্যাগ এবং সম্যক সংকল্প অর্জনের অবিরাম চেষ্টা করা হয়। মহামতি বুদ্ধ এ ধরনের সত্যক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে বলেছিলেন ;

গহকারক ! দিট্‌ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি
সব্বা তে ফাসুকা গহকূটং বিসঙ্খিতং
বিসঙ্খারগতং চিত্তং তণহানং খযমজ্ঝগা।[৪৬]

অর্থাৎ, হে গৃহকারক! এক্ষণে আমি তোমার সন্ধান লাভ করেছি। তুমি পুনবার আর গৃহনির্মাণ করতে সক্ষম হবে না। তোমার সমুদয় পার্শ্বক ভগ্ন এবং গৃহকূট বিচ্ছিন্ন হয়েছে। আমার সংস্কারমুক্ত চিত্ত সমুদয় তৃষ্ণার ক্ষয় সাধন করেছে।

ব্যায়াম, প্রচেষ্টা, শৌর্য-বীর্য, পরাক্রম একার্থবোধক শব্দ। মানবজীবনে উত্তরোত্তর উন্নতি সাধনে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পৃথিবীতে উদ্যমহীনের কোনো স্থান নেই। অলসতা পশ্চাতে নিয়ে যায়। আত্মশক্তিকে দুর্বল

Dhaka University Institutional Repository

করে দেয়। সামনের দিকে এগোতে দেয় না। দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় নিজের প্রচেষ্টা বা উদ্যমের ক্ষেত্রে বীর্যকে আরো গতিশীল করতে হয়ে। 'মিলিন্দ প্রশ্ন' নামক গ্রন্থে বীর্যের স্বরূপ সম্পকে বলা হয়েছে ; 'বিরিয়ুপথম্ভিতা সব্বে কুসলা ধম্মা ন পরিহাযন্তীতি। অর্থাৎ, সকল কুশল ধর্ম বীর্যের দ্বার উপস্তব্ধ (নিরুদ্ধ, ধৃত) হয়ে বিনষ্ট হয় না।[৪৭] মানুষ স্মৃতিহীন হলে বীর্য তার গতি সঞ্চার করে। অল্প সংখ্যক সেনা পরাজিত হতে দেখে রাজা বহু সংখ্যক সেনা পাঠালে আগের সৈন্যরা মনোবল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে সামনের দিকে এগোতে থাকে। এখানে অনুরূপভাবে বীর্য স্মৃতি উপধারক। বুদ্ধ এটাকে চার ভাগে বিভাজন করে দেখিয়েছে। এগুলো হলো [৪৮]:

ক. অনুৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্ম সমূহের অনুৎপাদনের চেষ্টা ;

খ. উৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্মসমূহ দূরীকরণের জন্য চেষ্টা ;

গ. অনুৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহ সম্পাদনের চেষ্টা এবং

ঘ. উৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহ প্রবৃদ্ধি করার চেষ্টা।

ছ. সম্যক স্মৃতি : পালিতে যাকে 'সতি' বলা হয় তার বাংলা অর্থ 'স্মৃতি'। সংস্কৃত 'সর' ধাতু নিষ্পন্ন স্মরণ করা অর্থে 'স্মৃতি'। স্মৃতির বর্ণনা প্রসঙ্গে দেখা যায়, 'সেই উপলক্ষে স্মরণে রাখা, মনে ফিরিয়ে আনা ; স্মৃতি হলো - স্মরণ রাখা, মনে ধারণা করা'।[৪৯] বলা যায়, যা দ্বারা কুশল আলম্বন সামরণ করা হয় তাই স্মৃতি। এখানে স্মৃতি বলতে সম্যক স্মৃতিকে বুঝতে হবে। অকুশল বিষয় মনে উদিত হওয়া সম্যক স্মৃতি নয়। স্মৃতি পাশ্চাত্য দৃষ্টির স্মরণমক্তি নয়। 'পালি-বাংলা অভিধান' নামক গ্রন্থে শব্দগত অর্থ করা হয়েছে এভাবে ; স্মৃতিশক্তি, প্রজ্ঞাময় স্মরণ, স্মরণ রাখবার ক্ষমতা, পূর্বানুভূত বিষয়ের জ্ঞান, ধারণা শক্তি, মনোযোগিতা, লক্ষ্যকারিতা, একাগ্রচিত্ততা, মনের অভিনিবিষ্টতা, মনের দৃঢ় সংকল্পতা, মনের জাগ্রত অবস্থা।[৫০] পালি বহির্ভূত গ্রন্থ 'মিলিন্দ প্রশ্নে' দেখা যায়, 'স্মরণ ও উপগ্রহণ হচ্ছে স্মৃতির লক্ষণ'।[৫১] সম্যক স্মৃতি মানে যথাযথ পর্যবেক্ষণ। দৈহিক-মানসিক সকল প্রকার অবস্থা সূক্ষ্মদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ বা স্মরণ করার নামই হলো সম্যক স্মৃতি। এতে চিত্ত সৎকর্মে কিংবা কুশলকর্মে নিবিষ্ট হয়। মনোসংযোগ ইহার একার্থবোধক শব্দ। কী প্রকারে এটাকে বৃদ্ধি করতে হয় তার বর্ণনা 'সতিপট্ঠান সুত্তে' রয়েছে। স্মৃতি সহকারে মিথ্যাদৃষ্টি পরিহার ও সম্যক দৃষ্টি লাভ করে অবস্থান করাকে সম্যক স্মৃতি বলা হয়েছে।[৫২] বৌদ্ধধর্মে স্মৃতির ভূমিকা অপরিসীম। জীবনে ভালো-মন্দ বিচরণকরণে স্মৃতির ক্ষমতা অপরিসীম। এটি হিত কিংবা কল্যাণকে গ্রহণ করে অহিত কিংবা অকল্যাণকে বর্জন করে। যতক্ষণ স্মৃতি থাকে ততক্ষণ মনে অকুশল চেতনা আসে না। তাই স্মৃতির আর এক নাম অপ্রমাদ। কায়-বাক্য-মন দ্বারে যে অকুশল উৎপন্ন হয় তা রক্ষার ব্যাপারে

Dhaka University Institutional Repository

স্মৃতি সজাগ প্রহরীর মতো কাজ করে। সম্যক স্মৃতি দ্বারা বোঝা যায়, মন বা চিত্ত যেন পথভ্রষ্ট না হয়। প্রসঙ্গক্রমে নিম্নলিখিত উক্তিটি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য ;

> 'if we are not mindful, we have as though the body, the mind, sensation and mental states are permanent and valuable'[৫৩]

জ. সম্যক সমাধি : সমাধি, ধ্যান, ভাবনা, কর্মস্থান সাধনা একার্থবোধক। 'ধ্যান' হলো অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মানসিক স্তরের নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাবার অবস্থা মাত্র। ধ্যানের মূল উদ্দেশ্য হলো চিত্তসংযম। আচার্য বুদ্ধঘোষ চিত্ত এবং সমাধিকে একীভূত করে বিশ্লেষণ করেছেন। কুশলচিত্তের একাগ্রতাই সমাধি। এ বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে ; প্রমুখ বা শ্রেষ্ঠকে সমাধির লক্ষণ বলা হয়। কেননা, যা কিছু কুশলধর্ম সমূহ তৎসমস্তই সমাধি প্রমুখ, সমাধি নিম্ন, সমাধি প্রবণ এবং সমাধির প্রতি অবনত হয়।[৫৪] 'দীর্ঘ নিকায়' নামক গ্রন্থের 'জনবসভ সূত্রে' উল্লেখ রয়েছে ; সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, এবং সম্যক স্মৃতি। এই সপ্ত প্রকার অঙ্গের দ্বারা যে একগ্রতা সম্পাদিত হয় ; উহা উপনিশ্রয়িত এবং পরিস্কৃত তাই সম্যক সমাধি বলে কথিত হয়।[৫৫] সম্যক দৃষ্টিবান মানুষ সম্যক সংকল্পে সমর্থ হন। সম্যক সংকল্পবান মানুষ সম্যক বাক্যে সমর্থ হন। সম্যক বাক্যযুক্ত মানুষ সম্যক কর্মে সমর্থ হন। সম্যক কর্মবান মানুষ সম্যক জীবিকায় সমর্থ হন। সম্যক জীবিকায় মানুষ সম্যক প্রচেষ্টায় সমর্থ হন। সম্যক প্রচেষ্টাবান মানুষ সম্যক স্মৃতিতে সমর্থ হন। সম্যক স্মৃতিবান মানুষ সম্যক সমাধিতে সমর্থ হন। সম্যক সমাধিবান মানুষ সম্যক জ্ঞানে সমর্থ হন। সম্যক জ্ঞানবান মানুষ সম্যক বিমুক্তিতে সমর্থ হন।[৫৬] সমাধি লাভের হেতু বা কারণ আট প্রকার। এগুলো হলো : ক. ত্যাগ, খ. মৈত্রী, গ. শুচিতা, ঘ. নিরুদ্বেগ, ঙ. সকল প্রকার কুশলধর্ম, চ. বিচার, এবং ছ. সত্যজ্ঞান।[৫৭]

সমাধি ব্যতীত চিত্তবিশুদ্ধি হয় না। মানবজীবনকে সার্থক করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সমাধির বিকল্প নেই। ইতস্ততঃ, বিক্ষিপ্ত, বিচরণশীল চিত্তকে সংযত করার ক্ষেত্রে সমাধি অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করে। নৈতিক আচার-আচরণ পরিপুষ্ট সমাধি মহামঙ্গল সাধন করে। একটি মাত্র বিষয়ে চিত্তের অবস্থানই হলো সমাধি। সমাধি কাম তৃষ্ণা, লালসা, লোভ-দ্বেষ-মোহ, বিদ্বেষ, তন্দ্রালস্য, সৎ কর্মে অলসতা সংশয়াদি অপসারিত করে।

সদ্ভাবে জীবনযাপনের উপায় হিসেবে অষ্টবিধ মার্গ গ্রহণযোগ্য। মার্গের অঙ্গসমূহ নৈতিক জীবনগঠনের অন্যতম উপায়। মার্গটির অঙ্গসমূহ পরিপালনে শুধুমাত্র সাধকের ইহজীবনের দুঃখ নিবৃত্তি হয় ; নির্বাণের অনুভূতি আসে তা নয়, এগুলো আয়ত্ব ও অনুশীলন করতে পারলে সংসারজীবনও সুখময় হয়। অনুশীলনের সুবিধার্থে অষ্টবিধ মার্গ

Dhaka University Institutional Repository

প্রজ্ঞা, শীল এবং সমাধি বিভাজিত। অর্থাৎ, এখানে প্রজ্ঞার দুই অঙ্গ, শীলের তিন অঙ্গ এবং সমাধির তিন অঙ্গ। বুদ্ধ বলেছেন ; অষ্টবিধ মাগই দুঃখ নিরোধগামিনী।[৫৮] সূত্র পিটকের অন্তর্গত মধ্যম নিকায়ের 'চুল্লবেদল্ল সূত্র'-এ বিষয়ে দেখা যায় ; আর্য অষ্টবিধ মার্গ তিন স্কন্ধে সংগৃহীত নহে বরং তিন স্কন্ধেই আর্য অষ্টবিধ মার্গ সংগৃহীত। সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, এবং সম্যক জীবিকা এই সকল ধর্মসমূহ শীলস্কন্ধে সংগৃহীত। যা সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, এবং সম্যক সমাধি এই ধর্মসমূহ সমাধি স্কন্ধে সংগৃহীত। যা সম্যক দৃষ্টি এবং সম্যক সংকল্প এই সকল ধর্মসমূহ প্রজ্ঞা স্কন্ধে সংগৃহীত।[৫৯] মহাকবি অশ্বঘোষ বলেছেন আর্য অষ্টবিধ মার্গের সম্যক বচন, সম্যক কায়কর্ম (কর্ম) ও সম্যক জীবিকা-এই তিন অঙ্গ কর্মবিধি ; সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প ও সম্যক প্রচেষ্টা-এই তিন অঙ্গ জ্ঞানবিধি ; এবং সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি-এই দ্বিবিধ অঙ্গ যোগবিধি। কর্মবিধি আশ্রয় করলে ধর্ম লাভ হয়। জ্ঞানবিধিকে আশ্রয় করলে ক্লেশ ক্ষয় হয় এবং যোগবিধিতে শম সহকারে প্রবৃত্ত হলে চিত্ত সংযত হয়। চিত্ত স্থির হয়।[৬০] সুন্দর জীবনগঠনে, মানবের মহাকল্যাণে যে কজন মহামানব সমাজ তথা রাষ্ট্রের বহুমুখী কল্যাণের কথা যারা বলেছিলেন তন্মধ্যে বুদ্ধ কালজয়ী মহাপুরুষ। বুদ্ধ প্রদর্শিত অষ্টবিধ মার্গের সাহায্যে বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্রের স্বরূপ বোঝা যায়। এ প্রসঙ্গে গোপাল হালদার বলেন ;

> বৌদ্ধ মতবাদ কার্যত এক অত্যন্ত স্বাভাবিক বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় দিল। সামাজিক জীবনের যা পরম প্রয়োজন, সহজ জীবনযাত্রার যা একমাত্র পাথেয়-বৌদ্ধধর্মের পথ তাই; ক্ষমা, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা প্রভৃতি আর্য অষ্টমার্গ এই পথ। বুদ্ধের 'মধ্যম পথ' ইন্দ্রিয় লালসার নয় ইন্দ্রিয় সংযমের নিশ্চয়ই। এক সমন্বয় সন্ধানী বস্তুনিষ্ঠ চেতনার আবিস্কার যে চেতনা সমাজের দাবীকে সশ্রদ্ধ চিত্তেই গ্রহণ করেছে।[৬১]

বৌদ্ধধর্ম মানুষের নৈতিক দিকটির উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেন মানুষের আচার-আচরণের নৈতিক দিকটি এই শিক্ষায় একটি স্থান করে দেয়। বুদ্ধ মানুষকে আহ্বান জানিয়েছিলেন অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করতে, চর্চা করতে, সঠিক মতামত উপস্থাপন করতে, সঠিক চিন্তা করতে, উদ্যমী হতে, সঠিক বাক্য বলতে ইত্যাদি। তাঁর শিক্ষা অনুযায়ী মানুষ সঠিক পথের যথাযোগ্য অনুসরণকালে সম্পূর্ণভাবে নিজের উপর নির্ভর করে, অন্য কারোর উপর নয়, বাইরে থেকে নিরাপত্তা, সাহায্য ও মুক্তিলাভের প্রত্যাশী হবে না। মানবতার প্রতিটি দিক উপরি-উক্ত বিষয়গুলোর গভীরতার মধ্যে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় যা কিনা আজ থেকে থেকে ২৫৫৯ বছর পূর্বেই বুদ্ধ উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং তার বিশ্লেষণধর্মী ব্যাখ্যা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

অহিংসা

বৌদ্ধদশনে মানবতার মধ্যে আরো যে দিকগুলো রয়েছে তন্মধ্যে বিশেষভাবে উচ্চারিত হয় 'অহিংসা'। বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্র বা মূলবাণী এটি। অহিংসা হচ্ছে হিংসা না করা। অর্থাৎ হিংসাবৃত্তির অভাব বা দ্বেষহীনতা।[৬২] বুদ্ধের অহিংসা নীতিতে মানবতাবাদের একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়। তিনি মানুষকে সবার উপরে স্থান দিয়েছেন। অহিংসা নীতি দ্বারা মানুষের প্রতি মানুষের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে দৃঢ় করার কথা ঘোষণা করেন। বুদ্ধ বলেন ; প্রাণিহত্যা করো না ; প্রাণঘাতের কারণ হইও না ; অপর কর্তৃক হননের অনুমোদন করো না। সবল ও দুর্বল নির্বিশেষে সর্ব প্রাণীর প্রতি হিংসা থেকে বিরত হবে।[৬৩] হিংসার মাধ্যমে কোনো রকমের অন্যায় কাজ করা মহাপাপ। এ ধারণা থেকেই বুদ্ধের অহিংসার উদ্ভব।

গৌতম বুদ্ধ এক মৌলিক চিন্তাধারা প্রচারের মাধ্যমে ভারতীয় চিন্তাধারার গতিপথ নির্দেশ করে।[৬৪] বুদ্ধের দৃষ্টি নিবদ্ধিত হয় মানুষের দিকে। মানুষের নানাবিধ সমস্যাকে (যেমন : রোগ-শোক, দুঃখ-দুর্দশা, জরা-ব্যাধি-মৃত্যুদুঃখ বর্ণবৈষম্য) তিনি অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করেন। মানুষ প্রতিনিয়ত দুঃখ ক্লেশে জর্জরিত। তিনি তা থেকে পরিত্রাণের উপায় অন্বেষণ করেন এবং মানবজাতিকে উপহার দেন নতুন দর্শন। তিনি চান শান্তি, শান্তি স্থায় শান্তি । তিনি বলেন সততা-ন্যায়-নিষ্ঠা-অহিংসা দিয়ে এই শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। বুদ্ধের জীবন ও কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে বৌদ্ধধর্ম মূর্তরূপ লাভ করে।[৬৫]

কেবল প্রাণিহত্যা করাকেই যে হিংসা করা হতো তা নয়, দণ্ড কিংবা অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে কোনো প্রাণীকে আঘাত করাকেও হিংসা মনে করা হয়। কাউকে কোনো ভেদবাক্য দ্বারা আঘাত করা ; কিংবা মনে মনে কাউকে দ্বেষ করা ; কারো অনিষ্ট চিন্তা করাও হিংসা। অন্যভাবে বললে বলা যায় যে, মন থেকে উচ্চারিত বাক্য দ্বারা কিংবা কায় কর্ম দ্বারা কোনো প্রাণীকে কোনো অবস্থাতেই কোনো প্রকার কিঞ্চিৎ মাত্র পীড়া দেওয়া হিংসা। বুদ্ধ বলেন ; 'যে কায় দ্বারা, বাণী দ্বারা কিংবা মন দ্বারা হিংসা করে না, যে পরকে বিহিংসা করে না সেই অহিংসক হয়। শরীর দ্বারা কাউকেও দুঃখ না দেওয়া.. ... ইহাই বুদ্ধগণের উপদেশ।[৬৬] বুদ্ধ অহিংসাকে প্রশংসা করেছেন এভাবে ; যে ব্যক্তি জঙ্গম ও স্থাবর উভয়বিধ প্রাণীদের প্রতি দণ্ড পরিত্যাগ করে, যে নিজে হনন করে না, অপরকে দিয়ে হনন করায় না, তাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।[৬৭] এ বিষয়ে আরো উক্ত রয়েছে ; 'নিজের সাথে তুলনা করে কাউকে হিংসা করা উচিত নয়'।[৬৮]

Dhaka University Institutional Repository

এক সময় কোশলরাজ প্রসেনজিৎ এবং তাঁর স্ত্রী মল্লিকাদেবীর মধ্যে আলোচনা হয় যে, নিজ হতে প্রিয়তর কিছু আছে কিনা। মল্লিকা দেবী তখন বলেন ; নিজ হতে প্রিয়তর কিছুই নেই। বুদ্ধ বিষয় সম্পর্কে বিদিত হয়ে উচ্চারণ করলেন এভাবে ;

সব্বা দিসা অনুপরিগম্ম চেতসা
নেবজ্ঝগা পিযতরমত্তনা ক্বচি।
এবং পিযো পুথু অত্তা পরেসং
তস্মা ন হিংসে পরমত্তকামো'তি।[৬৯]

অর্থাৎ, সকলে দিকে তাকিয়ে নিজের চেয়ে প্রিয়জন কাউকেও দেখা যায় না। অপরও তার নিজের কাছে খুবই প্রিয়। তাই অপরকে হিংসা করো না।

যথা অহং তথা এতে যথা এতে তথা অহং
অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেয়্য ন ঘাতয়ে।[৭০]

অর্থাৎ, যেমন আমি, তেমন ইহারা ; যেমন ইহারা, তেমনি আমি। এ প্রকারে নিজেকে উপমা করে কাউকে হনন করবে না, হনন করতে উৎসাহিত করবে না।

সব্বে তস্সতি দণ্ডস্স সব্বেসং জীবিতং পিযং
অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেয্য ন ঘাতযে।[৭১]

অর্থাৎ, সকলেই দণ্ডকে ভয় পায়। নিজ নিজ জীবন সকলের নিকট খুবই প্রিয়। সুতরাং নিজের সাথে তুলনা করে কাউকে হত্যা করবে না। কাউকে আঘাত করতে উৎসাহ কিংবা প্রেরণা যোগাবে না।

হিংসা দিয়ে কখনো হিংসাকে দূর করা যায় না। হিংসা মানুষকে অমানুষের দিকে নিয়ে যায়। অনিন্দনীয় ও অমানবিক কর্ম সম্পাদনে উৎসাহিত করে। এটা লক্ষ্যনীয় যে, কেউ যদি কাউকে আঘাত করে আর আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিও যদি আঘাত করে তবে সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। সুতরাং বাস্তবে দেখা যায় হিংসা দিয়ে কখনো হিংসাকে দমন করা যায় না। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধ বলেন ;

নহি বেরেন বেরনি সম্মন্তী'ধ কুদাচনং
অবেরেন চ সম্মন্তী এস ধম্মো সনন্তনো।[৭২]

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ, পৃথিবীতে শত্রুতার দ্বারা কখনো শত্রুতার উপশম হয় না কখনো। মিত্রতার দ্বারা শত্রুতার উপশম হয়। এটাই সনাতন নীতি।

হিংসার পরিণতি ভয়াবহ। পরিশুদ্ধ, সুন্দর ও শৃঙ্খলাময়, আদর্শিক জীবনের জন্য হিংসাকে পরিত্যাগ করার কথা বলেছেন বুদ্ধ। অহিংসা নীতির মাধ্যমে পাশবিক চেতনাকে দমন করার কথা বলেছেন। বুদ্ধের অহিংসা নীতির আবেদন সর্বজনীন। এ ধরনের নীতি মানুষকে যুগে যুগে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। তিনি অহিংসার মহাবাণী প্রচার করে মানবসমাজকে দিয়েছেন সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মনুষ্যত্ব বিকাশের অনন্য সাধারণ উপকরণ।

মানবিক রাষ্ট্রগঠনে বুদ্ধের দিকনির্দেশনা

পরিবার প্রথা, বর্ণব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার যাতে বজায় থাকে সেজন্যই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। সমাজের জন্য, সামাজিক নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার বিধানের জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল।[৭৩] রাষ্ট্রে বহুবিধ সমস্যা বিরাজমান। বুদ্ধ ক্ষমা, সাম্য, মৈত্রীময় রাষ্ট্রনীতিকেই আদর্শময় নীতি বলে মনে করেন। বুদ্ধ কর্তৃক প্রদর্শিত মানবতাবাদী দর্শনের অন্যতম তাৎপর্য হলো এর মাধ্যমে সুখী, সমৃদ্ধিশালী ও আদর্শময় কল্যাণকর রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব। মানবতার বিকাশে বুদ্ধ পঞ্চশীল বা পঞ্চনীতির কথা বলেছিলেন যা শৃঙ্খলাবদ্ধ, সুন্দর, সুখময় জীবনগঠনের পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচিত। এগুলো হলো :

ক. প্রাণিহত্যা থেকে বিরত থাকা ;

খ. অদত্তবস্তু গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা ;

অর্থাৎ অপরের দ্রব্য চুরি করা থেকে বিরত থাকা ;

গ. ব্যভিচার থেকে বিরত থাকা ;

অর্থাৎ মিথ্যা কামাচার (অবৈধ যৌন সর্ম্পক) হতে বিরত থাকা :

ঘ. মিথ্যাকথা বলা থেকে বিরত থাকা এবং

ঙ. মাদকজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকা।

পঞ্চশীল হলো সমগ্র মানবজাতির নৈতিকজীবন গঠনে অত্যন্ত উপাদেয় একধরনের নীতি। উপরি-উক্ত পাঁচটি নীতির উৎকর্ষ সাধন করতে পারলে যে কোনো মানুষ সচ্চরিত্রের অধিকারী হয় এবং সুন্দর জীবনগঠনে সক্ষম হয়। এটি হলো আদর্শ জীবনশৈলী, সর্বজনীন কল্যাণপ্রদ আচার সংহিতা[৭৪]। অধ্যাপক দুর্গাদাস ভট্টাচার্য বলেন ; বুদ্ধের পঞ্চনীতি সহস্রাব্দের সংঘাতমুক্ত ও দারিদ্রমুক্ত নতুন মানবসভ্যতা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে সহায়ক হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

এগুলো শুধু বৌদ্ধদের জন্য পালনীয় বিষয় নয়, সমগ্র বিশ্বাবাসীদের জন্য তাঁর দেওয়া পঞ্চনীতি আদর্শমানব সমাজগড়ার অন্যতম হাতিয়ার। যতদ্রুত এর প্রচার-প্রসার সম্ভব হবে, ততদ্রুত মানুষে মানুষে, রাষ্ট্র ও সমাজে-সমাজে ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য সৃষ্টির ক্ষেত্র সহায়ক হবে[৭৫]।

পঞ্চনীতি বা পঞ্চশীল পরিপালনের মাধ্যমে মানুষের চিত্ত ক্রমান্বয়ে পরিশুদ্ধ হয়। কারণ হিসেবে পরিলক্ষিত হয় যে, এ সময় তার অন্যের সম্পত্তিতে লোভ, অপরের প্রতি দ্বেষ-হিংসা-ক্রোধ ক্রমশ দূরীভূত হয়। সকলের মঙ্গল ও কল্যাণ কামনায় সর্বদা তার চিত্ত তৎপর হয়। ধীরে ধীরে মিথ্যা প্রলোভন ও মিথ্যা বিশ্বাস তিরোহিত হয়। সম্যকদৃষ্টি বা সৎদৃষ্টির উদয় হয়। এ সময় মনের অজ্ঞানতা দূর হয়। মনের অজ্ঞানতা দূর না হলে মানবকল্যাণ অসম্ভব। এই নীতিসমূহ কল্যাণকর রাষ্ট্রগঠন করে মানবতাবাদকে আরো সুসংহত করে। পারস্পরিক ঐক্য-সংহতি, ভ্রাতৃত্ববোধ জাগরণেও এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রত্যেক ব্যক্তি মাত্রই সৎচরিত্র গঠনের মাধ্যমে সুশীলসমাজ তথা মানুষের জন্য উন্নত কল্যাণকর রাষ্ট্রগঠন করতে সক্ষম যার প্রধান লক্ষ্য থাকবে মানবতার বিকাশ কিংবা মানব উন্নয়ন।

নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত পৃথিবী। জাতিতে-জাতিতে, গোত্রে-গোত্রে, ধর্মে-ধর্মে দ্বন্দ্ব। একই ধর্মভূক্ত গোষ্ঠীর মধ্যে হানাহানি, মারামারি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ভিন্ন জাতিগোষ্ঠী নিধন, মানবাধিকার লঙ্ঘন, পরিবেশ দূষণসহ বহুবিধ সমস্যা প্রত্যক্ষ করা যায় । চতুর্দিকে যুদ্ধ আর যুদ্ধ যুদ্ধ রব বা আওয়াজ। বুদ্ধ বলেন ;

জয়ং বেরং পসবতি দুক্খং সেতি পরাজিতো
উপসন্তো সুখং সেতি হিত্বা জয় পরাজয়ং।[৭৬]

অর্থাৎ, যুদ্ধ জয় শত্রুতার সৃষ্টি করে। পরাজিত ব্যক্তি দুঃখে অবস্থান করে। কিন্তু যিনি রাগ-দ্বেষাদি উপশম করেছেন, তিনি জয়-পরাজয় পরিহারপূর্বক শান্তিতে অবস্থান করেন।

বৈরতার পথ কখনো সুখের পথ হয় না। শান্তির পথ হয় না। বুদ্ধ ন্যায়বিচার ও মানুষের মধ্যে নৈতিকতাবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য নানাভাবে নিজের বক্তব্য সুপ্রতিষ্ঠা করেছেন। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধ বলেন ; নিরপেক্ষ, নিরপরাধ ও পুণ্যপথে থেকে জগতে বহু কর্মই আছে যা সকলের সম্পাদন করা উচিত। পাপপথ বর্জন করে পুণ্যপথকে অনুসরণ করা কর্তব্য। নিজের কৃতকর্মের জন্য নিজেই দায়ী।[৭৭] মানবিক সাধনার এক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বুদ্ধজীবন। বুদ্ধের চিন্তা-চেতনা ও ধর্ম-কর্মের মধ্যে মানবকল্যাণ ও মানবমুক্তির কথা প্রকৃষ্টরূপে বিধৃত।

Dhaka University Institutional Repository

গণতান্ত্রিক মনোভাব ও সামাজিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা

সাধারণত গণতন্ত্র এবং সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বুদ্ধের শাসনে রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, নিম্নবর্গ-উচ্চবর্ণ, সবাই সমান। সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য তাঁর আবির্ভাব।

বুদ্ধ জাতিভেদ প্রথাকে প্রত্যাখান করে সকলের সমানাধিকারের কথা বলেছিলেন। সুতরাং সঙ্গত কারণে বুদ্ধ প্রদর্শিত নতুন ধর্মীয় মতবাদ সকলের নিকট আকর্ষণীয় হয়ে উঠে। তিনি একসময় ভিক্ষুসঙ্ঘকে উপলক্ষ্য করে বলেন ;

> 'গঙ্গা যমুনা অচিরবতী সরভূ মহী, তা মহাসমুদ্দং পত্বা জহন্তি পুরিমানি নামগোত্তানি ; 'মহাসমুদ্দোত্বেব সঙ্ঘং গচ্ছন্তি। যা কচি মহানদিযো সেয্যথিদং- গঙ্গা যমুনা অচিরবতী সরভূ মহী তা মহাসমুদ্দং পত্বা জহন্তি পুরিমানি নামগোত্তানি, মহাসমুদ্দোত্বেব সঙ্ঘং গচ্ছন্তি'।[৭৮]

অর্থাৎ, 'হে ভিক্ষুগণ! গঙ্গা, যমুনা, অচিরাবতী, সরভূ, মহী, আদি মহানদী মহাসমুদ্রে এসে নিজেদের পূর্বের নাম গোত্র পরিত্যাগ করে মহাসমুদ্রে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, এবং শূদ্র এ চারি গোত্রীয় লোক বুদ্ধের শাসনে এসে পূর্বের নাম, গোত্র এবং বংশ ত্যাগ করে শাক্যপুত্র নামে পরিচিতি লাভ করে।

এখানে ধর্ম পরিপালনের ক্ষেত্রে তিনি জাতি-গোত্র মানেননি। শোনেননি কারো বাক্য। তদানীন্তন সময়ে এটা ছিল একধরনের সামাজিক অভিনব বিপ্লব। সামাজিক ভেদাভেদ ও বর্ণ-বৈষম্য নিরসনে তিনিই ইতিহাসে প্রথম বিপ্লবী। বুদ্ধ যজ্ঞ কণ্টকিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে অস্বীকার করেন এবং নৈতিক অনুশাসনকে সর্বোচ্চ স্থান প্রদান করেন। তিনি জাতিভেদ, চতুরাশ্রম অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করেন। বুদ্ধ তাঁর ধর্মকে সমাজের নিম্নস্তর পর্যন্ত প্রসার করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেন ; আরদ্ধবীর্য নিত্যপরাক্রমশালী ব্যক্তি ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল আর পুষ্প নিক্ষেপক ঝাড়ুদার যে-ই ব্যক্তি হোক না কেন সে ব্যক্তিই পরম বিশুদ্ধিতা লাভ করতে পারে।[৭৯] তিনি ঘৃণাভরে বিরোধিতা করেছেন সকল প্রকার বর্ণবৈষম্যের। শুধু তাই নয়, তিনি নারীদের মর্যাদার কথা বলেছেন।

বুদ্ধ সঙ্ঘে সকলের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে মানবতার বিকাশ সাধনে অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সঙ্ঘে জাতিভেদ বা জাতির অভিমান না থাকার জন্য রাজপুত্রদের সাথে প্রব্রজ্যা নিতে গেলে সঙ্ঘে উপালিকেই বুদ্ধ প্রথমে প্রব্রজ্যা প্রদান করেন।[৮০] এখানে দেখা যায়, ক্ষত্রিয়দের অহঙ্কার ভঞ্জনের উদ্দেশ্যেই প্রথমে উপালিকে

Dhaka University Institutional Repository

ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা দেন। তাছাড়া সুনীতি-এর কথা ধরা যাক। সুনীতি ছিল অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের একজন সন্তান। প্রত্যহ রাস্তা ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করাই হলো তার কাজ। সে কখনো ধনী পরিবারের লোকজনের সান্নিধ্যে আসতে পারেনি। তিনি খুবই সহজ সরল স্বভাবের ছিলেন। তার হৃদয় ছিল পবিত্র-বিশুদ্ধ। এক সময় বুদ্ধের সাথে সুনীতি-এর সাক্ষাৎ লাভ হয়। বুদ্ধের নিকট ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করে খুব অল্পদিনের মধ্যে অর্হৎফল লাভ করেন।[৮১] তাছাড়া চণ্ডাল পুত্র নামে পরিচিত সোপাক ও বুদ্ধের সান্নিধ্যে এসে নবজীবন লাভ করেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি সাধনার মাধ্যমে চরমশিখরে আরোহণ করে অর্হত্বফল লাভ করেন।[৮২] বুদ্ধের নিকট সকলের সমানাধিকার ছিল। তিনি সবাইকে এক এবং অভিন্ন মনে করতেন। সমদৃষ্টিতে দেখতেন। এ প্রসঙ্গে জি সি দেব বলেন ; 'His objective was to ansure social equilibrium in the spiritual sphere for all who was neglected'.[৮৩]

এখানে তিনি আধ্যাত্মিক ও সামাজিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করার রূপকার বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর সান্নিধ্যে এসে সবাই জাত্যাভিমান থেকে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হন। এ প্রসঙ্গে উক্ত রয়েছে ; কাষ্ঠ থেকে একান্তই অগ্নি উৎপন্ন হয় নীচু কুলে কিংবা অচ্ছ্যুত কুলে জন্মজাত ব্যক্তির ধৃতিমান পাপনিবারি জ্ঞানসম্পন্ন মুনি হয়।[৮৪]

সূত্র পিটকের অন্তর্গত 'দীর্ঘ নিকায়' গ্রন্থের 'অম্বট্ঠ সূত্র'-এর মূল আলোচ্য বিষয় হলো জাতিভেদ। জাতিগর্বে গর্বিত অম্বট্ঠ বুদ্ধ যথোচিত সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে অস্বীকৃতি জানায়। বুদ্ধ তাকে প্রমাণ করে দিলেন যে, তার পূর্বপুরুষ শাক্যদের দাসীপুত্র ছিলেন। কিন্তু তিনি সাধনার মাধ্যমে মহাঋদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর হীনজাতি তাঁকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হওয়ার পথে বাধা দিতে পারেনি। এখানে বুদ্ধ বলেন ; যিনি বিদ্যাচরণ সম্পন্ন তিনি যে জাতিতেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন তিনি দেব মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধ প্রবর্তিত ভিক্ষু সঙ্ঘে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, নাপিত, ঝাড়ুদার, চণ্ডাল ও অঙ্গুলিমাল ছিল। আবার তেমনি ভিক্ষুণী সঙ্ঘে ছিলেন নর্তকী ও বারবণিতা, বৈশালীর আম্রপালি, উজ্জয়িনীর সভা নর্তকী পদুমবতী, রাজগৃহের শালবতী গণিকা ইত্যাদি। উভয় সঙ্ঘে প্রবেশকারীরা তাঁদের মানবীয় মর্যাদার অধিকারের স্বীকৃতি নিয়েই বুদ্ধের দীক্ষা নিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে I B Horner বলেন ; 'In the pre-Buddhist days the status of women in India was on the whole low and without honour. During the Buddhist period, there was a change. Women came to enjoy more equality and greater respect and authority than even hitherto accorded to them'.[৮৫]

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ ব্যবস্থাপনায় একধরনের বৈষম্য থাকে যা থাকলে সমাজ, সম্প্রদায় জাতি খুব বেশী সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারে না। এখানে বুদ্ধ সমাজের নিম্নস্তর থেকে শুরু করে সকলের সামাজিক মর্যাদাবোধ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

ব্রহ্মবিহার

'ব্রহ্মবিহার' একটি অর্থবোধক শব্দ। 'ব্রহ্ম' এবং 'বিহার'-এর সমন্বয়ে এটি গঠিত। এখানে 'ব্রহ্ম' অর্থ শ্রেষ্ঠ আর 'বিহার' অর্থ অবস্থান করা। সর্বসত্ত্বে সম্যক এবং সমভাবে প্রতিপন্ন বলে মৈত্রীময় কিংবা মৈত্রীযুক্ত চিত্তে বিহার বা ব্রহ্মবিহার। মৈত্রীসূত্রে এ বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে ; 'শয়নে, গমনে কিংবা দাঁড়ানো অবস্থায় যতক্ষণ জাগ্রত থাকবে ততক্ষণ ঐভাবে অধিষ্ঠিত থাকবে। এটাই ইহলোকে ব্রহ্মবিহার নামে জ্ঞাত'।[৮৬] অপরিমিতভাবে মানসকে মৈত্রীভাবে বিশ্বলোকে ভাবিত করে তোলাকে বলা হয় ব্রহ্মবিহার। এখানে মানবতার সর্বোত্তম প্রয়োগের কথা বলা হয়। এখানে মানবতার বিকাশের যে বিধান রয়েছে তাকে সর্বোৎত্তম পন্থা বলা হয়। ব্রহ্মবিহার নিজের, পরিবারের, সমাজের সর্বোপরি পুরোবিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় দৈনন্দিন জীবনে সুন্দর পরিবেশ গঠনে সহায়ক হয়। এটা উৎকৃষ্ট জীবনযাপনের চাবিকাঠি যার মাধ্যমে মানবতাবাদী চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণার বিকাশ লাভ হয়। এখানে চার প্রকার সাধনার কথা বলা হয়। চারটি ধাপ হলো : ক. মৈত্রী, খ. করুণা, গ. মুদিতা এবং ঘ. উপেক্ষা। এ সম্পর্কিত একটি আলোচনা নিচে উপস্থাপন করা হলো।

মৈত্রী

ব্রহ্মবিহারে প্রথম সাধনার নাম হলো 'মৈত্রী'। পালিতে যাকে 'মেত্তা' বলা হয়, (মেত্তা মিদ্ ধাতু নিস্পন্ন) তার সংস্কৃতরূপ মৈত্রী। মৈত্রীর প্রকৃত প্রতিশব্দ হলো শুভেচ্ছা, হিতাকাঙ্ক্ষা, সৌহার্দ্য, পরোপকারিতা, হিতচিন্তা, সৌজন্য ইত্যাদি গুণবাচক শব্দ। মৈত্রীর প্রত্যক্ষ বিপরীতশব্দ হলো অশুভ চিন্তা চেতনা এবং ক্রোধ। ইংরেজিতে মৈত্রীকে বলা হয় Lovingkindness। এ বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত K. Sri. Dhammananda এর উক্তিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে তিনি বলেন ; Metta-loving-kindness is the most effective method to maintain purify of mind of to purity the mentally polluted atmosphere.[৮৭] আবার এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ঝঁসবফযড় দ্ব্যার্থহীনভাবে বলেন ; Metta is not a superman's love-it is the very ordinary ability to just be kind not dwell in aversion towards something or someone.[৮৮]

নিঃস্বার্থ পরোপকারই হলো মৈত্রীর লক্ষণ।[৮৯] মিত্রতাই (দয়ালু মনোভাব) হলো মৈত্রীর স্বভাব[৯০]। রাজা অজাতশত্রু বুদ্ধের প্রাণনাশের জন্য ঘাতক নিযুক্ত করেছিলেন। বুদ্ধ অজাতশত্রুকে ক্ষমা প্রদর্শন করেছিলেন এবং মৈত্রীময় বাণী

Dhaka University Institutional Repository

দেশনা করে সদ্ধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন।[৯১] জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকলের মধ্যে সুপ্তাবস্থায় রয়েছে চিরসুন্দর মৈত্রী। মৈত্রী পরায়ণ হতে হলে সবাইকে শীল[৯২] বিশুদ্ধিতা সম্পন্ন হতে হবে। কেননা, শীল বিশুদ্ধি ছাড়া মৈত্রী অধিগত হওয়া যায় না। মানুষ সচরাচর পঞ্চবচনে[৯৩] বৃথালাপ ও সম্প্রালাপে মগ্ন থাকে প্রতিনিয়ত। এগুলো ত্যাগ করে অবৈরী ও অব্যাপন্ন চিত্তকে স্ফুরিত করে মৈত্রী সহগত চিত্তে অবস্থান করা দরকার। সর্ব প্রাণীর হিতার্থে সর্বকালের প্রজ্ঞাবান আলোকিত বুদ্ধ যে মৈত্রীর কথা বলেছিলেন, তা সবার জন্য প্রযোজ্য। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধের সর্বজনীন উপদেশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন ;

> 'May all beings be free from enmity, affication and anxiety, 'and live happily'. May all breathing things...all creatures.all people... all those who have a personality be free from enmity, afflication and anxiety, and live happily.'[৯৪]

মৈত্রী হলো পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র তথা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সম্প্রীতি-সদভাব সম্প্রসারণে এক অভিনব আলোকময় জাগরণ। মৈত্রীময় চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা-এর ফলে জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে ভালবাসার বাতাবরণে আবদ্ধ হওয়ার অত্যুজ্জ্বল সম্ভাবনা নিহিত। এর মাধ্যমে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর প্রতি প্রসন্ন চিত্তে দয়ালু মনোভাব উৎপন্ন হয়। বুদ্ধ বলেছেন ; সর্বত্র মৈত্রী, অপ্রমেয়, অবৈরী, অহিংসা চিত্ত দ্বারা বিচরণ করবে[৯৫] ।

যারা সুখ প্রত্যাশী তারা সমাজজীবনে সংযমের সাথে মৈত্রীর সুপ্রভাবে সকল প্রকার সংঘাত, সংঘর্ষ, সন্দেহ, দ্বেষ, ঘৃণাকে পরিত্যাগ করে সুন্দরজীবন গঠনে সবাইকে স্বাগত জানায়। এ ব্যাপারে বিশিষ্ট্য বৌদ্ধ পণ্ডিত k. Sri. Dhammananda -এর উক্তিটি প্রনিধানযোগ্য ;

> 'The way to develop love is through thinking out the evils of hate and the advantages of non-hate; through thinking out according to actuality, according to karma, that really there is none to hate, that hate is foolish way of feeling which breeds more and more darkness that obstructs right understanding. Hate restricts, love releases, Hatred strangles; love enfranchises. Hatred brings ramose, love brings peace. Hatred agitates, love quietens, stills, calms. Hatred divides; love

Dhaka University Institutional Repository

> unites, Hatred hardens; love softens, Hatred hinders; love helps. And thus through a correct study and appreciation of the effects of hatred and the benefits of love, should one develop one'.[৯৬]

মৈত্রীর অনুশীলন খুবই সহজ। তবে নিজেকে দিয়ে তা শুরু করতে হবে প্রথমেই। যারা মৈত্রীবান এবং মৈত্রীর অনুশীলন করে তারা এগার প্রকার[৯৭] আনিসংশ (ফল) লাভ করে থাকে। যেমন : ক. সুখে নিদ্রিত হয় ; খ. সুখে জাগ্রত হয় ; গ. কোনোরূপ দুঃস্বপ্ন দেখে না ; ঘ. মানুষের সুপ্রিয় হয় ; ঙ. অমনুষ্যদেরও প্রিয় হয় ; চ. দেবতারা (সব সময়) তাকে রক্ষা করেন ; ছ. শরীরে অগ্নি বিষ বা অস্ত্র দিয়ে আঘাত করতে পারে না ; জ. সহসা তার চিত্ত সমাধিস্থ হয় ; ঝ. তার মুখের চেহারা সতত সুপ্রসন্ন থাকে ; ঞ. সজ্ঞানে মৃত্যুবরণ করে ; এবং ট. মৃত্যুর পর অর্হৎ পদ লাভ করতে না পারলে ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন। যারা এই অনুশীলনকে জীবনের প্রধান ব্রত হিসেবে পালন করে, তারা সর্বক্ষেত্রে প্রশংসিত ও নন্দিত হয় শুধু তাই নয়, সকল পাপময়, হিংসাত্মক ও অশালীন, অকরণীয় কাজ সম্পাদন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে। সর্বোপরি হিতকামী ও অহিতকামী সবার জন্য সর্বপ্রকার পুণ্যরাশি আহরণ করে।

বলা যায়, সকল প্রকার সংকীর্ণতার উর্দ্ধে মৈত্রীর অবস্থান। তা অতিক্রম করতে না পারলে মৈত্রীর পরিপূর্ণরূপ কখনো লাভ করা যায় না। তাই তার সম্প্রসারণ দরকার মানব জাতি ও প্রাণীর সকল পর্যায়। এ সম্পর্কে উক্ত হয়েছে ;

> His thought of love for the entire world [He would maintain undoubtedly, above below and all around, Unchecked, no waliece with of for.[৯৮]

লোভ-দ্বেষ-মোহ, হিংসা জর্জরিত বহুধা বিচ্ছিন্ন মানবসংস্কৃতিতে চির অম্লান মৈত্রী। বুদ্ধ এটাকে আরো সুস্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে ; পৃথিবীতে যে সমুদয় দৃষ্ট বা অদৃষ্ট জীব আছে, যারা দূরে বা নিকটে বসবাস করে, যারা জন্ম গ্রহণ করেছে বা জন্ম গ্রহণ করবে, তারা সবই সুখী হোক। মা যেমন তার একমাত্র পুত্রকে নিজের প্রাণের বিনিময়ে রক্ষা করে, তেমনি পৃথিবীর সকল জীবের প্রতি অপ্রমেয় মৈত্রী পোষণ করবে।[৯৯] সুতরাং সমাজজীবনে মৈত্রীকে মনের প্রতিষেধক বলা যায়। এতে মনের অপপ্রবৃত্তিগুলো প্রশমিত হয় এবং চিত্তে বা মনে মৈত্রীভাব জাগ্রত হয় এবং তা স্থায়ী হয়। এক্ষেত্রে Narda Thera নিম্নলিখিত উক্তিটি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য ; '

Dhaka University Institutional Repository

> 'Metta should be practised first towards oneself. In doing so a person should charge his mind and body with positive thoughts of peace and happiness. He should think how he could be peaceful, happy free from suffering, worry and anger. He then becomes the embodiment of loving kindness. Shielded by loving-kindness, he cuts off all hostile vibration and negative thoughts. He returns good for evil, love for anger. He becomes ever tolerant and tries his best not to give occasion for anger to any. Himself beaming with happiness, he injects happiness into others, not only inwardly but also outwardly, by putting his metta into practice in the course of his daily life. When he is full of peace and is free from thought of hatred, it is easy for him to radiate loving kindness towards others. What he does not possess he cannot give to others. Before he tries to make others happy, he should first be happy himself. He should know the ways and means to make himself happy'.[১০০]

করুণা

ব্রহ্মবিহারে[১০১] করুণা চিত্ত বিমুক্তির অন্যতম অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত। যখন অন্যের দুঃখ দেখে মনে দুঃখ উৎপন্ন হয় এবং তা দূর করার অভিপ্রায় জাগে, তার নাম করুনা। করুণার প্রত্যক্ষ শত্রু হলো নীতিবিবর্জিত হিংসা এবং পরোক্ষ শত্রু হলো দুর্মনতা বা পরশ্রীকাতরতা। বলা বাহুল্য যে, দুঃখে জর্জরিত-পীড়িত জীবের প্রতি করুণা প্রসারিত হয়। করুণাবশত কোমল হৃদয় পর দুঃখে কম্পিত হয়, ব্যথিত হয়, অনুশোচিত হয় ; তাই এটার অন্য নাম অনুকম্পা। করুণার ভেদাভেদ এবং কালাকাল নেই। এ প্রসঙ্গে Narda Thera বলেন ;

> 'A mother has equal compassion towards all her children, still may have more compassion towards a sick child. Even so,

Dhaka University Institutional Repository

greater compassion should be excised towards the spiritually sick as their sicknesses runs their character'.[১০২]

এখানে পীড়িত পুত্রের প্রতি মাতার যেরূপ প্রেম, স্নেহ সেরূপ সমস্ত প্রাণীর প্রতি দয়া, কৃপা ও সহানুভূতিবশত চিরশ্বাশত ও অনুকম্পা প্রদর্শন করাই হলো করুণা। 'বোধিচর্যাবতার' নামক গ্রন্থেও তারই প্রতিফলিতরূপ দেখা যায় ; পিতার আর্ত পুত্রের প্রতি যে প্রেম জগতের সকল প্রাণীর প্রতি সেরূপ প্রেমই হলো করুণা।[১০৩]

সুতরাং এতে প্রতীয়মান হয় যে, সর্বজনের কল্যাণে নিয়োজিত এবং সকল প্রকার দুঃখ পরিত্যাগের নিমিত্তে সদাশয় উন্মুক্ত চেতনাই হলো করুণা। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধ রাহুলকে উপদেশার্থে বলেছিলেন ; হে রাহুল ! সর্বজীবে করুণা পোষণ করো। এতে তোমার যে বিহিংসা (বিদ্বেষ বুদ্ধি) আছে, তা প্রহীন হয়ে যাবে।[১০৪] নিষ্ঠুরতা প্রত্যাখান বা প্রত্যাহার হলো করুণার স্বভাব।[১০৫] দুঃখ বিমোচন বা অপসরাণ করার ইচ্ছাই করুণার মূল লক্ষণ।[১০৬] জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে অস্পৃশ্য-অপাঙ্ক্তেয়, দীন-দরিদ্র, সুখী-অসুখী, ধনী-গরীব, রাজা-বাদশা সবার প্রতি করুণা প্রদর্শন করা উচিত। শুধুমাত্র উচিত নয়, নৈতিক দায়িত্ব এবং কর্তব্যও বটে। চিরদিন কারো সমান যায় না। তাই বলা হয়েছে যে, যিনি স্বাস্থ্য সম্পন্ন, সৌভাগ্যবান ও সুখী, তার জীবনেও আসতে পারে শোক, সন্তাপ, ব্যাধি, বেদনা, আরো নানারকম দুঃখ এবং বিপদ। তার সে বিপর্যয়ের করুণায় বিগলিত হওয়া উচিত[১০৭]। নিম্নলিখিত মন্তব্যটি গভীরভাবে স্মরণযোগ্য।

'... on seeing a wretched man, unlucky, unfortunate, in every way a fit object for compassion, unsightly, reduced to utter misery, with hands and feet cut off, siting in the shelter for the helpless with a pot placed before him, with a mass of maggots oozing from his arms and legs, and moaning compassion should be felt for him in this way. This being has indeed been reduced to misery; if only he could be freed from this suffering'.[১০৮]

দৈনন্দিন জীবনযাপনে প্রিয়-অপ্রিয়, শত্রু-বন্ধুকে উপলক্ষ্য না করে খোঁড়া, দরিদ্র, অন্ধ এবং হস্ত-পদ ছিন্ন ব্যক্তিকে দেখে করুণার বহ্নিঃপ্রকাশ করা যায়, যার অন্তরালে করুণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে । আচার্য শান্তিদেব বলেন ; 'দুঃখের অন্ত নেই। অনন্ত অসীম জাগতিক দুঃখের বিষয়ে চিন্তা করলে করুণাজনিত দুঃখ বহু রকম'।[১০৯] তাই দুঃখের কথা উপলব্ধি করে সকলের প্রতি করুণা প্রদর্শন করা অপরিহার্য।

Dhaka University Institutional Repository

করুণার উৎপত্তি মূলত অনুকম্পাবোধ থেকেই, যা আগেই বলেছি। করুণার চর্চায় স্বার্থপরতা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয়। চর্যাপদের কবি বলেন ; রূপ স্বরূপের নৌকায় (দেহতরী) করুণার উপলব্ধি করা আবশ্যক।[১১০] মানসিক সুখ প্রত্যাশায় যারা করুণাভাব প্রদর্শন করে, তারা অভিন্ন প্রকৃতির, তাদের চিন্তা চেতনা উন্নত এবং একই সুদূর প্রসারী। তৃণমূল পর্যায়ের সবাইকে তারা সৎ সুন্দর জীবনগঠনে সাহায্য করে। চিত্তে অস্থিরতা, বিক্ষিপ্ততা বিরাজ করলে কখনো করুণাবোধ জাগ্রত হয় না। করুণা একদিকে যেমন স্বার্থত্যাগকে বোঝায় অন্যদিকে তা নিজের ধৈর্যকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে। করুণাই পারে সকল প্রকার অন্ধকারাচ্ছন্ন-তমাচ্ছন্ন প্রাচীরকে ভাঙ্গতে এবং সুন্দর সৌহার্দপূর্ণ পরিবার সমাজ গঠনে সাহায্য করে বিপন্ন নাগরিকদেরকে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে ;

> 'Compassion is characterized as promoting the aspect, of allaying shuttering. Its function resides, is not bearing others suffering. It is manifested as non cruelty. Its proximate cause is to see helplessness in those overwhelmed by suffering. It succeeds when it makes cruelty subside and it fails when it produces sorrow'.[১১১]

মুদিতা

মুদিতা √মুদ ধাতু নিস্পন্ন যার অর্থ-তুষ্ট হওয়া, আনন্দ প্রকাশ করা। মুদিতার শিক্ষণীয় বিষয় সবাই যেন সুখে শান্তিতে বসবাস করে ; কেউ যেন অসুখী না হয়। পরের সুখ সৌভাগ্যের অনুমোদনই মুদিতার লক্ষণ[১১২]। মুদিতা শুধু সহানুভূতি নয়, এটাকে প্রশংসাসূচক আনন্দ বলা হয়। এর দ্বারা শত্রুর প্রতি ঈর্ষা ধ্বংস হয় ও মুদিতা ব্যক্তি বিশেষ থেকে শুরু করে সমগ্র প্রাণী জগতের কল্যাণ কামনায় নিয়োজিত থাকে[১১৩]। যারা মুদিতায় বিশ্বাসী তারা কখনো কারো উন্নতিতে কোনো রকম বাঁধা হতে পারে না।[১১৪] মুদিতা সকলের কল্যাণ কামনায় নিয়োজিত। এখানে কোনো আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ধনী-দরিদ্র, শত্রু-মিত্র ভেদাভেদ নেই। মুদিতার ফলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে, ঐক্যের বন্ধন রচিত হয় এবং সূচিত হয় পরস্পর সমৃদ্ধময় জীবনযাপন প্রণালী। মুদিতায় পরের সুখে সুখ ও দুঃখে দুঃখ অনুরণিত হয়।

উপেক্ষা

উপ+ইক্‌খা এর সমন্বয়ে 'উপেক্ষা'। 'উপ' বলতে নিরপেক্ষ ভাব আর 'ইক্‌খা' বলতে দেখা, দৃষ্টিপাত এবং তাকানোকে বোঝায়। সুতরাং উপেক্ষা বলতে আমরা লোভ দ্বেষ-মোহ বিবর্জিত নিরপেক্ষ প্রত্যক্ষ সত্যের

Dhaka University Institutional Repository

অনুভূতিকে বুঝি। উপেক্ষার একার্থবোধক শব্দগুলো হলো মধ্যস্থভাব, সাম্য এবং সমচিত্ততা প্রভৃতি। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা তিন অবস্থান অতিক্রম করে যখন মানুষ দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা এবং সুখে বিগত স্পৃহ হন এবং সদাশান্ত ভাবে অবস্থান করে, তখন সেই অবস্থাকে বলা হয় উপেক্ষা[১১৫]। প্রিয়ও নয়, অপ্রিয়ও নয় এমন একজন ব্যক্তিকে দেখে মনে আনন্দ কিংবা বেদনা কোনোটিরই সঞ্চার হয় না। নিরপেক্ষ ভাব (নিরপেক্ষতা) ইহার মূখ্য লক্ষণ।[১১৬]
উপেক্ষার স্বরূপ সম্পর্কে দেখা যায় ; 'লাভ-অলাভ, যশ-অযশ, নিন্দা-প্রশংসা, সুখ-দুঃখ এই আট প্রকার লোকধর্মে অবিচলিত থাকা, শোকহীনতা, লোভ-দ্বেষ-মোহরূপ কলুষহীন হয়ে অবস্থান করা ও নিরাপদে থাকাই উত্তম মঙ্গল'।[১১৭]

এখানে উপেক্ষা বলতে কোনোরূপে পক্ষপাতিত্ব করা, অবজ্ঞা করা এবং এড়িয়ে যাওয়াকে বোঝায় না। উপেক্ষা উঁচু-নিচু, ধনী-দরিদ্র, প্রিয়-অপ্রিয়, ব্রাহ্মণ-বৈশ্য-ক্ষত্রিয়-শূদ্র, উত্তম-মধ্যম, আমেরিকান-ইউরোপীয়ান, ইসরাইলী-ফিলিস্তিনী, এশিয়ান-আফ্রিকান এরূপ সকল প্রকার বিশুদ্ধ যুগলে বিরাজমান। আমরা জানি মানবসমাজ ত্রি-অকুশলের (লোভ-দ্বেষ-মোহ) তাড়নায় বিভিন্ন গর্হিত কিংবা অকুশলকাজ করে থাকে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন রকম বৈষম্য ও ভেদাভেদ, অসৎ ও অন্যায়ের পক্ষাবলম্বন করে। উপেক্ষায় নৈপুণ্য লাভের পর একে অপরের প্রতি সমদৃষ্টি বা সমচিত্ততা উৎপন্ন হয়, সকল প্রকার আত্মপর ভেদ সংকীর্ণ হয়ে একেবারে চিরদিনের জন্য যেখানে শেষ, সেখানেই উপেক্ষা জ্ঞান শুরু হয়। সুতরাং উপেক্ষায় নিজেকে আত্মসমর্পণ করার আগে মৈত্রী, করুণা, মুদিতায় নিজেকে অবশ্যই আত্মনিয়োগ করতে হবে।

আদর্শিক উন্নত, সমৃদ্ধশালী ও শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনগঠনে ব্রহ্মবিহার পরিপালন করা প্রয়োজন। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সমাজজীবনকে নৈতিকতায় উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করতে চাইলে ব্রহ্মবিহার অনুশীলনের প্রয়োজন রয়েছে। এটি মানুষকে মহান করে তোলে। বুদ্ধ এক সময় তাঁর মহতী ভিক্ষুসঙ্ঘকে ; এ বিষয়ে বলেন ; 'মৈত্রীযুক্ত চিত্তে এক দিককে পূর্ণ করতো বিহার করো। তথা দ্বিতীয় দিককে, তথা তৃতীয় দিককে, তথা চতুর্থ দিককে পূর্ণ করতে বিহার করো। এ প্রকার উপরে, নীচে, আশে-পাশে সম্পূর্ণ মনে সকলের জন্য মৈত্রীযুক্ত বিপুল, মহান ও অপ্রমাণ বৈরীরহিত চিত্ত সমস্ত লোককে স্পর্শ করতো বিহার করো। করুণা, মুদিতা এবং উপেক্ষা সম্বন্ধেও তিনি পর পর ঠিক একই প্রকার কথা বলেছেন'।[১১৮] বুদ্ধ এখানে বলেছেন ; যথাসময়ে মৈত্রী, উপেক্ষা করুণা, বিমুক্তি ও মুদিতার অনুশীলনে অভিরত হয়ে সর্বলোকে অপ্রতিহত হয়ে একাকী খড়্গবিসানের ন্যায় বিচরণ করো।[১১৯] মানুষ লোভ-দ্বেষ-মোহে আসক্ত এগুলো মানুষের ইন্দ্রিয়গুলোকে তাড়িত করে। এর মাধ্যমে কখনো সমাজে শান্তি হতে

Dhaka University Institutional Repository

পারে না কখনো। একমাত্র ব্রহ্মবিহার অনুশীলনের মাধ্যমে পরিবার, সমাজ সর্বোপরি রাষ্ট্রকে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের অটুট বন্ধনে আবদ্ধ করা যায়

বুদ্ধের জীবন ও দর্শনের মূল তথ্য হলো মানবতাবাদ যেখানে সর্বজনীন প্রেমের মাধ্যমে ও অহিংসাকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাঁর ঐকান্তিক সাধনা ছিল মানবকল্যাণ ও মানুষের মুক্তি। তাঁর এ ধরনের ধারণা নৈতিক জীবনকে উন্নত করে। তাইতো তিনি মানুষকে দুঃখমুক্তির পথের সন্ধান দিতে ও অকল্যাণের পথ থেকে কল্যাণের পথে নিয়ে আসতে অবিরাম চেষ্টা করেছেন এবং তিনি সফলতাও লাভ করেছেন। কল্যাণের পথটি নৈতিক জীবনাচরণের মধ্যেই নিহিত। মানুষ হিসেবে মানবিক মূল্যবোধকে শানিত করতে না পারলে প্রকৃতপক্ষে মানুষ হওয়া যায় না। বুদ্ধের মানবতাবাদের ধারণার স্বরূপ চিরশাশ্বত এবং চির কল্যাণকর। বলা যায়, আদর্শিক, মাঙ্গলিক এবং কল্যাণময় সমাজ কিংবা রাষ্ট্র গঠনে মানবতাবাদী দর্শন চর্চায় এর কোনো বিকল্প নেই।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা ও তথ্য নির্দেশিকা

১. William Allan Nelson, Webster's New International Dictionary of English Language (London:1959), P. 342

২. The Illustrated Oxford Dictionary (London: 201), P. 334

৩. W.T Cunningham,, The nelson Contemporary English Dictionary (Hong Kong : 1984), P. 255

৪. আব্দুল কাদির সম্পাদিত, নজরুল রচনাবলী, বাংলা একাডেমী (ঢাকা : ১৯৯৫) পৃ. ১০

৫. ড. আদুল ওয়াহাব, ফোকলোর-মানবতাবাদ ও বঙ্গবন্ধু (ঢাকা : ২০১০), পৃ. ২৭৪

৬. মো ঃ আবদুল হাই তালুকদার, উনিশ শতকের বাংলায় মানবতাবাদী চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ড, শরীফ হারুন সম্পাদিত, বাংলাদেশ দর্শনঃ ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান, তৃতীয় খণ্ড (ঢাকা : ১৯৯৯), পৃ. ১৮৩

৭. B. Russell, Authority and the Individual (Individual and social ethics), (1949), P. 24

৮. Narada Thera, The Buddha and his Teachings (Colombo: 1973) P. 1

৯. Dr. Buddhadasa p. Krirthisnghe (ed) Buddhist Concept Old and new (Delhi : 1983), P. 173

১০. বাঙালির দর্শন : মানুষ ও সমাজ, মোঃ মতিউর রহমান (ঢাকা : ২০০০), পৃ. ৪১

১১. সোলয়মান আলী সরকার, ভারতের দর্শন পরিচিতি (ঢাকা : ২০০৪), পৃ. ৮২

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

১৩. ড. এম মতিউর রহমান সম্পাদিত, ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি (ঢাকা : ২০০৮), পৃ. ৮৬

১৪. G. C Dev, Buddha the Humanist, Dhaka. (Karachi Lahore Dhaka : 1969), P. 21

১৫. গিরিশ চন্দ্র বড়ুয়া অনূদিত, ধম্মপদ (ঢাকা : ১৯৭৭), পৃ. ৪৮

১৬. ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র (কলিকাতা : ১৯৫১), পৃ. ৬৭ ; বেণীমাধব বড়ুয়া অনূদিত মধ্যম নিকায়, প্রথম খণ্ড (কলিকাতা : ১৯৪০), পৃ. ৪

১৭. রূপ স্কন্ধ -চক্ষু ও কর্ণ, বিজ্ঞান স্কন্ধ- দর্শন, বেদনা স্কন্ধ- সম্প্রযুক্ত বেদনা, সংজ্ঞা স্কন্ধ-সংজ্ঞা এবং সংস্কার স্কন্ধ স্পর্শ

১৮. বেণীমাধব বড়ুয়া অনূদিত, মধ্যম নিকায়, প্রথম খণ্ড (কলিকাতা : ১৯৪০), পৃ. ৪৮

১৯. শ্রী জ্যোতিপাল ভিক্ষু অনূদিত, বোধিসুত্তং, উদানং (খাগড়াছড়ি : ২০১৩), পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

২০. বীরেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দি সংকলিত, প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি বা কার্যকারণ নীতি (চট্টগ্রাম : ১৯৩৯), পৃ. ১

২১. শ্রী জ্যোতিপাল ভিক্ষু অনূদিত, উদানং, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

২২. Nalinaksha Dutta and Krishna Datta Bajpai, Devlopment of Buddhism in Uttrapradesh (Uttrapradesh: 1956), P. 180

২৩. বেণীমাধব বড়ুয়া অনূদিত, মধ্যম নিকায়, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

২৪. ধম্মপদ/ তৃষ্ণাবর্গ-৩৩৮

২৫. জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, বৌদ্ধদর্শনের রূপরেখা (ঢাকা : ২০০১), পৃ. ৫৫

২৬. ধম্মপদ/ধর্মস্থবর্গ-২৭০

· 499040

২৭. ধম্মপদ/মার্গবর্গ-২৭৬

২৮. পঞ্চবর্গীয় শিষ্য হলো : কৌণ্ডিন্য, বপ্প, অশ্বজিৎ, মহানাম এবং ভদ্দিয

২৯. স্থবির অনূদিত, থেরগাথা (তাইওয়ান : ১৯৯৬), পৃ. ৫০

৩০. ড. বিনেয়ন্দ্রনাথ চৌধুরী অনূদিত, মধ্যম নিকায়, তৃতীয় খণ্ড (কলিকাতা : ১৯৯৩), পৃ. ৮২

৩১. S. C Chatterjee and D. M Datta, An Introduction to Indian Philosophy (Calcutta :1984), P127

৩২. রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ এবং স্পর্শাদি সহগত কামতৃষ্ণা, ভোগ লিপ্সা পরিভোগের অভিপ্রায় বর্জন করে বিরাগতা বা নৈষ্ক্রম্য প্রাপ্তির দৃঢ় সংকল্পকে বলা হয় নৈষ্কম্য

৩৩. অব্যাপাদ মানে অপ্রমেয় মৈত্রী চিত্ত উৎপাদন করা। অর্থাৎ সর্বতোভাবে অহিতকর অকুশল বর্জন করতো সর্বজীবের প্রতি মৈত্রী, করুণা ভাব জাগ্রত করার নামই হলো অব্যাপাদ সংকল্প।

৩৪. অবিহিংসা বলতে সর্ব প্রকার লোভ-দ্বেষ-মোহ সংযত করে মানবতা, দয়া, মৈত্রী, করুণা এবং ভালবাসা প্রদর্শন করাকে বলা হয় অবিহিংসা।

৩৫. ভিক্ষু শীলভদ অনূদিত, দীর্ঘ নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড (কলিকাতা : ১৯৫৪), পৃ. পৃ. ২৭৫

৩৬. ড. বিনেয়ন্দ্রনাথ চৌধুরী অনূদিত মধ্যম নিকায়, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২, দীর্ঘ নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫

৩৭. An Introduction to Indian Philosophy, ibid, P. 127

৩৮. ভিক্ষু শীলভদ অনূদিত, দীর্ঘ নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. পৃ. ২৭৫

৩৯. এ প্রসঙ্গে 'সূত্র নিপাত' নামক গ্রন্থের 'বসল সূত্রে' দেখা যায় ;

Dhaka University Institutional Repository

ন জচ্চা বসলো হোতি ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো

কম্মুনা বসলো হোতি কম্মুনা হোতি ব্রাহ্মণো। সুত্ত নিপাত (বান্দরবান : ২০০৭) পৃ. ৩৪

অর্থাৎ , জন্মের দ্বারা কেউ বৃষল বা নিচু জাতি হয় না, জন্মে দ্বারা কেউ ব্রাহ্মণও হন না। কর্মের দ্বারাই কেউ বৃষল বা নীচু জাতি হয়, ব্রাহ্মণও হন কর্মের দ্বারা।

৪০ ভিক্ষু শীলভদ অনূদিত, দীর্ঘ নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫ ; ড. বিনয়েন্দ্র নাথা চৌধুরী অনূদিত, মধ্যম নিকায়, তৃতীয় খণ্ড (কলিকাতা : ১৯৯৩), পৃ. ১৯১,

৪১. T. W Rhys Davids and Williums Stede, Pali English Dictionary (New Delhi 2003), P. 95

৪২. Thahissaro Bhikkhu, The Wing to Awakening (USA : 1996), P. 177

৪৩. ধর্মাধার মহাস্থবির, বৌদ্ধদর্শন (কলিকাতা : ১৪০১ বাংলা), পৃ. ২২

৪৪. ড. বিনয়েন্দ্র নাথা চৌধুরী অনূদিত, মধ্যম নিকায়, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.৮২

৪৫. বুদ্ধবাণীর মূলতত্ত্ব, ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া ও ড. বেলু রানী বড়ুয়া (ঢাকা : ২০১০), পৃ. ১২২

৪৬. ধম্মপদ/জরাবর্গ-১৫৪,

৪৭. শ্রীবিধু শেখর শাস্ত্রী অনূদিত, মিলিন্দ পঞ্হো (বোলপুর-শান্তিনিকেতন : ১৩১৫ বাংলা), পৃ. ৭০

৪৮. ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, দীর্ঘ নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫

৪৯. সুভূতি রঞ্জন বড়ুয়া অনূদিত, অভিধর্মার্থ সংগ্রহ (কলিকাতা : ১৯৯১), পৃ. ৯২

৫০. শান্তরক্ষিত মহাস্থবির, পালি-বাংলা অভিধান, দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা : ২০০৮) পৃ. ১৫৯৪

৫১. শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত, মিলিন্দ প্রশ্ন (কলিকাতা : ১৯৭৪), পৃ. ৩৮

৫২. ড. বিনয়েন্দ্র নাথা চৌধুরী অনূদিত, মধ্যম নিকায়, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.৮২

৫৩. An Introduction to Indian Philosophy, ibid, P. 127

৫৪. শ্রীবিধু শেখর শাস্ত্রী, মিলিন্দ পঞ্হো, প্রাগুক্ত, পৃ, ৭৪

৫৫. ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, দীর্ঘ নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

৫৬. ভিক্ষু শীলভদ্র, দীর্ঘ নিকায়, তৃতীয় খণ্ড (রাঙ্গামটি : ২০০৭), পৃ. ১৮৬

৫৭. ড. জিনবোধি ভিক্ষু, তথাগত বুদ্ধের বোধি-বিধি (চট্টগ্রাম : ২০০৩), পৃ. ৭৪

৫৮. সংযুক্ত নিকায় পঞ্চম খন্ড ধম্মচক্ক পবত্তনবগ্গ, দীঘনিকায়, ১ম খণ্ড মহালিসুত্ত (৬)মহাসতিপট্ঠান সুত্ত, (১২)

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যম নিকায় প্রথম খণ্ড, সম্মাদদিট্ঠ সুত্ত, ((৯) চূলবেদল্ল সুত্ত (৪৪)

৫৯. বেণীমাধব বড়ুয়া অনূদিত, মধ্যম নিকায়, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, ক্ষুদ্রবেদল্য সূত্র, সংখ্যা-৪৪

৬০. বিমলাচরণ লাহা অনূদিত, সৌন্দরানন্দ কাব্য (কলকাতা : ২০০৩), পৃ. ১১৪-১১৫

৬১. গোপাল হালদার, সংস্কৃতির রূপান্তর (ঢাকা : ১৯৮৭), পৃ. ১৫২

৬২. বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বংলা অভিধান (ঢাকা : ২০১৩), পৃ. ৭৭

৬৩. সাধনানন্দ মহাস্থবির, সুত্ত নিপাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

৬৪. সোলয়মান আলী সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

৬৫. সোলয়মান আলী সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

৬৬. জোতিপাল ভিক্ষু, উদানং, প্রাগুক্ত, ৪/৬

৬৭. সাধনানন্দ মহাস্থবির, সুত্ত নিপাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩, রণব্রত সেন সম্পাদিত, ধম্মপদ, (কলকাতা : ১৯৮৮), পৃ. ২১৭

৬৮. সুত্ত নিপাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

৬৯. শীলানন্দ ব্রহ্মচারী অনূদিত, সংযুক্ত নিকায়, প্রথম খন্ড, (কলিকাতা : ১৪০০ বাংলা), পৃ. ২৭ ; শ্রী জোতিপাল ভিক্ষু সম্পাদিত, উদানং, (খাগড়াছড়ি : ২০১৩), পৃ. ১২৩

৭০. সাধনানন্দ মহাস্থবির, সুত্ত নিপাত, পৃ. ১৯৬

৭১. ধম্মপদ/দণ্ডবর্গ-১২৯-১৩০

৭২. ধম্মপদ/যমক বর্গ-৫

৭৩. ড. ভাস্কর চট্টোপধ্যায়, ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা [প্রাচীন যুগ] (কলকাতা : ২০০৫), পৃ. ১৯০

৭৪. দীপঙ্কর, বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশন-এর মুখপত্র (ঢাকা : ২০০০), পৃ. ২

৭৫. সৌম্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধ ছাত্র সংসদের মুখপত্র (ঢাকা : ২০০০), পৃ. ৭

৭৬. ধম্মপদ, সুখবর্গ/ ২০১

৭৭. ধর্মাধার মহাস্থবির, মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খন্ড, (কলিকাতা : ১৩৯৪ বাংলা), পৃ. ৩০২-৩০৮

৭৮. শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু অনূদিত, উদানং, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫

৭৯. শীলানন্দ ব্রহ্মচারী অনূদিত, সংযুক্ত নিকায়, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

Dhaka University Institutional Repository

৮০. স্থবির অনূদিত, থের গাথা (তাইওয়ান : ১৯৯৭), পৃ. ২২৬-২২৭

৮১. থের গাথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৫-৩৬৬

৮২. থের গাথা, প্রাগুক্ত, পৃ, ৪৭

৮৩. G. C Dev, Buddha the humanist, ibid, P. 68

৮৪. শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, সংযুক্ত নিকায়, প্রথম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩

৮৫. Women under Primative Buddhism (Delhi : 1975), P. 75

৮৬. ভদন্ত মেত্তাবংশ অনূদিত, খুদ্দক পাঠ (চট্টগ্রাম : ২০১৬), পৃ. ১৬৬

৮৭. K. Sri Dhammananda, What Buddhist Belive, (Taiwan : 1993), P. 166

৮৮. Ajaha Sumedho, Teaching from the Silent Mind (England, : 1992), P. 99

৮৯. সুভূতি রঞ্জন বড়ুয়া অনূদিত, অভিধর্মার্থ সংগ্রহ (কলিকাতা : ১৯৯১), পৃ. ৯৭

৯০. Tarada Nhero (Tran) A Manual of Abhidhama, Vol-1(Colombo : 1956), p.111

৯১. অধ্যাপক ড. পরেশ চন্দ্র মন্ডল সম্পাদিত, প্রাচ্যবিদ্যা, ১ম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৯৯ ঢা. বি. প্রবন্ধ : বৌদ্ধ সাধনা পদ্ধতি : ব্রহ্মবিহার, বেলু রাণী বড়ুয়া, পৃ. ১৪৮

৯২. শীল-যার অর্থ নিয়ম-নীতি, আচার-আচরণ চারিত্রিক শুদ্ধতা। শীলাভ্যাসই তার স্বভাব। শীলকে বহু ভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা-পঞ্চশীল, অষ্টশীল, দশশীল, ভিক্ষুশীল, আবার পটিসম্ভিদা মার্গ নামক গ্রন্থে চার প্রকার শীলের ব্যাখ্যা দেখা যায়, ১. চেতনাশীল, ২. নৈতসিক শীল, ৩. সংবর, ও ৪. অব্যতিক্রম শীল। এই অব্যতিক্রম শীল আবার ২ ভাগে বিভক্ত : ক চারিত্র শীল-যা করণীয় তাই চারিত্রশীল, খ. বারিত্র শীল-যা নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত তাকে বা হয় বারিত্র শীল।

৯৩. পঞ্চবচন : কালে বা অকালে, যথা বা অযথা, মধুর বা কর্কশ, অর্থত বা অনর্থত, মৈত্রীচিত্তে বা দ্বেষ বশে।

৯৪. Bhikkhu Nanamali, The Path of Purification (Singapore: 1956), P. 335

৯৫. রাজগুরু শ্রীমৎ ধর্মরত্ন মহাস্থবির অনূদিত, দীর্ঘ নিকায়, প্রথম খন্ড (রেঙ্গুন : ১৯৬২), পৃ. ১৯৭

৯৬. K. Sri Dhammanada, What Buddhists Believe, op, cit, P. 168

৯৭. ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত, মিলিন্দ প্রশ্ন (কলিকাতা : ১৯৮৭), পৃ. ২০০ আরো দ্রষ্টব্য-প্রজ্ঞাবংশ ভিক্ষু সম্পাদিত, বিশুদ্ধিমার্গ ও বৌদ্ধ সাধনা (বিশুদ্ধিমার্গ দ্বিতীয় খণ্ড অংশ বিশেষ) (কলিকাতা : ১৯৩৬), পৃ. ১৯১.

৯৮. Bhikkhu Nanamali, The Minor Reading, Ibid, P. 289.

Dhaka University Institutional Repository

৯৯. সাধনানন্দ মহাস্থবির, সুত্ত নিপাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

ধর্মজ্যোতি স্থবির ও নীলাম্বর বড়ুয়া অনূদিত, খুদ্দক পাঠো (কলিকাতা : ১৯৫৫), পৃ. ৪৫-৪৬

১০০. Narada Thera, The Buddha and His Teachigns, (Singapore: 1973), P. 371

১০১. মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষাকে বৌদ্ধিক ভাষায় ব্রহ্মবিহার বলা হয়।

১০২. Narada Thera The Buddha and his Teachings, op, cit, P. 372

১০৩. সুজিত কুমার মুখোপাধ্যায় অনূদিত, বোধিচর্যাবতার (কলিকাতা : ১৩৫৪ বাংলা), পৃ. ৭

১০৪. ধর্মাধার মহাস্থবির, মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড (কলিকাত : ১৩৯৪ বাংলা), পৃ. ৭২

১০৫. Narada Thera, A Manual of Abhidhamma, op. cit., P. 114

১০৬. Ibid, p. 111

১০৭. শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, বিশুদ্ধিমার্গ পরিক্রমা (কলিকাত), পৃ.৬১

১০৮. Bhikku Nanamali, The Path of Purification, op. cit, P-340.

১০৯. জ্যোতিঃপাল স্থবির অনূদিত, বোধিচর্যাবতার (ঢাকা : ১৯৯৪), পৃ. ১৪৯

১১০. এস. এম. লুৎফুর রহমান, বৌদ্ধ চর্যাপদ (ঢাকা : ১৯৯৯), পৃ. ২১৪

১১১. Bhikkuhu Nanamali, The Path of Pufification, opo. cit. P. 344.

১১২. শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, বিশুদ্ধিমার্গ পরিক্রমা, প্রাগুক্ত, পৃ-৬৩, সুভূতি রঞ্জন বড়ুয়া অনূদিত, অভিধর্মার্থ সংগ্রহ, প্রাগুক্ত পৃ. ১০৩.

১১৩. অধ্যাপক ড. পরেশ চন্দ্র সম্পাদিত, প্রাচ্য বিদ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ.০ ১৫৪-১৫৫.

১১৪. Narada Thera The Buddha and His Teachigns (Singapore ;1973), P. 375-376

১১৫. ড. রাধায়ন জানা, পালি ভাষা- সাহিত্যে বৌদ্ধ দর্শন ও রবীন্দ্রনাথ (কলকাতা : ১৯৮৫), পৃ. ১৫৭

১১৬. সুভূতি রঞ্জন বড়ুয়া অনূদিত, অভিধর্মার্থ সংগ্রহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩.

১১৭. ধর্ম্মজ্যোতি স্থবির ও নীলাম্বর বড়ুয়া অনূদিত, খুদ্দক পাঠো, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

১১৮. রাজগুরু শ্রীমৎ ধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির অনূদিত, দীর্ঘ নিকায়, প্রথম খণ্ড, তেবিজ্জসুত্ত-১৩, ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, দ্বিতীয় খণ্ড -মহাসুদস্সন সুত্ত ১৭, চক্রবর্তী সীহনাদ সুত্ত , মহাগোবিন্দ সুত্ত-১৯, বেণীমাধব বড়ুয়া অনূদিত,মধ্যম নিকায়, প্রথম খণ্ড, বখ সুত্ত-৭, চুল্ল অস্সপুরসুত্ত-৪০

১১৯. সাধনানন্দ মহাস্থবির অনূদিত, সুত্ত নিপাত, খড়্গবিষান সুত্ত

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বুদ্ধের নারী স্বাধীনতা : একটি পর্যেষণা

বর্তমান বিশ্বে প্রধান চার ধর্ম হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ছাড়াও আরো অনেক ধর্ম রয়েছে। প্রত্যেক ধর্মেই নারী অধিকারের কথা বলা হয়েছে। নারী-পুরুষ প্রকৃতির দুটি সত্তা এবং একে-অপরের পরিপূরক বটে। নারী-পুরুষের পূর্ণ পরিচয় তারা উভয়েই মানুষ। সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে রয়েছে নারী-পুরুষের অংশগ্রহণমূলক অবদান। পৃথিবীর ইতিহাস ও পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কালের পরিপ্রেক্ষিতে দেশ ও জাতির পরিবর্তন ঘটে। পরিবর্তনের রূপধারা সমাজজীবনে নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান।

বুদ্ধের দৃষ্টিতে নারী

খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী মানবসভ্যতার এক বিস্ময়কর অধ্যায়। এ সময় বুদ্ধ নেপালের কপিলাবস্তুর লুম্বিনী উদ্যানে জন্মগ্রহণ করেন। ছয় বছর কঠোর সাধনা করে গয়ার[১] বোধিবৃক্ষমূলে বসে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। তারপর সুদীর্ঘ পয়ঁতাল্লিশ বছর ধরে প্রচার করেন তাঁর জ্ঞানলব্ধ ধর্ম মতবাদ। এ মহাপুরুষ কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্ম 'বৌদ্ধধর্ম' নামে পরিচিত। 'বুদ্ধ' শব্দের অর্থ মহাজ্ঞানী। 'ধর্ম' শব্দের অর্থ নৈতিকতা বোঝায় যা স্ব-স্ব দায়িত্ব-কর্তব্য পরিপালনে উদ্বুদ্ধ করে। শুধু তাই নয়, গুণগতমান অনুসারে মর্যাদা ও মূল্যায়নে সহায়তা করে। √ধৃ ধাতু থেকে অর্থবোধক 'ধর্ম' শব্দের উৎপত্তি। অর্থাৎ, যা ধারণ করলে সত্য, সুন্দর, মানবিক মূল্যবোধ এবং আত্মদর্শন, আত্মোপলব্ধি জাগ্রত হয় তা-ই ধর্ম। বুদ্ধ নারী-পুরুষ উভয়ের প্রতি সমান মর্যাদাবোধ প্রদর্শন করেছেন। এক্ষেত্রে L. M Joshi - এর নিম্নলিখিত উক্তিটি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। তিনি বলেন ; 'Buddha was an upholder of the doctrine of equality of sexes'.[২] তাছাড়া এ প্রসঙ্গে আরো উক্ত হয়েছে ; 'পুরুষের ন্যায় ধর্মসাধনা ও শাস্ত্রচর্চায় নারীদের অধিকার সম্বন্ধে তেমন বিশেষ কোনো রকম পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। ভিক্ষুণী সঙ্ঘ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নারীজাতি ভিক্ষুণীধর্মে দীক্ষা নিয়ে সঙ্ঘে প্রবেশের অনুমতি লাভ করেছিলেন। পুরুষের ন্যায় নারীরাও সঙ্ঘে জীবনযাপনের অধিকারিনী হয়ে সর্বোচ্চ শিক্ষা ও জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে পুরুষের ন্যায় পূর্ণ সুযোগ সুবিধা পেয়েছিলেন'।[৩] বুদ্ধের সময়ে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। বুদ্ধ নারীকে সমাজে অধিকারের স্বীকৃতি প্রদানের কথা বলেছেন। প্রাক্ বৌদ্ধযুগে শাস্ত্রীয় আচার-

Dhaka University Institutional Repository

অনুষ্ঠানে কিংবা মঙ্গলময় আচার-অনুষ্ঠানে পুরুষের পাশাপাশি মহিলাদের স্থান ছিল গৌণ এবং রমনীদের ঐ সকল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের কোনো রকম সুযোগ ছিল না। নিম্নলিখিত উক্তিটি তারই সত্যতা প্রতিপাদন করে ;

> In The Pre-Buddhist days the status of women in India was on the whole low and without honour. During the Buddhist epoch there was a change. Women came to enjoy more equaility and greater respect and authority than ever hitherto accorded them[4].

তবে, বুদ্ধ সকল প্রকার সামাজিক ও ধর্মীয় বিধি-বিধান অগ্রাহ্য করে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পরিপালনের ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি গোত্র-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির নারীকে সমানাধিকার প্রদান করে ছিলেন। P. Lakshimi Narasu তাঁর `The Essenc of Buddhism' নামক গ্রন্থে বলেন ; Men and women were placed by the Buddha on the same footing of equality[৫]. এ প্রসঙ্গে 'বুদ্ধের অভিযান' নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। ;

> বুদ্ধের সময়ে ভারতে স্ত্রীলোকের অনেক বিষয়ে স্বাধীনতা ছিল। সেই সময় অবরোধ প্রথা ছিল না। স্ত্রী শিক্ষা সমাজের সর্বস্তরে বহুল প্রচলিত ছিল। এমন কি বারবণিতাও শিক্ষিত ছিলেন। আম্রপালির কবিত্ব শক্তি, পণ্ডিত ও বিবেচনা শক্তি প্রশংসনীয়।[৬]

বুদ্ধের পূর্ববর্তী যুগে কন্যাসন্তানের জন্ম পরিবারে তেমন কাঙ্ক্ষিত ছিল না। তাদেরকে পরিবারের বোঝা মনে করা হতো। বরঞ্চ পুত্র সন্তানের জন্মকে স্বাগত জানানো হতো। পিতা-মাতার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যেই পুত্র সন্তানের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসা বর্ষিত হতো।[৭] কিন্তু বুদ্ধ যুগে পুত্রসন্তান ও কন্যাসন্তানের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য ছিল না। উভয়েই মা-বাবা ও সমাজে সমাদৃত হতো। সুত্র পিটকের অন্তর্গত 'থেরীগাথা' নামক গ্রন্থে দেখা যায় ; 'জীবা' নামে কন্যাসন্তানের জননী হওয়ায় ক্ষত্রিয়রাজ কোশলরাজ প্রসেনজিৎ তাঁর স্ত্রী উর্বরিকে রাজমহিষীর স্থানে উন্নীত করেন।[৮] সেই রাজকন্যা মৃত্যু মুখে পতিত হলে শোকার্ত রাজমহিষী উর্বরি পাগলিনীর মতো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। অচিরাবতীর নদীর তীরে গিয়ে দিন-রাত বিলাপ করে কেঁদেছেন।[৯]

এ সম্পর্কে 'ধম্মপদট্ঠকথা' নামক গ্রন্থে দেখা যায়, শ্রাবস্তীতে মহাসুবর্ণ নামে একজন মহাশ্রষ্ঠী ছিলেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন। একদিন তিনি স্নান করে আসার সময় পথিমধ্যে শাখাসম্পন্ন এক বনস্পতি দেখতে পান। 'এই

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ, যারা ধার নিয়ে কখনো পরিশোধ করে না। তাদের ধার দেবে না।

ঙ. ধার নিয়ে দিতে না পারলেও দেবে।

অর্থাৎ, যদি কোনো দরিদ্র আত্মীয়-স্বজন ধার নিয়ে ফেরত দেবার ইচ্ছা থাকলেও অভাবজনিত কারণে দিতে না পারে তাদের দেবে ।

চ. সুখে উপবেশন করবে।

অর্থাৎ, শ্বশুর-শাশুড়ি, স্বামী প্রভৃতি গুরুজনদের দেখে উঠতে না হয় এমন আসনে, জায়গায় কিংবা স্থানে বসবে।

ছ. সুখে আহার করবে।

অর্থাৎ, শ্বশুর-শাশুড়ি, স্বামী প্রভৃতি গুরুজনদের আহারের পর আহার করবে।

জ. সুখে শয়ন করবে।

অর্থাৎ, শ্বশুর-শাশুড়ি, স্বামী প্রভৃতি গুরুজনদের প্রয়োজনীয় কার্য সমাধান করে নিশ্চিত মনে শয়ন করবে।

ঝ. অগ্নি সেবা করবে।

অর্থাৎ, অগ্নিতুল্য শ্বশুর-শাশুড়ি, স্বামী প্রভৃতি গুরুজনদের পরিচর্যা করবে।

ঞ. গৃহদেবতাকে ভক্তি করবে।

অর্থাৎ, শ্বশুর-শাশুড়ি, স্বামী প্রভৃতি গুরুজনদের দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করবে।

সংসারিক সুখ সমৃদ্ধিকরণে রয়েছে নারীজাতির অপরিসীম অবদান। নারীজাতি নিম্নলিখিত চারটি কারণে[১৫] প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংসার বিজয়ে সহায়ক হয়। যেমন :

ক. যদি সে পারিবারিক কর্মে সুদক্ষা, অনলসা হয়, উচিত-অনুচিত কর্মে বিচার নিপুণা হয়।

খ. যদি সে দাস-দাসী, কর্মচারীদের কর্ম পরিদর্শন করে ; তাদের কর্ম সুন্দররূপে সম্পন্ন হলো কিনা খোঁজ খবর নেয় ; তাদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করে ; তাদের শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী কাজকর্ম বন্টন করে ; অসুস্থ হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে ; প্রত্যেকের প্রাপ্যতা অনুসারে খাদ্য- ভোজ্য বিতরণ করে।

গ. যদি সে স্বামীর কষ্টার্জিত ধন, ধান্য, স্বর্ণ রৌপ্যাদি রক্ষা করে ; ধূর্ত, চোর স্বভাবা না হয় ; যদি সে বিলাসিনী না হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সকলকে ধর্মোপদেশ প্রদান করছিলেন। আম্রপালিও সেদিন প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় অনুপাণিত হয়ে বুদ্ধের দর্শন ও ধর্মশ্রবণ করার লক্ষ্যে সেখানে উপস্থিত হন। বুদ্ধের অমৃতময় ধর্মবাণী আম্রপালির চিত্তকে আকৃষ্ট করলো। চিত্ত হলো স্নিগ্ধ। প্রীতিরসে পরিপূর্ণ হলো তাঁর হৃদয় এবং জাগ্রত হলো ধর্মাভাব। বুদ্ধের প্রতি তার শ্রদ্ধা ও অটল বিশ্বাস বৃদ্ধি পেল। তারপর তিনি বুদ্ধ এবং শিষ্য-প্রশিষ্যসহ মহতী ভিক্ষুসঙ্ঘকে তার বাসগৃহে নিমন্ত্রণ করলেন। আম্রপালির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে গিয়ে বুদ্ধ লিচ্ছবী রাজপুত্রদের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।[১৯] বুদ্ধ সেদিনও নারী জাতিকে যে মূল্যায়ন করেছিলেন উপরি-উক্ত ঘটনাপ্রবাহ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মমত গ্রহণ করা নারী-পুরুষ সকলের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। সবশ্রেণির নারী বুদ্ধের শাসনে স্থান লাভ করেছে। 'থেরীগাথা' নামক গ্রন্থে ৭৩জন থেরীর কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। একটি ছকাকারে তা উপস্থাপন করা হলো।[২০]

পরিচিতি	নাম
সম্ভ্রান্ত বংশীয় ও রাজপরিবারভুক্ত বধূ-কন্যা = ২৭	অজ্ঞাত ভিক্ষুণী, পূর্ণা, তিস্যা, ধর্মদিন্না, সুমনা, ধর্মা, অভিরূপা, জেন্তি, মিত্রা, অভয়া, শ্যামা, অপর শ্যামা, উর্বরি, শুক্রা, শৈলী, সিঙ্খা, সুন্দরী নন্দা, সোনা, পটাচারা ত্রিংশতি ভিক্ষুণী, পটাচারার পাঁচশত ভিক্ষুণী, বাশিষ্ঠী, ক্ষেমা, মহাপ্রজাপতি গৌতমী, বিজয়া, উত্তরা, বর্দ্ধমাতা এবং সুমেধা।
শ্রেষ্ঠী ও ধনী সম্প্রদায়ভূক্ত = ৮ জন	ইসিদাসী, উৎপল বর্ণা, অনুপমা, সুজাতা, পটাচারা, ভদ্র কুণ্ডলকেশা, উত্তমা, চিত্রা
ব্রাহ্মণ ও পূজারী = ১৮ জন	মুক্তা, মুক্তা-২, মেত্তিকা, অপরা উত্তমা, দন্তিকা, সোমা, ভদ্রকাপিলানী, নন্দুত্তরা, মিত্রকালী, সকুলা, চন্দ্রা, গুপ্তা, চালা, উপচালা, শিশূপচালা, রোহিনী সুন্দরী, শুভা (জীবকের আম্রকুঞ্জবাসিনী)

Dhaka University Institutional Repository

বারবণিতা = ৪ জন	আম্রপালি, বিমলা, অর্দ্ধকাশী, অভয়ের মাতা
সাধারণ ঘরের মেয়ে = ১৬ জন	পূণির্কা, কৃশা গৌতমী, সুমঙ্গলের মাতা, অপর তিষ্য, ধীরা, ধীরা নামক অপর ভিক্ষুণী, মিত্রা, অপর বিশাখা, ভদ্রা, উপশমা, সুমনা, উত্তরা ,সঙঘা, চাপা, অপরা শুভা, বড়্ঢকেশী,

এখানে বুদ্ধের ধর্মে উদারতা এবং সার্বজনীনতার রূপ দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে নলিনাক্ষ দত্ত বলেন ; এ ধর্ম রাজমহিষী হতে শুরু করে দাসী পর্যন্ত এবং সতী সাবিত্রী রমনী হতে বারবণিতা পর্যন্ত কাউকেও আশ্রয় দিতে কণ্ঠিত নহে। এঁরা সকলেই যেমন ভিক্ষুণী জীবনযাপন করার যোগ্য তেমনি নির্বাণ প্রাপ্তিরও উপযুক্ত। এক কথায় বলতে গেলে, এই ধর্মের দ্বার উচুঁ-নিচু, আবালবৃদ্ধ-বণিতা, সকলের পক্ষেই সর্বদা উন্মুক্ত।[২১] সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে বুদ্ধ কখনো নারী পুরুষে বৈষম্য প্রদর্শন করেননি। এটাই তাঁর ধর্মে নারী-পুরুষের প্রতি মমত্ববোধের অন্যতম দৃষ্টান্ত। বুদ্ধ তাঁর ধর্মে নারীজাতির সম্পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 'দীর্ঘ নিকায়' নামক গ্রন্থে দেখা যায়, পরিবারের নারীরা কর্তব্য পরায়ণা হয়, আস্থাভাজন হয়, সংসারকে সুন্দর-পরিপাঠি করে রাখে, সন্তান-সন্ততিকে সম্যকভাবে দেখাশোনা করেন, স্বামীর কষ্টার্জিত অর্থ সঠিকভাবে বণ্টন করে। সর্বোপরি সংসারের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রক।[২২] বিপুল ধনসম্পদের অধিকারিনী ও দাস-দাসী পরিবৃত হয়েও স্বর্ণকার কন্যা শুভা অবিবাহিতা জীবনে পিতা-মাতা, ভাই-বোনদের দেখাশোনা করতেন। তিনি স্বয়ং নিজে অনেক ধন-সম্পত্তি, শস্যক্ষেত্র রক্ষণাবেক্ষণসহ পুরোবাড়ির কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। গৃহকর্মে সুনিপুণা শুভা আত্মীয়-স্বজনদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।[২৩]

সবাই কর্মের অধীন। কর্মের মধ্যে নারী ও পুরুষ তাঁর অবস্থা সুদৃঢ় থেকে সুদৃঢ় করে। 'কর্ম' হলো মানসিক কার্য-কারণ বিধি। সকলে নিজ নিজ কর্মের ফল স্বরূপ ইহজীবনে সুখ-দুঃখ, যশ-খ্যাতি, নিন্দা-প্রশংসা, লাভ-অলাভ ইত্যাদি লাভ করেন। মহামতি বুদ্ধ কর্মের স্বরূপ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন ;

কম্মুনা বত্ততি লোকো কম্মুনা বত্ততি পজা

কম্মনিবন্ধনা সত্তা রথস্সানীব যাযরে।[২৪]

অর্থাৎ, কর্ম প্রভাবে পৃথিবী আবর্তিত হচ্ছে। কর্মের কারণে সকল প্রাণী সংসার পরিভ্রমণ করছে। অনিবদ্ধ হয়ে রথ যেমন যত্রতত্র গমন করে তেমনি কর্মনিবন্ধন দ্বারা জীবগণ বিভিন্ন গতি প্রাপ্ত হয়।

তেমনি কর্মনিবন্ধন দ্বারা জীবগণ বিভিন্ন গতি

Dhaka University Institutional Repository

সচরাচার লক্ষ্য করা যায়, বিবাহিতা নারী তার স্বামী, সংসার এবং সন্তান নিয়েই জীবনযাপন করেন। সাংসারিক জীবনের সকল প্রকার কর্ম সম্পাদন তাদের প্রধান ব্রত হিসেবে পরিগণিত হয়। কিন্তু দরিদ্র ও নিম্ন শ্রেণির নারীদের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ছিল। দারিদ্র্যের কারণেই ভরণপোষণের জন্য গৃহকর্ম ছাড়াও তাদের অন্যান্য পেশা বা বৃত্তি অবলম্বন করতে হয়। তারা স্বামীর মতামতের বিরূদ্ধে গিয়ে কোনো অবস্থাতেই কোনো রকম সিদ্ধান্ত নিতে পারতো না। কিন্তু বৌদ্ধযুগে পুরুষের মতো নারীরাও সম্পত্তির অধিকারী হতে পারতেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে ; সুন্দরীর পিতা ভিক্ষুজীবন গ্রহণ করার পূর্বে সমস্ত সম্পত্তি কন্যার মঙ্গল ও কল্যাণ কামনায় স্ত্রীকে সমর্পণ করেন। পরে সুন্দরী সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী কিংবা উত্তরাধিকারিণী হন। যথাঃ

হস্তী, গো ও অশ্ব মণিকুণ্ডলাদি ধন

এ সমৃদ্ধ গৃহ ত্যাজি জনক তোমার

প্রব্রজ্যা করিল আজি এ সুন্দরী ! ধনরাজি

কর ভোগ একাকিনী দায়াধি তাহার।[২৫]

বুদ্ধের সময়ে নারীগণ সর্বক্ষেত্রে বিস্ময়কর কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে দেখা যায় ; 'সর্বক্ষেত্রে পুরুষ নারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয় ; নারীও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ও সুচতুর হলে পুরুষের সমকক্ষ হতে পারেন'।[২৬] এ কথাটির যথার্থতা দেখতে পাওয়া যায় ভদ্রা কুণ্ডলকেশীর জীবনে। রাজগৃহের রাজ কোষাধ্যক্ষের ঘরে তাঁর জন্ম। সৌন্দর্য ও পূর্ণ যৌবনে এক প্রতীক তিনি। একদিন নগর রক্ষীরা সত্থু চোর নামক একজন ব্যক্তিকে বধ্যভূমিতে বধ করার জন্য রাজার আদেশে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। এ সময় প্রাসাদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভদ্রা তাঁকে দেখে প্রথম দর্শনে তার প্রতি গভীরভাবে অনুরক্তা হন। কন্যার প্রতি গভীর স্নেহবশতঃ পিতা অপরাধীকে মুক্ত করে নিজ কন্যার সাথে বিয়ে দেন। কিন্তু চুরি করা যার স্বভাব সেই চোর স্বামী ভদ্রার মূল্যবান রত্নসমূহ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাঁকে মেরে ফেলার জন্য নিয়ে যায় শৈলশৃঙ্গে। স্বামীর দুষ্টবুদ্ধি বুঝতে পেরে ভদ্রা শেষ আলিঙ্গন ও শ্রদ্ধা করার ছলনা করে চোর স্বামীকে শৃঙ্গ থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন। পর্বতের তলদেশের গভীর গর্তে সত্থু চোর প্রাণ হারায়। এতে বোঝা যায়, একজন পুরুষের তুলনায় একজন নারীও কিন্তু কম বুদ্ধিমতী নয়। অনেক ক্ষেত্রে নারীও পুরুষের সমকক্ষ। কোনো অংশে কম নয়।

সমাজব্যবস্থা পুরুষ শাসিত হলেও নারী জাতিকে একেবারে উপেক্ষা করা হয়নি। বুদ্ধ প্রথমাবস্থায় নারীকে ধর্মীয়ভাবে প্রাধান্য না দিলেও পরবর্তীতে সমাজে নারী সম্প্রদায়কে যথাযোগ্য বা প্রকৃত অধিকার থেকে বঞ্চিত করেননি।

Dhaka University Institutional Repository

ভিক্ষুণীসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা

সাধারণ গৃহীজীবন থেকে অনাগারিক ভিক্ষুণী (ইঁফফযরংঃ ঘঁহ) জীবন অতি উত্তম ও পুত-পবিত্র। সংঘে নারীদের প্রতিষ্ঠা প্রাচীন ভারতের এক বৈপ্লবিক ঘটনা। বৌদ্ধ সাহিত্যে বর্ণিত আছে-সিদ্ধার্থ গৌতমের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর তাঁর পিতা শুদ্ধোদনের মৃত্যুর সময় বুদ্ধ বৈশালীতে ছিলেন। রাজার মৃত্যুতে রানি মহাপ্রজাপতি গৌতমী হতাশ হয়ে পড়েন। তিনি তখনই সংসার ত্যাগের সংকল্পবদ্ধ হন। তিনি বুদ্ধের অনুমতির সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন। সুযোগও আসে। রোহিনী নদীর জলের অধিকার নিয়ে শাক্য ও কোলীয়দের বিবাদ মিটাতে বুদ্ধ কপিলাবস্তু আসেন। বিবাদ মিটানোর পর ৫০০জন শাক্য তরুণ বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ভিক্ষু হন। তাঁদের স্ত্রীদের নিয়ে গৌতমী বুদ্ধের নিকট গিয়ে ভিক্ষুণী হবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। বুদ্ধ তাতে কোনো রকম সম্মতি প্রদান করেনি। মহাপ্রজাপতি গৌতমী তিন বার প্রার্থনা করেন। বুদ্ধ তিনবারই প্রত্যাখ্যান করেন।[২৭] পরে বুদ্ধের প্রধান সেবক আনন্দ তিনবার নারীদের প্রব্রজ্যা দানের জন্য অনুরোধ করেন। এক সময় বুদ্ধ বৈশালী নগরে আগমন করলে মহাপ্রজাপতি গৌতমী সংসার ত্যাগ করার জন্য বুদ্ধের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। বুদ্ধ কিন্তু অনুমতি প্রদানে অস্বীকৃতি জানান। তারপরে গৌতমী মস্তক মুণ্ডন ও গেরুয়া বসন পরিধান করে পাঁচশত শাক্যবংশীয় নারীসহ সমভিব্যাহারে বৈশালীতে গমন করেন।[২৮] তথায় আনন্দ স্থবির তাদের পক্ষ অবলম্বন করতো তাঁদের প্রব্রজ্যা প্রদানের জন্য বুদ্ধের নিকট তিনবার আবেদন করেন। বুদ্ধ তাঁকে তিনবারই প্রত্যাখ্যান করেন।[২৯] অন্য একসময় আনন্দ বুদ্ধের নিকট নারীর প্রব্রজ্যা লাভের অনুমতি প্রার্থনা করলেন এভাবে ; 'প্রভু ! নারী তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে আগার হতে অনাগারিক রূপে প্রব্রজিত হয়ে স্রোতাপত্তি ফল, সকৃদাগামি ফল, অনাগামি ফল কিংবা অর্হত্ব ফল লাভে সমর্থ কি? বুদ্ধ উত্তরে বললেন, আনন্দ ! নারী বুদ্ধ প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে আগার হতে অনাগারিক রূপে প্রব্রজিত হয়ে স্রোতাপত্তি ফল, সকৃদাগামি ফল, অনাগামি ফল কিংবা অর্হত্ব ফল লাভে সমর্থ।[৩০] তখন আনন্দ থের আবার বুদ্ধের কাছে নারীজাতি ও প্রব্রজ্যা বিষয়ে প্রার্থনা করেন। বুদ্ধ এবার আনন্দকে আর প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। নারীসমাজকে সংঘে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করলেন। তবে, বুদ্ধ ভিক্ষুণীদের জন্য তিনি আটটি বিশেষ বিধি-বিধানের প্রবর্তন করলেন। যে বিধি-বিধানগুলো ভিক্ষুণীগণ জীবনে কখনো লঙ্ঘন করতে পারবে না। আটটি বিশেষ বিধি-বিধানকে অষ্টগুরু ধর্ম বলা হয়।[৩১] তখন আনন্দ থের আবার বুদ্ধের নিকট নারী জাতির বিষয়ে প্রার্থণা করেন । বুদ্ধ আনন্দকে দিয়ে অষ্টগুরু ধর্মের দ্বারা মহাপ্রজাপতি গৌতমীর প্রার্থনা পূর্ণ করলেন। অষ্টগুরু ধর্ম হলো -

Dhaka University Institutional Repository

ক. একশত বৎসরের উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুণীকেও একদিন উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে যথাযথ অভিবাদন, সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হয়।

খ. ভিক্ষু শূন্য আবাসে ভিক্ষুণী বর্ষাবাস করতে পারবে না। ।

গ. প্রতি অর্দ্ধমাস অন্তর ভিক্ষুণীকে ভিক্ষু সঙ্ঘের নিকট উপোসথ জিজ্ঞাসা ও উপোসথ শ্রবণে গমন-এ দুটি বিষয় প্রত্যাশা করতে হবে।

ঘ. বর্ষাবাস সমাপ্ত করবার পর ভিক্ষুণীকে উভয় সঙ্ঘের নিকট দৃষ্ট শ্রুত পরিশঙ্কিত বিষয় সম্পর্কে প্রবারণা করতে হবে।

ঙ. গুরু ধর্মপ্রাপ্ত (গুরুতর অপরাধী) ভিক্ষুণীকে উভয় সংঘের নিকট মানত্ত ব্রত পালন করতে হবে।

চ. দুই বর্ষ ষড়বিধ ধর্মে পাচিত্তিয়া নিয়ম শিক্ষা সমাপনান্তে ভিক্ষুণীকে উভয় সঙ্ঘের নিকট উপসম্পদা প্রার্থনা করতে হবে।

ছ. ভিক্ষুণী কোনো কারণেই ভিক্ষুকে আক্রোশ, পরিহাস, মন্দ করতে পারবেন না।

জ. ভিক্ষুরা ভিক্ষুণীদের উপদেশ দিতে পারবেন। কিন্তু ভিক্ষুণীরা কখনোই কোনো ভিক্ষুকে উপদেশ দিতে পারবেন না।[৩২]

বুদ্ধ আনন্দের অনুরোধেই নারীদের জন্য আটটি[৩৩] নিয়ম বিধিবদ্ধ করে ভিক্ষুণীসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করলেন। সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠা মহামানব বুদ্ধের অনবদ্য কীর্তি। মহাপ্রজাপতি গৌতমীর প্রার্থনায় এবং বুদ্ধের প্রিয়শিষ্য আনন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বুদ্ধের জীবিতকালেই বৌদ্ধ ভিক্ষুসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠতার পাশাপাশি গড়ে উঠছিল ভিক্ষুণীসঙ্ঘ। এখানে উল্লেখ থাকে যে, ভিক্ষুণীসঙ্ঘ ভিক্ষুসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর পর সৃষ্টি হয়েছিল।[৩৪] সঙ্ঘ-এর মধ্যে নারীর প্রবেশ অনন্য সাধারণ উদাহরণ। William R Lafleur বলেন ; 'The earliest record of the sangha give instance of women who as women because nuns and perfected their enlightenment, there has been a strong tendency with in Buddhist cultures to adopt the view that maleness is virtually a prerequisite for attainment of the highest ideals'[৩৫]

এক সময় আনন্দ পরিনির্বাণের অল্পকাল পূর্বে বুদ্ধ আনন্দের প্রশ্নের উত্তরে নারীর সাথে ভিক্ষুর আচার-আচরণ বিষয়ে উপদেশ দেন।

'হে ভন্তে! মাতৃগ্রামের (নারী) প্রতি আমরা কী প্রকার ব্যবহার করবো'?

'অদর্শন, আনন্দ'!

Dhaka University Institutional Repository

'দর্শন হলে হে ভগবান! কি প্রকারে ব্যবহার করা উচিত হবে'?

'অনালাপ, আনন্দ।

যদি আলাপ করতে হয়, তবে ভন্তে! কী প্রকারে করতে হবে?'

'হে আনন্দ! তখন স্মৃতিকে উপস্থাপিত রাখতে হবে।[৩৬] বৌদ্ধসঙ্ঘে ভিক্ষুণীরা জ্ঞানে গুণে, পাণ্ডিত্যে সাধনায় ভিক্ষুদের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিলেন না। কালক্রমে ভিক্ষুণী সঙ্ঘ বিস্তৃত হলো ; গ্রামে, নগরে, বিস্তৃত জনপদ সমূহে এবং রাজপ্রাসাদে। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হতে থাকলো ভিক্ষুণী সংখ্যা।

ভিক্ষুণীরা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সর্বাশ্রেষ্ঠারূপে নিজেদেরকে পরিচিত করে তোলার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। রাজা বিম্বিসারের পত্নী ক্ষেমা ও উৎপল বর্ণা দুজন থেরী শিক্ষিতা ও আদর্শবতী ভিক্ষুনীরূপে নিজেদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। থেরী ক্ষেমা রাজা প্রসেনজিৎ কর্তৃক সমস্ত প্রশ্নের যথার্থ উত্তর প্রদানের মাধ্যমে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন।[৩৭] তাছাড়া ক্ষেমা প্রজ্ঞায়, উৎপল বর্ণা ঋদ্ধিবলে, ধম্মদিন্না ধর্মকথিকা, নন্দা ধ্যানমার্গ, ভদ্রাকপিলানী জাতিস্মর জ্ঞানে, মহাপ্রজাপ্রতি গৌতমী অভিজ্ঞাতায়, সকুলা দিব্য দৃষ্টিতে, সোনা সম্যক ব্যায়ামে, কুণ্ডলকেশী তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে এবং কৃশা গৌতমী অমসৃণ বস্ত্র পরিধাণে ,ভিক্ষুণীদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন।[৩৮]

এভাবে সকল নারী ভিক্ষুণী সঙ্ঘে অন্তর্ভূক্ত হলেন এবং ভিক্ষুণী সংঘের মূলস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়। এমতাবস্থায় মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে ভিক্ষুণীসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার প্রথম ও প্রধান পথ প্রদর্শক বলে অভিহিত করা যায়। বুদ্ধের সময়েই ভিক্ষুণীদের জন্য সঙ্ঘ স্থাপিত হয়। এই সংঘে সকল শ্রেণির রমনী যোগদান করে সাংসারিক বন্ধন ছিন্ন করে লোকোত্তর চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হওয়া একটি উন্মুক্ত পরিবেশ লাভ করেছেন। সঙ্ঘ ব্যবস্থাপনায় নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো রকম প্রভেদ রাখেননি। প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় উভয় সঙ্ঘ সম্পর্কে G. C Dev বলেন ; `Equalization of sprittual rights of man and women of all sundry, is the great gift of Buddha in Ancient India'.[৩৯]

বুদ্ধ ভিক্ষুণীসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করে মহিলাদের ধর্মে প্রবেশের সুযোগ দিয়েছিলেন। এ ধরনের সুযোগ দেওয়ার ফলে ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে বিভিন্ন সম্প্রদায়-গোত্র ও শ্রেণি হতে নারীরা সেখানে যোগদান করেন। এখানে রাজা, শ্রেষ্ঠী এবং ধনী পরিবারের স্ত্রী-কন্যাদের সমাবেশ যেমন ঘটেছে তেমনি আবার বিবাহিত, অবিবাহিত, বিধবা, সন্তানহারা জননী, ক্রীতদাসী এবং বারবণিতার সংখ্যাও একেবারে কম নয়। এ কথায় বলতে গেলে, সমাজজীবনের সর্বস্তরের অসংখ্য নারী বৌদ্ধ ভিক্ষুণী হিসেবে পরবর্তী জীবন অতিবাহিতোকরতে সক্ষম হয়েছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

বিমুক্তি সুখ লাভে নারী

ভিক্ষুণী সংঘে প্রবেশের পর তাঁরা সাধনায় মনোনিবেশিত হন। ভিক্ষুণীরা অর্হৎ[৪০] পর্যন্ত হতে পারে। এ বিষয়ে ও. ই ঐড়ৎহবৎ -এর 'Women under Primative Buddhism'নামক গ্রন্থ উল্লেখ রয়েছে, 'As the testify, were they but given the oppourtunity, they were as capable as men of peeling of the wrapping to the flesh of ridding themselves sensuality and craving and of treading on the higher pathand gaining the fruits of Arhanship'[৪১]. ভিক্ষুণীদের অনেকেই অর্হৎ হয়েছিলেন। একসময় বৎসগোত্র পরিব্রাজক বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলেন; 'হে গৌতম ! আপনার একটি শ্রাবিকাসঙ্ঘ আছে কি, যেখানে আস্রব সমূহের ক্ষয়ে অনাস্রব চিত্ত বিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তিকে দৃষ্টধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞাত হয়ে সাক্ষাৎকার করে, উপস্থপন্ন হয়ে অবস্থান করছে কী?

তখন বুদ্ধ উত্তর প্রদান করলেন এভাবে -

'বৎস ! কেবল মাত্র একটি নয়, শত' শত নয়, দুই শত ; দুই শত নয়, তিন শত ; তিন শত নয়, চার শত ; চার শত নয়, পাঁচশত নয়, বরং তার চেয়েও অধিকই আমার শ্রাবিকা ভিক্ষুণী আস্রবসমূহের ক্ষয়ে অনাস্রব চিত্ত বিমুক্তি প্রজ্ঞা বিমুক্তিকে দৃষ্টধর্মেই স্বয়ং অভিজ্ঞাত হয়ে সাক্ষাৎকার করে উপস্থাপন্ন হয়ে বসবাস করছে'।[৪২] সূত্র পিটকের অন্তর্গত 'থেরী গাথা' নামক গ্রন্থেও তার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অনেক থেরী বলেছেন যে তাঁরা মুক্ত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে থেরী মুক্তা বলেন ;

সুমুত্তা সাধুমুত্তম্হি তীহি খুজ্জেহি মুত্তিয়া
উদুক্খলেন মুসলেন পতিনা খজ্জকেন চ
মুত্তম্হিজাতিমরণা ভবনেত্তি সমূহতা।[৪৩]

অর্থাৎ, সত্যিই আমি মুক্ত। ত্রিবিধ পদার্থ হতে উদুখল, মূষল ও কুজদেহ স্বামী হতে আমার মুক্তি গৌরবময়। কিন্তু তার চেয়েও শ্রেষ্ঠতর মুক্তি- তৃষ্ণাক্ষয়ে আমি জাতিমরণ হতে মুক্তি লাভ করেছি।

আবার ভিক্ষুণী সঙ্ঘা এ বিষয়ে নিজের কথা বলতে গিয়ে বলেন ;

হিত্বা ঘরে পব্বজিত্বা হিত্বা পুত্তং পসুং পিযং
হিত্বা রাগঞ্চ দোসঞ্চ অবিজ্জঞ্চ বিরাজিয়

Dhaka University Institutional Repository

সমূলং তণ্হমব্ব্যুহ উপসন্তম্হি নিব্বুতা।[৪৪]

অর্থাৎ, আমি সংসার পরিত্যাগ করেছি, সন্তান ত্যাগ করেছি, প্রিয় পশুসমূহ ত্যাগ করেছি। আমি রাগ-দ্বেষ-মোহ ও অবিদ্যা দূর করেছি ; তৃষ্ণা ও তৃষ্ণার মূল উৎপাটিত করে আমি এখন শান্ত, নির্বাণের শান্তি আমার জ্ঞাত।

বিমুক্তি সুখ লাভ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে থেরী 'অপর উত্তমা' আবেগ আপ্লুত হয়ে বলেন ;

সব্বে কামা সমুচ্ছিন্না যে দিব্বা যে চ মানুসা

ভিক্খীণো জাতিসংসারো নত্থি দানি পুনব্ভবো।[৪৫]

অর্থাৎ, দৈব অথবা মানুষ সর্ব প্রকার কামনিঃশেষ উৎপাটিত হয়েছে। জন্মচক্র ধ্বংস হয়েছে। আমি পুনর্জন্মের অতীত।

এছাড়া থেরী 'উত্তরা' নামক একজন থেরী বিমুক্তি সুখ লাভকে হৃদয়াঙ্গম করে আত্মসুখ উপলব্ধি করে আপন মনে বলতে লাগলেন ;

কায়েন সংবুতা আসিং বাচায় উদচেতসা

সমূলং তণ্হং অব্ব্যুহ নীতিভূতম্হি নিব্বুতা।[৪৬]

অর্থাৎ, কায়-বাক্য ও মনে তৃষ্ণার মূল বিনষ্ট করে আমি এখন শান্ত। তৃষ্ণার সমূল উৎপাটন করে নিবৃত্ত হয়েছি।

অড্ঢকাসী (অর্ধকাশী) থেরীর জীবনকাহিনি থেকে জানা যায়, তিনি সংসার জীবনের প্রতি বিরাগভাব উৎপন্ন করার পর অর্ন্তদৃষ্টির অনুশীলনের মাধ্যমে অর্হত্ব লাভ করতে সক্ষম হন। তিনি বলেন ;

মা পুন জাতিসংসারং সদ্ধাবেয্যং পুনপ্পুনং

তিস্সো বিজ্জা সচ্ছিকতা কতং বুদ্ধস্স সাসনং।[৪৭]

অর্থাৎ, আমি মোহমুক্ত, পুনর্জন্ম ও মৃত্যুর চক্রে ঘূর্ণিত হবো না। আমি বুদ্ধ প্রদর্শিত ত্রিবিদ্যার ফল প্রাপ্ত হয়েছি। বিমলা সংঘে প্রবেশ করে শ্রম ও অধ্যাবসায়ের ফলে অচিরেই অর্হত্ব লাভ করেন। তিনি সফলতার উল্লাসে প্রীতিমনে বললেন ;

সব্বে যোগা সমুচ্ছিন্না যে দিব্বা যে চ মানুসা

খেপেত্বা আসবে সব্বে সীতিভূতম্হি নিব্বুতা।[৪৮]

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ, দৈব ও মানুষ সর্ববিধ বন্ধন আমি ছিন্ন করেছি। চিত্ত বিমূঢ়কর সমুদয় আসব আমি দূর করেছি। আমি শান্ত ও নির্বাণপ্রাপ্ত।

'থেরী আপাদান' নামক গ্রন্থে থেরীরা কীভাবে দুঃখের অন্তঃসাধন করে বিমুক্ত সুখ লাভ করেছিলেন তার একটি ধারাবাহিক বর্ণনা সেখানে রয়েছে। কোনো কোনো থেরী বা ভিক্ষুণী বলেন ; 'অপ্পমত্তা বিসংযুত্তা উপসন্তম্হি নিব্বুতা'[৪৯]। অর্থাৎ, লক্ষ্যবদ্ধ, অনাসক্ত ও শান্তচিত্তে আমি নির্বাণের শান্তি উপভোগ করছি। নারীরা জন্ম-জন্মান্তরের অক্ষয় পূণ্য সঞ্চয় করে মুক্তির পথে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। গৌতম বুদ্ধের সময়ে পটাচারার অসংখ্য শিষ্যা তাঁর নিকট নিজেদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন ; 'তেবজ্জিম্হা অনাসবা'।[৫০] অর্থাৎ, আমরা ত্রিবিদ্যালব্ধ এবং আসবমুক্ত। আবার কোনো কোনো ভিক্ষুণী বলেন ; তিনি পূর্বে নামে মাত্র ব্রাহ্মণ ছিলেন ; পরে তিনি সত্যই ব্রাহ্মণ হয়েছেন। ত্রিবিদ্যায় পারদর্শী হয়েছেন।[৫১] চন্দা বা চন্দ্র নামক ভিক্ষুণী বলেন ; 'তেবিজ্জম্হি অনাসবা'।[৫২] আমি ত্রিবিদ্যাসিদ্ধ ও আসবমুক্ত। ভিক্ষুণী ভদ্দা কপিলানী বা ভদ্র কপিলানী বলেন ;

তথেব ভদ্দা কপিলানী তেবিজ্জা মচ্চুহাযিনী
ধারেতি অন্তিমং দেহং জেত্বা মারং সবাহনং।[৫৩]

অর্থাৎ, ভদ্রা কপিলানীও ত্রিবিদ্যা-সিদ্ধ, জন্ম-মৃত্যুঞ্জয়ী, ঐ পরিণতির উদ্দেশে তিনি তাঁর সর্বশেষ মূর্তি ধারণ করেছেন। তিনি সবাহন মারকে পরাজিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন ;

দিস্বা আদীনবং লোকে উভো পব্বজিত মযং
তম্হং খীণাসব দন্তা সীতিভূতম্হ নিব্বুতা।[৫৪]

অর্থাৎ, সংসারের দৈন্যতা দেখে আমরা উভয়েই প্রব্রজিত হয়েছি। এখন আমরা উভয়েই শান্ত, দান্ত, (আত্মবিজয়ী) এবং উভয়েই নির্বাণপ্রাপ্ত।

ভিক্ষুণী আত্মশক্তিতে বলীয়ান ও ইন্দ্রিয় সংযমকরতো কঠোর সাধনার মাধ্যমে অর্হৎ হতে পারেন কিংবা বিমুক্তি সুখলাভ করতে পারে। ভিক্ষুণীর অর্হৎ লাভের ঘটনা আমরা জাতকে দেখতে পাই। যেমন : 'অভ্যন্তর জাতক'-এ উক্ত আছে যে, পাঁচশত মহিলা মহাপ্রজাপতির সাথে প্রব্রজ্যাধর্ম গ্রহণ করেছেন এবং উপসম্পদা লাভ করেছেন তাদের সকলেই অর্হত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন।[৫৫] 'খুল্লকলিঙ্গ জাতক'-এ আরো দেখা যায়, ভিক্ষুণী উৎপল বর্ণার চারজন শিষ্যা প্রব্রজ্যা গ্রহণের অচিরকাল পরেই অর্হত্বফল লাভ করেছিলেন।[৫৬] ইহা বোধ হয়, বিশেষ করে বলা উচিত যে, কোনো কোনো নারী ভিক্ষুণী দীক্ষালাভ করার পূর্বেই গৃহস্থ অবস্থাতেই অর্হত্ব লাভ করেছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ

Dhaka University Institutional Repository

বলা যায়, সাকেত নগরের জনৈক শ্রেষ্ঠীর পুত্রবধূ সুজাতা সম্বন্ধে কথিত হয় যে, এক সময় প্রমোদ উদ্যানে নক্ষত্রোৎসব হতে অনুচরবর্গের সাথে নগরে প্রত্যাবর্তন কালে অঞ্জন উদ্যানে তিনি বুদ্ধের দর্শন লাভ করেন। বুদ্ধের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তিনি তাঁর নিকটবর্তী হলেন এবং বন্দনান্তে আসন গ্রহণ করলেন। বুদ্ধ সুজাতার নির্মলতা জ্ঞাত হয়ে তাঁকে প্রাণস্পর্শী ধর্মোপদেশ প্রদান করলেন। ঐ উপদেশ শ্রবণ করে পরিণত বোধশক্তি সম্পন্ন সুজাতা সেইক্ষণে অর্হত্ব লাভ করেন। বুদ্ধকে বন্দনা করে গৃহে প্রত্যাবর্তনপূর্বক তিনি স্বামী ও স্বামীর পিতা-মাতার অনুমতি নিয়ে ভিক্ষুণীসঙ্ঘে প্রবেশ করলেন।[৫৭] সুজাতা স্বয়ং নিজে তা বর্ণনা করেছেন এভাবে ;

সুত্বা চ খো মহেসিস্স সচ্চং সম্পটিবিজ্ঝহং

তথেব ব বিরম্মং ধম্মং ফুস্যিং অমতং পদং।

ততো বিঞ্ঞাতসদ্ধম্মা পব্বজিং অনাগারিযং

তিস্সো বিজ্জা অনুপ্পত্তা অমোঘং বুদ্ধসাসনং।[৫৮]

অর্থাৎ, মহর্ষির উপদিষ্ট সত্য আমার মর্মস্পর্শ করলো। তখনই অমৃত পথ প্রদায়িনী ধর্মের পূর্ণ অনুভূতি হলো। এরূপে সদ্ধর্মের জ্ঞান লাভ করে আমি গৃহত্যাগ করলোাম। এখন ত্রিবিদ্যাই আমার জ্ঞাত। বুদ্ধ বাক্য অমোঘ।

জীবন অনিত্য। এ চিরসত্য বাক্যটি অনুধাবন করেছিলেন কৃশা গৌতমী। তিনি তাঁর সন্তান হারিয়ে বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণ করে বুঝতে পারলেন জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং অনিত্য। এখানে নিত্য বলতে কিছুই নেই। এ বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেন ; মৃত্যু পল্লীবিশেষের ধর্ম নয়। নগর বিশেষের ধর্ম নয়। কোনো বংশ বিশেষের ধর্ম নয়। স্বর্গ, মর্ত্য সর্ব জগতের জন্য এ ধর্ম-সর্ববস্তু অনিত্য।[৫৯]

সুতরাং, উপরি-উক্ত তথ্যের আলোকে বলা যায় যে, মনের রিপুসমূহকে সংযত করে পুরুষের পাশাপাশি ঐকান্তিক ইচ্ছা পোষণ করলে নারী বিমুক্তি সুখ লাভ করতে পারে। বুদ্ধশাসনে নারী-পুরুষের মধ্যে ভেদাভেদ বা কোনো পার্থক্য নেই। সবাই সাধনা বলে অর্হৎ হতে পারেন। তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

শিক্ষা-সংস্কৃতিতে নারী

বৌদ্ধসঙ্ঘে নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা বুদ্ধের জীবিতাবস্থায় আরম্ভ হয়েছিল তাতে কোনো রকম সন্দেহ নেই। বুদ্ধের সময়ে নারীও পুরুষের ন্যায় সঙ্ঘে জীবনযাপনের অধিকারিণী হয়ে সর্বোচ্চ শিক্ষা ও দান লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। নারী বা থেরীদের জীবনকাহিনি থেকে বোঝা যায় যে, পুরুষের পাশাপাশি ধর্ম, আধ্যাত্মিক সাধনা

Dhaka University Institutional Repository

এবং শাস্ত্র চর্চায় নারীদের অধিকার সম্পর্কে তেমন কোনো বিশেষ প্রভেদ ছিল না। এ বিষয়ে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় শুক্রার জীবনে। যে, সুক্কা (শুক্রা) ছিলেন একজন বিচিত্র ধর্মকথিকা, ধর্ম প্রচারিকা সর্বোপরি সুভাষিণী ছিলেন। তিনি দুর্বোধ্য, কঠিন ধর্ম মতবাদ অত্যন্ত সহজ-সরল, সাবলীল ভাষায় জনসাধারণের উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যা করতেন। উপস্থিত সকলেই তাঁর ধর্মোপদেশ অতি মনোযোগ সহকারে শোনতেন। অর্হত্ব প্রাপ্ত হয়ে তিনি পাঁচশত ভিক্ষুণী পরিবেষ্টিত হয়ে ধর্ম প্রচার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি অফুরন্ত যশ-খ্যাতি লাভ করতে সক্ষম হন।[৬০] তাছাড়া আরো দেখা যায়, ধর্মদিন্না গভীরজ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন। বুদ্ধ স্বয়ং তাঁর প্রশংসা করে প্রচারিকা ভিক্ষুণী সঙ্ঘের মধ্যে তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃতি প্রদান করেছিলেন। তিনি সাধনার সর্বোচ্চ মার্গে অবস্থান করে প্রীতিগাথা ভাষণ করেছিলেন। গাথাটি নিম্নরূপ ; 'যিনি সর্বান্তকরণে দুঃখমুক্তির কামনা করেন তিনি কখনো লোভ-দ্বেষ-মোহ-এর বশবর্তী হয়ে বিষয়াসক্ত হন না।[৬১]

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে ধর্মে, সমাজে, শাস্ত্রচর্চা বা রাজকীয় কার্যে রমণীগণের স্থান বিশেষ উচুঁতে ছিল তা নয়, তবে ধর্মচর্চায় তাদের স্থান অপেক্ষাকৃত উন্নতই ছিল বলা যায়। কারণ স্বামীর ধর্মচর্চায় তাদের সহায়ক হতে হতো। এজন্য স্ত্রী 'সহধর্মিনী নামেও অভিহিত হতো। এ বিষয়ে দেখা যায় ; রামায়ণ ও মহাভারতেও নারীর স্থান অনেকটা উচুঁতেই রাখা হয়েছে। তবে গৃহে-সমাজে বা ধর্মীয় ক্রিয়া-কলাপে ইহা সীমাবদ্ধ ছিল। বরঞ্চ বৌদ্ধশাস্ত্রে দেখা যায় যে, ধর্ম সাধনা ও শাস্ত্রচর্চায় পুরুষ ও স্ত্রীর অধিকার সম্বন্ধে বিশেষ কোনো প্রভেদ নেই।[৬২] শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও নারীরা পিছিয়ে ছিল না। বুদ্ধ নারীর স্বাধীনতা প্রদান ও তাদের ধর্মে অবস্থান সুদৃঢ় করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রখ্যাত বৌদ্ধ তত্ত্ববিদ্ T. W. Rhys Davids তাঁর Buddhism গ্রন্থে বলেন ;

> It affords a very instructive picture of the life they (Theris) led in the Valley of the Ganges in the time of the Gautama the Buddha. It was a bold step on the part of the leaders of the Buddhists reformation to allow so much freedom and to concede so high apposition to women.[৬৩]

বুদ্ধ শাসনে নারী

বুদ্ধ সবাইকে আপন মনে করতেন। সবাইকে একই ভাবে দেখতেন। উল্লেখ থাকে যে, নারীর প্রতি বুদ্ধের অপার করুণা ছিল, অপরিসীম মৈত্রী ছিল। তিনি তাঁর আশ্রয়ে বারবণিতা, নর্তকী, নিপীড়িতা, নির্যাতিতা, বিধবা, অবিবাহিতা, স্বামী পরিত্যক্তা এমন কি দাসী সবাইকে শাসনে প্রবেশের অধিকার দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে রাজা

Dhaka University Institutional Repository

বিম্বিসার পত্নী ক্ষেমা, শ্রেষ্ঠী কন্যা উৎপলবর্ণা, শ্রাবস্তীর রাজকুমারী সুমনা, মহাউপাসিকা বিশাখা, শ্রেষ্ঠা সুন্দরী নগররক্ষিতা আম্রপালি, রাজগৃহের বারবণিতার ব্যবসায় দীক্ষিত শালবতী, সিরিমা, বারাণসীর বারবণিতা সামা, কাশীর বারবণিতা অর্দ্ধকাশী, দাসীর মধ্যে অনাথপিণ্ডিকের ক্রীতদাসীর কন্যা পুন্না[৬৪] কোশম্বীর রাজমহিষী সামাবতীর খুজ্জুত্তরা[৬৫] 'মহাবংশ' নামক গ্রন্থে উল্লিখিত বীরণী দাসী[৬৬] শ্রাবস্তীর কোনো গৃহস্তের পত্নীর দাসী কালী[৬৭] সংসারের অভাব-অনটন প্রভৃতি নানারূপ যন্ত্রণা হতে পরিত্রাণ লাভের প্রত্যাশায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে ১. ইসিদাসী : তিনবার বিবাহ করেছিলেন, তিনবারই স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা ; ২. মুক্তা–বিবাহ হয় নিষ্ঠুর কুব্জোর সঙ্গে ; ৩. নন্দা–বিবাহের পূর্বক্ষণে মারা যায়, ৪. সুমঙ্গলা স্বামীর রান্নাঘরের অত্যাচারে অস্থির, ৫. শ্যামা–বন্ধুর মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত, ৬. উর্বরি–একমাত্র কন্যার মৃত্যুতে ধৈর্য্য হারান; ৭. পটাচারা–দুইপুত্র, স্বামী মাতা–পিতা ও ভ্রাতার মৃত্যুতে শোকগ্রস্থ ; ৮. বিধবা ছন্দা–দরিদ্রা, সবর্স্বহীনা ও নিঃসহায়ী ; ৯. বৈসিখি–পুত্রহারা ; ১০. কিসাগৌতমী–স্বামী ও পুত্রের মৃত্যুতে অধীন ; ১১. ভদ্রাকুণ্ডল কেশী–আত্মরক্ষার জন্য স্বামীকে হত্যা ; ১২. উৎপল বর্ণাসহ অন্যান্য আরো অনেকেই সংসারের পর্যাপ্ত ভোগসুখে মোহিত, লালিত-পালিত হয়ে ও নৈসর্গিক সুখের প্রত্যাশায় ভিক্ষুণী ধর্ম অবলম্বন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ধর্মা, অনোপমা, শুভা, রোহিনী এবং সুমেধা[৬৮] প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

গৌতম বুদ্ধের আর্বিভাবের ফলে ভারতীয় সমাজ ও ধর্মজীবনে নারীরা দাস প্রথা হতে মুক্ত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, অসহায় সুন্দরী মেয়েরা বারবণিতা থেকেও মুক্তি পায়। বুদ্ধ ভারতীয় নারীদের ভিক্ষুণী সঙ্ঘে স্থান দিয়ে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। এই অধিকার প্রতিষ্ঠার ফলে নারীরা যুগ প্রবাহে বৌদ্ধ দেশগুলোতে স্বীয় যোগ্যতা বলে সরকারী বেসরকারী পর্যায়ে শীর্ষ পদে অধিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। বৌদ্ধদেশ বার্মা, থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা, ভিয়েতনাম, কোরিয়া, জাপান, কম্বোডিয়া, চিন, প্রভৃতি দেশে অফিস, আদালত দোকানপাট সর্বত্র নারীর অবাধ বিচরণ দেখা যায়। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম সূচনালগ্নে নারীকে যে অধিকার দেওয়া হয়েছে তা কখনো ম্লান বা ক্ষুন্ন হয়নি বরং নারীর সে অধিকার ঘরে বাহিরে ব্যাপক আকারে সম্প্রসারিত হয়েছে। এতে সহজেই বোঝা যায়, মহামানব বুদ্ধের আর্বিভাব ও বৌদ্ধধর্মের উত্থান যে নারী জগতে এক নতুন অধ্যায়ের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যারা মুক্তিলাভ করেছিল তারা যে কেবল সাংসারিক জীবন থেকে মুক্ত হয়েছিল তা নয়, তাদের মুক্তি আরো উচ্চস্তরের, ঐ মুক্তি এত উচ্চ যে উহা অপেক্ষা উচুঁ আর কিছুই নাই-ইহা চিত্তের মুক্তি। ইন্দ্রিয়ের প্রভাব হতে কুসংস্কার হতে মুক্তি, তৃষ্ণা হতে মুক্তি এবং পুনর্জন্মের চক্র হতে মুক্তি।

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা পত্রের অনুচ্ছেদ : ২, এ নারী-পুরুষ প্রত্যেকেই সকল অধিকার ও স্বাধিকারে স্বত্ববানের কথা বলা হয়েছে।[৬৯] নারী সমাজের আর্থ-সমাজিক

Dhaka University Institutional Repository

উন্নতির লক্ষ্যে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান-এর ২৭ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান। আবার ২৮ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষ সমান অধিকার লাভ করবে। বর্তমান পৃথিবীতে নারীর অধিকার বিষয়ে সবাই সচেতন বুদ্ধ খ্রি. পূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে তাঁর জীবিতাবস্থায় তা উপলব্ধি পেরেছিলেন। শুধুমাত্র বর্তমান সময়ে নারীর সমান অধিকারের কথা বলা হচ্ছে তা নয়। আঠারো শতকে ইউরোপে উদারনৈতিক মানবতাবাদ ও যুক্তিবাদ এবং গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার সূচনা ঘটে যা ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯ খ্রি.) মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করে। বিশ্ব ইতিহাসে দেখা যায় বিপ্লবের দেশ ফ্রান্সেই সর্বপ্রথম নারীমুক্তির জন্ম হয় এবং ঙষুসঢ়ব ফব এড়ঁমবং নারীর অধিকার সম্বন্ধে একটি ঘোষণা প্রচার করা হয়। এখানে সতেরটি ধারায় নারীর অখণ্ডনীয়, স্বাভাবিক এবং পবিত্র অধিকার নির্দিষ্ট হয়।[৭০] এখানে প্রথম ধারাতেই বলা হয়েছে নারী স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করে ; মানুষের ও নাগরিকের অধিকারে সে পুরুষের সমান। নারী অধিকার আদায়ের প্রবক্তা ছিলেন ইংরেজ নারী মেরি উলস্টোনক্রাফট এই নারী। তাঁর 'Vindictation of the Right of Women' গ্রন্থটি ১৭৯২ খ্রি. প্রকাশিত হয়। ফরাসি বিপ্লবের মূলমন্ত্র স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী যখন সমস্ত ইউরোপকে উত্তপ্ত করেছিল সেই পরিবর্তনশীল সময়ে তিনি তাঁর গ্রন্থে নারী-পুরুষের সাম্য এবং সমান অধিকার দাবি করেন[৭১]। ইংরেজ দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল নারীমুক্তি আন্দোলনের একজন অন্যতম সমর্থক ছিলেন। তিনি নারীদের পূর্ণ অধিকার ও স্বাধীনতা দেওয়ার আবশ্যকতা যুক্তি সহকারে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন ; আইনগতভাবে নারীকে পুরুষের অধীনে রাখা ঘোরতর অন্যায়। নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত প্রয়োজন।[৭২]

নারী-পুরুষ প্রকৃতির দুটি স্বতন্ত্র ও আলাদা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত একসত্তা বিশেষ। তবে, একজন অপর জনের সাথে অর্থাৎ উভয়েই এক-অপরের পরিপূরক। নারী-পুরুষের সম্পর্ক সর্বক্ষেত্রে সম-মর্যাদার, সম-অধিকারের, প্রভু-ভৃত্যে নয়। বস্তুত মানবসমাজের সকল প্রকার উন্নতি, মঙ্গল, কল্যাণ কামনা কেবল মাত্র পুরুষের দ্বারা সম্ভব নয় কখনো। বরং নারী-পুরুষের যৌথ উদ্যোগে মাধ্যমে হতে পারে বলে বেগম রোকেয়া বিশ্বাস করতেন।[৭৩] বিংশশতকে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) কেবল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে নয় বরং তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন সকল প্রকার সামাজিক কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, সাম্প্রদায়িকতা, অন্যায় এবং অবিচারের বিরুদ্ধে। তিনি স্বদেশপ্রেম মানবিকতার জয়ধ্বনি করেছেন। তাছাড়া নারীমুক্তিরও একনিষ্ট দৃঢ় সমর্থক ছিলেন তিনি । সকল প্রকার মঙ্গলময় ও শুভকাজের পিছনে রয়েছে নারীর অনবদ্য ও অসামান্য অবদান। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'নারী' শীর্ষক কবিতায় দেখা যায় ;

সাম্যের গান গাই-
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোন ভেদাভেদ নাই।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
কোন কালে একা হয়নি ক' জয়ী পুরুষের তরবারী,
প্রেরণা দিয়েছে, শক্তি দিয়ে বিজয়ী লক্ষ্মী নারী।[৭৪]

বাঙালি নারী জাগরণে অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করেন রাজিয়া খাতুন (১৯০৭-১৯৩৪)। তিনি 'সওগাত' পত্রিকায় নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় বলেন ; আগে মানুষ পরে জননী, ভগ্নি, দ্বারা, সূত। মনুষ্য পদবাচ্য হতে হলে সবকিছুর অধিকার নারীকে পেতেই হবে'।[৭৫]

উপরি-উক্ত উক্তিটি বুদ্ধের উপদেশেরই অনুসরণ ও অনুকরণ মাত্র। বুদ্ধ ছিলেন নারীমুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত। নারীকে সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বুদ্ধ সমতার ভিত্তিতে সমাজে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন। তিনি বিশ্বে প্রথম নারী সংগঠন (ভিক্ষুণী সঙ্ঘ) গঠন করে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তাতে কোনো রকম সন্দেহ নেই। বর্তমান সময়ে নারী জাগরণের যে আন্দোলন আমরা দেখতে পাই তা আজ থেকে আড়াই হাজার বছরেরও অনেক আগে বুদ্ধ তা প্রজ্ঞাময় জ্ঞানে সম্পন্ন করেছিলেন।

সবশেষে বলা যায়, মানবাধিকার শব্দটি গভীর তাৎপর্যময়। গৌতম বুদ্ধ তাঁর প্রচারিত ধর্ম মতবাদে এ মানবাধিকারের কথা বলেছেন। তিনি জাতি-গোত্র-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে এক করে দেখেছেন। সকলের সমান অধিকারের কথা বলেছেন। জন্মগত অধিকারকে তিনি অস্বীকার করে কর্মাধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর ধর্মে নারী-পুরুষ সকলেই সমান। সবার রয়েছে এখানে সমঅধিকার ।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা ও তথ্য নির্দেশিকা

১. গয়া : পূর্ব ভারতের বিহার প্রদেশের গয়া নগর প্রাচীনকালে উত্তরে রামশিলা পর্বত এবং দক্ষিণে ব্রহ্মযোনি পর্বতের মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল (Journal of Asitic Society of Bengal, PP. 676-80)। এ সময় নগরটি সাহেবগঞ্জের দক্ষিণ অংশ নিয়েই গঠিত ছিল। বর্তমানে এটি উত্তর এবং দক্ষিণ উভয় অংশ নিয়েই গঠিত (Geography of Early Buddhism, P. 26)। গয়া শহর হতে প্রায় ছয় মাইল দক্ষিণে বুদ্ধগয়া অবস্থিত (The Travels Fa-Hien, P. 87)। এখানে বোধিবৃক্ষের নীচে মহাজ্ঞানী বুদ্ধ বুদ্ধত্ব বা সম্বোধি লাভ করেন। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন (বাংলাদেশ, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ, নেপাল, ভূটান, চিন, জাপান, কোরিয়া, থাইল্যাণ্ড, মায়ানমার, তাইওয়ান, হংকং, লাওস, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, মালয়েশিয়াসহ) দেশ থেকে পর্যটক ও তীর্থযাত্রীর আগমনে গয়া এক শ্রেষ্ঠ স্থানে পরিণত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্থাপত্যিক কারুকার্যমণ্ডিত নয়নাভিরাম বৌদ্ধবিহার রয়েছে যা সহজে সবাইকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম। হিউয়েন সাঙ গয়া শহরের ৬/৭ লি (প্রায় এক মাইল) দক্ষিণ পশ্চিমে গয়াশীর্ষ (গয়া পর্বত) এবং তার উপর এক অশোক স্তূপ লক্ষ্য করেন। তার মতে, নৈরঞ্জনা নদী থেকে বুদ্ধ গয়ার দূরত্ব দুই লি। (Tomas Watters ed. Vol-ii, P. 110)

২. L. M Joshi, Studies in Buddhist Cultures of India (Delhi: 1967), P. 368

৩. বেলু রানী বড়ুয়া অনূদিত, থেরী গাথা, (ঢাকা : ২০০৪), পৃ. ২৫

৪. I. B Horner, Women under Primative Buddhism (Delhi: 2007), P. 1-২

৫. P Lakshmi Narasu, The Essence oF Buddhism (Delhi: 1948), P.122

৬. প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, বুদ্ধের অভিযান (কলিকাতা : ১৩৯৭), পৃ. ১২

৭. সাহিত্য পত্রিকা, চল্লিশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১৮৩

৮. বেলু রানী বড়ুয়া অনূদিত, থেরী গাথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

১০. শ্রী শীলালঙ্কার মহাস্থবির, ধম্মপদট্ঠকথা, প্রথম খণ্ড (কোলকাতা : ২০১০), পৃ. ২০

১১. শ্রী ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত, জাতক, ষষ্ঠ খণ্ড (কলিকাতা : ১৩৯১), পৃ. ১-১৯

১২. শ্রী ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত, জাতক, পঞ্চম খণ্ড (কলিকাতা : ১৩৯১), পৃ. ৬৬-৭৪

Dhaka University Institutional Repository

১৩. তস্‌সা দেয্যধম্মং দদমানো কহাপণপুরাণি পঞ্চ সকটসতানি অদাসি, সুবণ্ণভাজন পূরাণি পঞ্চ, রজতভাজনপূরাণি পঞ্চ, তম্বভাজনপূরাণি পঞ্চ, পক্কুণ্ণবথকোসেয্যবত্থ পূরাণি পঞ্চ, সপ্পিপূরাণি পঞ্চ, তেলপূরাণি পঞ্চ, সালিতণ্ডুলপূরাণি পঞ্চ, নঙ্গলফালাদি-উপকরণপূরাণি পঞ্চ সকটসতানি অদাসি। [অধ্যাপক ড. সুকোমল চৌধুরী অনূদিত, ধম্পদট্‌ঠকথা, তৃতীয় খণ্ড, বিসাখাবত্থু (কোলকাতা : ২০১০), পৃ. ১৮৫-১৮৬]

১৪. ক. অন্তো অগ্গিম্‌হি নিব্বুতে বাহিরতো অগ্গিং অনাহরিতুংতি ;

খ. বাহরিতো অগ্গি ন অন্তো পবেসেতব্বোতি ;

গ. যে দদন্তি তেসং যেব দাতব্বংতি ;

ঘ. যে ন দেন্তি তেসং ন দাতব্বতি ;

ঙ. দদন্তস্‌সাপি অদদন্তস্‌সাপি দাতব্বংতি ;

চ. সুখং নিসীদিতব্বংতি ;

ছ. সুখং ভুঞ্জিতব্বংতি ;

জ. সুখং নিপজ্জিতব্বতি ;

ঝ. অগ্গি পরিচরিব্বোতি ;

ঞ. অন্তোদেবতা নমসসিতব্বাতি।

[অধ্যাপক ড. সুকোমল চৌধুরী অনূদিত, ধম্পদট্‌ঠকথা, তৃতীয় খণ্ড, বিসাখাবত্থু (কোলকাতা : ২০১০), পৃ. ১৯৮-২০০]

১৫. সুভূতিরঞ্জন বড়ুয়া, বৌদ্ধ মহয়িসী নারী (কলিকাতা : ১৪০০), পৃ. ৭৪

১৬. S. C Roy Choudhury, Cultural and Economical History of India (Delhi: 1974), P. 81

১৭. Pidiville Piyatissa, An Exposition of Buddhism (Taiwan: 1995), P.44

১৮. ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, থেরী গাথা (তাইওয়ান : ২০০৬)

১৯. শীলালঙ্কার মহাস্থবির, বুদ্ধ যুগে বৌদ্ধ নারী (কলিকাতা : ১৩৯৭ বাংলা), পৃ. ১১০-১১২

২০. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত 'থেরী গাথা'।

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. চ

Dhaka University Institutional Repository

২২. ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, দীর্ঘ নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড (কলিকাতা : ১৩৬১), পৃ. ১৫৯

২৩. সুভূতি রঞ্জন বড়ুয়া, বৌদ্ধ মহিয়সী নারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২-১৭৪

২৪. সাধনানন্দ মহাস্থবির, সুত্ত নিপাত (বান্দরবান : ২০০৭), পৃ. ১৭৭

২৫. থেরী গাথা, গাথা সংখ্যা-৩২৭

২৬. বিজয় মজুমদার অনূদিত, থেরী গাথা, পৃ. ৪৭

২৭. সত্যপ্রিয় মহাথের অনূদিত, চূল্লবর্গ (রাঙ্গামাটি : ২০০৩) পৃ, ৫৯৭

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৮

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৯

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৯

৩১. প্রাগুক্ত,পৃ. ৬০০-৬০০১

৩২. সম্বোধি ভিক্ষু অনূদিত, থেরী গাথা অট্ঠকথা (রাঙ্গামাটি : ২০১০), পৃ. ১৩০ ; সুমঙ্গল বড়ুয়া অনূদিত, অঙ্গুত্তর নিকায়, চতুর্থ খণ্ড (রাঙ্গামাটি : ২০০৫), পৃ. ২৬৬-২৭১ ; সত্যপ্রিয় মহাথের অনূদিত, চূল্লবর্গ (রাঙ্গামাটি : ২০০৩) পৃ, ৬০০-৬০১

৩৩. ড. প্রণব কুমার বড়ুয়া, গৌতম বুদ্ধ জীবন ও দর্শন (ঢাকা : ২০১২) পৃ. ৭৭

৩৪. Durga M Bhagvat, Early Buddhist Jurisprudence (Poona: 1939), P. 163

৩৫. William R Lafleur, Buddhism: A Culture Perspective (New jersey: 1988), P. 53

৩৬. রাজগুরু শ্রীমৎ ধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির অনূদিত, মহাপরিনিব্বানং সুত্তং (চট্টগ্রাম : ১৯৫৪), পৃ. ১৩০

৩৭. Lean Fear and Mrs Rhys David Ed, Samyutta Nikaya, Vol-iv (London: 1904), 374

৩৮. বেলু রানী বড়ুয়া অনূদিত, থেরী গাথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

৩৯. G. C Dev. Buddha the Humanist (Karachi Lahore Dhaka : 1967), P. 49

৪০. অর্হৎ : এটি অর্থবোধক শব্দের নাম যার পালি নাম হলো 'অরহত'। বিভিন্ন নামে এটি পরিচিত। যেমন : যিনি লোভ-দ্বেষ-মোহরূপ ত্রিবিদশত্রুকে বিনাশ করে সম্পূর্ণরূপে অলোভ-অদ্বেষ-অমোহ প্রযুক্ত বা প্রাপ্ত হয়েছেন তিনিই অর্হৎ। যিনি সর্ব প্রকার আসক্তি ক্ষয় করে অনাস্রব হয়েছেন তিনি অর্হৎ। যিনি সংসারের প্রতি বিরাগবশতঃ পুনর্জন্ম ক্ষয় করেছেন তিনিই অর্হৎ। যিনি নিবৃত্তির সাধনায় সিদ্ধ হয়ে নির্বাণে অবস্থিতি করেন

Dhaka University Institutional Repository

তিনিই অর্হৎ নামে খ্যাত হন। (পালি-বাংলা অভিধান, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ.২১১) অর্হৎ মাত্রই দুঃখমুক্ত হন। এ বিষয়ে সুত্তপিটকের ধম্মপদ নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে ;

গতদ্ধিনো বিসোকস্স বিপ্পমুত্তস্স সব্বধি

সব্বগন্থপ্পহীনস্স পরিলাহো ন বিজ্জতি। অরহতোবগ্গ/১

অর্থাৎ, যিনি সংসার পথ অতিক্রম করেছেন, বিগতশোক, সর্বতোভাবে বিমুক্ত এবং সকল প্রকার গ্রন্থি বা স্কন্ধ নিঃশেষ হয়েছে, তাঁর দুঃখ প্রদাহ থাকে না।

যস্সাসবা পরিক্খীণা আহারে চ অনিস্সিতো

সুঞ্ঞতো অনিমিত্তো চ বিমোক্খো যস্স গোচরে

আকাসে'ব সকুন্তানং পদং তস্স দুরন্নযং। অরহতোবগ্গ/৪

অর্থাৎ, যাঁর আসবসমূহ (কাম, ভব, দৃষ্টি ,অবিদ্যা) ক্ষীণ হয়েছে, যিনি আহারে অনাসক্ত, শূন্যতা ও অনিমিত্তরূপ বিমোক্ষ যাঁর অধিগত হয়েছে, আকাশে উড্ডীয়মান পাখির পদাঙ্কের মতো তাঁর গতিও দুর্জ্ঞেয়।

৪১. I. B Horner, ibid, P. 163

৪২. ধর্মাধাপর মহাস্থবির অনূদিত, মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খন্ড (কলিকাতা : ১৩৯৪ বাংলা), পৃ. ১২১-১২৭

৪৩. বেলু রানী বড়ুয়া অনূদিত, থেরী গাথা, প্রাগুক্ত, ৪৭

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ.৬১

৪৬. প্রাগুক্ত, ৪৯

৪৭. বেলু রানী বড়ুয়া অনূদিত, থেরী গাথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০-৭১

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ.৭৩-৭৪

৫০. বেলু রানী বড়ুয়া অনূদিত, থেরী গাথা, প্রাগুক্ত, ৮৫-৮৬

৫১. প্রাগুক্ত, ১২২-১২৩

৫২. প্রাগুক্ত, ৮৬-৮৭

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

Dhaka University Institutional Repository

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

৫৫. অভ্যন্তর জাতক, ২৮১

৫৬. জাতক, সংখ্যা-৩০১

৫৭. ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, থেরী গাথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

৫৯. ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, থেরী গাথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫-৩৭

৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

৬৩. T. W Rhys Davids, Buddhism (London: 1910), P. 72

৬৪. বিমলা চরণ লাহা, বৌদ্ধ রমনী (কলিকাতা : ১৯৯৮), পৃ. ২১

৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

৬৮. ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, থেরী গাথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮, ১৪, ১৮, ২৬, ৩৩, ৫৮, ৬৩, ৮৩, ১০২, ১০৭, ১২০, ১৩৭, ১৫১, ১৬১

৬৯. মানবাধিকারের ভাষ্য, গাজী শামছুর রহমান (ঢাকা : ১৯৯৪), পৃ. ৩৮

৭০. মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন সম্পাদিত, বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ (স্পোশাল ভলিউম), ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৫২৪

৭১. তাহ্‌মিনা আলম, বাংলার সাময়িকপত্রে মুসলিম নারী সমাজ, ১৯০০-১৯৪৭ (ঢাকা : ১৯৯৮), পৃ. ১৩৯

৭২. Hasan Joarder and Safiuddin Joarder, Begum Rokeya: The Emancipator, Nari Kalyan Sangstha (Dhaka : 1980), P. 3

৭৩. সেলিনা বাহার জামান সম্পাদক, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন স্মারক গ্রন্থ (ঢাকা : ২০০২), পৃ. ৬৫

৭৪. কাজী নজরুল ইসলাম, সঞ্চয়িতা, ত্রয়োদশ সংস্করণ (কলকাতা : ১৩৭১), পৃ. ৮৪-৮৬

৭৫. রাজিয়া খতুন, সমাজে ও গৃহে নারী স্থান, সওগাত ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৩৪ বাংলা, ১৯২৭, পৃ. ২৩

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

মানব কল্যাণে বুদ্ধের পঞ্চশীল

মানবকল্যাণ ব্যাপক ও বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত। মানবকল্যাণ বলতে মানবকেন্দ্রিক কল্যাণকে বোঝায় যেখানে মানুষের সকল প্রকার মানবিক মর্যাদা কিংবা মর্যাদাবোধের কথা গভীরভাবে অনুরণিত হয়। পরস্পর পরস্পরকে প্রেম-প্রীতি, পরস্পর মঙ্গল, কল্যাণ ও শুভ চেতনাবোধের মাধ্যমে আবদ্ধ করাই হলো মানবকল্যাণের অন্যতম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। পৃথিবীতে মানবকল্যাণে যে কজন নিবেদিত প্রাণ ছিলেন তাদের মধ্যে বুদ্ধ অন্যতম। তিনি মানুষের কল্যাণ, উন্নতি এবং সুখ-সমৃদ্ধির জন্য যে সমস্ত নীতিকথা বলেছেন তন্মধ্যে পঞ্চশীল অন্যতম নয় শুধু সর্বাপেক্ষা উত্তমও বটে। সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠায়, নৈতিক আচার-আচরণ সমৃদ্ধিকরণে, সুন্দর-বিশুদ্ধ জীবনযাপনকরণে এবং সামাজিক মর্যাদাবোধ প্রতিষ্ঠায় এটাকে পারিবারিক আচার-আচরণ সমন্বিত বিনয়বিধানও বলা হয়।

মানবতার বিকাশে সদাচরণ অনুশীলন একান্ত করণীয়। কেননা, সুন্দর আচার-আচরণ ও ব্যবহারের মাধ্যমে চরিত্র কলুষমুক্ত পুত-পবিত্র হয়। আর জীবন হয় সুখের। চরিত্রগঠনের সেই নিয়ম প্রণালীকে বুদ্ধ পঞ্চশীল নামে অভিহিত করেছেন। মানবচরিত্রের উৎকর্ষ সাধনে এগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। বিশ্বমানবতার মহাকল্যাণে বুদ্ধ পঞ্চশীলের প্রবর্তন করেন।

শীলের সংজ্ঞা

পালি সাহিত্যে শীলের বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে। পালি 'সীল' শব্দের-এর বাংলা শব্দগত অর্থ হলো 'শীল'। এটার প্রয়োগও বাংলাভাষায় তেমন বেশী প্রচলন নেই বললেও চলে। তবে, বৌদ্ধধর্মে শীলের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এটাকে নৈতিক চরিত্রগঠনে অন্যতম উপায় বলা হয়। এখানে 'শীল'-এর সচরাচর অর্থসমূহ হলো : স্বাভাবিক অবস্থা, স্বভাব, অভ্যাস, নৈতিক চরিত্রের অভ্যস্ত কর্ম, সচ্চরিত্র-অভ্যাস, সদাচার, নৈতিক অনুশীলন, ন্যায়-পরায়ণতা, নৈতিকতা, ধার্মিকতা, সততা ইত্যাদি[১]। তাছাড়া সত্যের সাথে উপযোগিতা, শারীরিক বা মানসিক গঠন, আচার-ব্যবহার, বিশিষ্ট গুণধর্মও বোঝায়।।[২] 'বিমুক্তি মার্গ' নামক গ্রন্থে[৩] উক্ত হয়েছে ; 'শীল' অর্থ শীতলতা, উচ্চতর সৎগুণ, কর্ম স্বভাব এবং দুঃখ ও প্রীতি প্রকৃতির স্বাভাবিক অবস্থা। 'শীল' বলতে সেই সকল চেতনা এবং মানসিক অবস্থা বোঝায় যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি অকুশল কিংবা পাপময় কাজ থেকে বিরত থেকে সম্যক কর্ম ও সম্যক বাক্যে ও অনুশীলনের দ্বারা সৎপথ অনুসরণ করতে সক্ষম হয়[৪]। আমাদের শরীরে রক্ত প্রবাহের জন্য অনেক শিরা রয়েছে। সেই শির বিচ্ছিন্ন হলে যেমন মানুষ বাঁচে না। তেমনি শীলবিহীন দুঃশীল ব্যক্তিও মরণের

Dhaka University Institutional Repository

সমতুল্য। তাই এই অর্থে শীলের অপর নাম হলো 'শির'।[৫] এখানে শীলকে 'শির' অর্থাৎ মস্তিষ্কের সাথে তুলনা করা হয়েছে। 'Pali-English Dictionary' অভিধানে 'শীল'-এর অর্থ করা হয়েছে ; moral practice, good character, Buddhist ethics, code of morality.[৬]

শীল সম্পর্কে পণ্ডিতদের অভিমত

বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্নভাবে শীল বিষয়ে তাদের মূল্যবান ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন তন্মোধ্য কয়েকজনের মন্তব্য তুলে ধরা হলো। যেমন :

বিশিষ্ট্য বৌদ্ধ পণ্ডিত আচার্য অশ্বঘোষ শীল সম্পর্কে 'সৌন্দরানন্দম' নামক গ্রন্থের[৭] ত্রয়োদশ সর্গ-এর ছাব্বিশ এবং আটাশ নং সংখ্যক শ্লোকে বলেন ;

অহ্নল্লেখস্য মনসঃশীলং তূপনিষচ্ছুচি

অতঃশীলং নয়ত্যগম্যমিতি শীলং বিশোধয়ং। ১৩/২৬

অর্থাৎ, গ্লানির অভাব থেকে মনের মুক্তি নির্ভর করে শীলের উপর। শীলকে পবিত্র মনে করো, মনে রেখো শীলই অগ্রগতির পথে সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী।

শীলং হি শরণং সৌম্য কান্তার ইব দৈশিকঃ

মিত্রং বন্ধুশ্চ রক্ষা চ ধনং চ বলমেব চ। ১৩/২৮

অর্থাৎ, শীলই একমাত্র আশ্রয়। সংসার অরণ্যে পথ প্রদর্শক, শীলই বন্ধু, আত্মীয়, রক্ষক, ধন এবং শীলই শক্তি। শীলকে পরম যত্ন সহকারে রক্ষা করা উচিত।

সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ তত্ত্ববিদ S. Phongsawsdi-এর পারিবারিক সম্প্রীতি রক্ষার অন্যতম বই 'The Warm Hearted Family' নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে ; শীলের প্রকৃত অর্থ মানবের প্রকৃতির মধ্যে তা নিবিড় এবং গভীরভাবে সংরক্ষণ এবং নিজের এবং অপরের কষ্ট আনয়নে বিরতি।[৮] 'সংযুক্ত নিকায়' নামক গ্রন্থে দেখা যায় ; 'শীল হচ্ছে স্নান তীর্থ, যেখানে স্নাত হয়ে পরাজ্ঞানের পারপ্রাপ্ত ঋষিগণ অসিক্ত দেহে নির্বাণের পারে উত্তীর্ণ হন'[৯]।

বিশিষ্ট্য বৌদ্ধ পণ্ডিত নারদ থের শীল সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন ;

Dhaka University Institutional Repository

> Morality (Sīla) is only the preliminary stage and is a means to an end, but not an end in itself, though absolutely essential, it alone does not lead to one's deliverance or perfect purity. It is only the first stage on the path of purity. Beyond morality is wisdom. The base of Buddhism is morality, and wisdom is its apex. Wisdom is like unto man's eyes; morality is like unto his feet.[১০]

এ সম্পর্কে আরো দেখা যায় ;

> Morality in Buddhism is a rational and practical mode based verifiable facts individual experience, which is regarded as the one of the most perfect moral code known in the world[১১].

শীলের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আরো উক্ত হয়েছে ;

> One of the social levels, sila contributes to harmonious and peaceful coexistence among community members and consequently helps to promote social growth and development. In a society where morality prevails and members are conscious of their roles, there will be general security, mutual trust, and close cooperation, these in turn leading to greater progress and prosperity. Without morality there will be corruption and disturbance, and all members of society are adversely affected. Most of the problems that society experience today are connected, directly or indirectly, with a lack of good morality[১২].

সূত্র পিটকের অন্তর্গত 'ধর্মপদ' নামক গ্রন্থের অত্তবগ্গ (আত্মবর্গ)-এর ১৬৫ নং সংখ্যক শ্লোকে বিষয় সম্পর্কে আরো উল্লেখ রয়েছে[১৩] :

Dhaka University Institutional Repository

অত্তনা'ব কতং পাপং অত্তনা সঙ্কিলিস্সতি
অত্তনা অকতং পাপং অত্তনা'ব বিসুজ্ঝতি
সুদ্ধি অসুদ্ধি পচ্চত্তং নাঞ্ঞো অঞ্ঞং বিসোধযে।

অর্থাৎ, নিজের কৃত পাপ দ্বারা নিজেই ক্লেশ বা কষ্ট পায়, নিজে পাপ না করলে আবার নিজেই বিশুদ্ধ থাকে। শুদ্ধি এবং অশুদ্ধি সবই নিজের সৃষ্ট। কেউ কাউকে কখনো বিশুদ্ধ করতে পারে না।

শীলের লক্ষণ কথা

আচার্য বুদ্ধঘোষ 'শীলন' অর্থে 'শীল'-এর প্রয়োগ দেখিয়েছেন। এটি অভ্যাসগত ও অনুশীলন অর্থে ব্যবহৃত হয়।[১৪] 'মিলিন্দ প্রশ্ন' নামক গ্রন্থে[১৫] রাজা মিলিন্দ স্থবির নাগসেনকে শীলের লক্ষণ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে স্থবির নাগসেন বলেন ; সমস্ত কুশল ধর্মের প্রতিষ্ঠাই হলো শীলের লক্ষণ। শীলে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি মাত্রই শীলকে আশ্রয় করে, শীলের উপর ভিত্তি স্থাপন করে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবনা করেন। সকল প্রকার কুশলকর্মের আদিতে রয়েছে শীল। এ সম্পর্কে দুটি উপমা নিচে উপস্থাপন করা হলো।

> ক. যে কোনো বীজ-গাছপালা বৃদ্ধি, বিস্তার এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তারা সকলেই পৃথিবীকে আশ্রয় করে বিস্তার ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সেই প্রকার সাধক শীলকে অবলম্বন করে শীলে প্রতিষ্ঠত হয়ে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবনা করেন।[১৬]

> খ. নগর শিল্পী নগর নির্মাণ করার মানসে প্রথমে সেই স্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করায় ; খুঁটি-কন্টক অপসারণ করায় ; ভূমি সমতল করায়। তারপর রাস্তার নক্শা ঠিক করে নগর নির্মাণ করে। অনুরূপভাবে সাধক শীলকে অবলম্বন করে শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবনা করেন।[১৭]

মহত্ত্ব দ্বারা হীনতার অপসারণই হলো শীলের প্রধান লক্ষণ।[১৮] এটি শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের (বৌদ্ধ মতে গৃহী) জন্য বটে তা নয়, ভিক্ষু-শ্রামণদের জন্য অবশ্য পালনীয় একটি নিত্যকর্মও বটে। এক সময় শারিপুত্র ভিক্ষুদেরকে আহবান করে বললেন ; 'হে বন্ধুগণ ! শীলবানের শীলপালন হেতু সম্যক সমাধি উৎপন্ন হয়। সম্যক সমাধি উৎপন্ন

Dhaka University Institutional Repository

কাযপ্পকোপং রক্খেয্য কাযেন সংবুতো সিযা

কাযদুচ্চরিতং হিত্বা কাযেন সুচরিতং চরে।[২০]

অর্থাৎ, কায়িক আচার-আচরণ থেকে নিবৃত্ত থেকে সংযতকায় হবে এবং কায়িক দুশ্চরিত্রতা ত্যাগ করে সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হবে।

বচীপকোপং রক্খেয্য বাচায সংবুতো সিযা

বচীদুচ্চরিত হিত্বা বাচায সুচরিতং চরে।[২১]

অর্থাৎ, অপরের সাথে বাচনিক আচার-আচরণ থেকে নিবৃত্ত থেকে বাক্যে সংযত হবে এবং বাচনিক দুরাচার ত্যাগ করে বাক্যের মাধ্যমে সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হবে।

মনোপকোপং রক্খেয্য মনসা বাচায সংবুতো সিযা

মনোদুচ্চরিত হিত্বা মনসা সুচরিতং চরে।[২২]

অর্থাৎ, মানসিক উত্তেজনা থেকে নিবৃত্ত থেকে সংযত মনের অধিকারী হবে এবং মানসিক দুষ্কর্ম পরিত্যাগ করে সৎ ও সুন্দর কর্মে উৎসাহী হবে।

শীলের প্রকারভেদ

পালি কিংবা বৌদ্ধ সাহিত্য নানারকম শীল রয়েছে। যেমন : পঞ্চশীল, অষ্টশীল বা উপোসথ শীল, দশশীল, সমথ অষ্টশীল, সুচরিত শীল, প্রব্রজ্যা দশশীল, প্রতিজাগর উপোসথ শীল, প্রতিহারিয় উপোসথ শীল, চতুপরিশুদ্ধ শীল, ধুতাঙ্গশীল, ভিক্ষুশীল ইত্যাদি। মানুষ নিজেকে নীতিবান, আদর্শবান কিংবা সৎচরিত্রের অধিকারী হিসেবে গড়ে তুলতে চাইলে প্রথমেই তার দরকার সদাচরণ অনুশীলন। এই আচরণের ফলে চরিত্র যেমন সুন্দর হয় তেমনি আবার সেই যশ-খ্যাতিময় চরিত্রের সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বুদ্ধ গৃহীদের চরিত্রগঠনের সেই বিধি-বিধানকে নাম দিয়েছেন 'পঞ্চশীল' বা 'পঞ্চনীতি'। পঞ্চশীল বা পঞ্চনীতি সমূহ হলো :ক. প্রাণিহত্যা থেকে বিরতি ; খ. অদত্ত বস্তু গ্রহণ থেকে বিরতি ; গ. মিথ্যা কামাচার থেকে বিরতি ; ঘ. মিথ্যা বাক্য ভাষণ থেকে বিরত এবং ঙ. সুরা এবং মাধক জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত। উপরি-উক্ত পঞ্চশীলের মধ্যে প্রাণিহত্যা, চুরি না করা, ব্যভিচার করা বা পরদ্বার গমন করা এবং সুরা-মাদকজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ হলো কায়িক কর্ম। এ সমস্ত কর্ম সম্পাদনের মধ্য দিয়ে দিয়ে কায়িক পাপ সম্পাদিত হয়। মিথ্যাকথা বলা হলো বাচনিক পাপ।

Dhaka University Institutional Repository

হেতু যথাভূত জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হয়। যথাভূত জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হেতু নির্বেদ-বিরাগ উৎপন্ন হয়। নির্বেদ-বিরাগ উৎপন্ন হেতু বিমুক্তি জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হয়'।[১৯] শীলের মূলভিত্তি ভূমি হলো মন বা চিত্ত। শীল কায়-বাক্য এবং মনোময় কর্মের মাধ্যমে প্রতিপালিত হয়। শীলপালনের দ্বারা মনের লোভ-দ্বেষ-মোহ নির্বাপিত হয়। তাই শীলের অপর নামকে দমগুণ বলা হয়। ক্রোধ, দ্বেষ, কপটতা, চঞ্চলতা, লোভ, ঈর্ষা, প্রতারণা, ধূর্ততা, প্রতিহিংসা, তর্কপ্রিয়তা, অহঙ্কার, আত্মশ্লাঘা, ঔদ্ধত্য, অবহেলা, আলস্য, কামপ্রবৃত্তি, অল্পে অতৃপ্তি, পণ্ডিত সংসর্গ বর্জন, স্মৃতিহীনতা, কর্কশবাক্য বলা, অসৎ সংসর্গ গ্রহণ, মন্দজ্ঞান, পাপদৃষ্টি, অসহিষ্ণুতা, অশ্রদ্ধা, অশিষ্টতা, অশ্লীলতা, কায়-বাক্যে ও মনে অসংযত, অসভ্যতা, আচার্যের প্রতি অসম্মান, ইন্দ্রিয় সংযমে অনভ্যাস ইত্যাদি শীলের প্রধান অন্তরায় হিসেবে কাজ করে।

ব্যক্তিগত এবং সমাজজীবনকে কর্মপ্রভাব নিয়ন্ত্রণ করে যার মধ্যে যাবতীয় কুশলকর্ম আশ্রয় লাভ করে মানবিকতা ও নৈতিকতা বৃদ্ধি পায়। মানুষের স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার, আদব-কায়দা দেখে একজন মানুষকে চেনা যায় এবং জানা যায়। অনুরূপভাবে মানুষের আচার-আচরণ ও স্ভাব-প্রকৃতি দেখে তার মধ্যে শীল বিরাজমান রয়েছে কিনা তা অবহিত হওয়া যায়। শীলের অভাবে শুধু ব্যক্তি নয়, পরিবার, পাড়া, সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা হতে পারে কিংবা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তাই বৌদ্ধধর্মে শীলকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছে। নৈতিকতায় এবং সৎকর্ম সম্পাদনেও এটি প্রধান সহায়করূপে কাজ করে। বলা যায়, সুপ্রাচীন কালের সামাজিক রীতিনীতি ও আচরণের প্রধান ভিত্তি হলো 'শীল'।

পৃথিবীতে যে সকল প্রাণী রয়েছে তাদের আচার-আচরণে ও বৈশিষ্ট্যে একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ হলো মানুষ। তাই মানুষকে সহজেই আলাদা করা যায়। তারমধ্যে রয়েছে কিছু সংস্কার, মূল্যবোধ, মানবিক গুণ ও সর্বোপরি শীল বা নৈতিকতা। আমরা জানি, মানুষের মধ্যে দুটো দিক রয়েছে : একটি হলো মানবিক গুণ এবং অপরটি হলো পাশবিক গুণাগুণ। মানবিক গুণসমূহ মানুষকে মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে এবং সকল প্রাণী থেকে আলাদা মর্যাদায় অভিষিক্ত করে। অথচ এরই বিপরীত দিকে যে পাশবিক গুণাগুণসমূহ রয়েছে সেগুলো পশুর সঙ্গে তুলনীয়। পাশবিক, খারাপ কিংবা অকুশল গুণগুলো মানুষকে ধীরে ধীরে পাশবিক হতে সাহায্য করে। মানুষের উচিত নিজের সৎ, সুন্দর মহত্ত্বতম মানবিক গুণগুলো দিয়ে পাশবিক গুণগুলোকে দমন করা। তাই সম্ভব হলেই তবেই সমাজজীবনে সকলের নিকট আচার-আচরণ ও ব্যবহার সুন্দর হয় সর্বত্র প্রশংসা লাভ করে। বুদ্ধ হিংস্র ও পশু স্বভাবকে মন থেকে চিরতরে বিদূরিত করার কথা বলেছেন, বলেছেন মানবিক চরিত্রগঠনের কথা এবং বলেছেন উন্নত জীবনযাপনের কথা। সুপ্রসিদ্ধ 'ধম্মপদ' নামক গ্রন্থের ক্রোধবর্গে এ বিষয়ে দেখা যায় :

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চশীল সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিতদের অভিমত

বিভিন্ন পণ্ডিত নানাভাবে পঞ্চশীলের প্রশংসা করে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এখানে কয়েকটি মন্তব্য উপস্থাপন করা হলো।

ক. পঞ্চশীল বা পঞ্চনীতি মানব জীবনের আদর্শ এবং মনুষ্যত্ব বিকাউকে মূলমন্ত্র। তা থেকে স্খলিত হলেই আর মনুষ্যত্ব থাকে না। সে হয় মনুষ্যনীতি বিবর্জিত চরিত্রহীন মানুষ।[২৩]

খ. সংসারের যাবতীয় দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ ও অশান্তি উপদ্রবের মূল কারণ হলো যথাযথভাবে পঞ্চশীল পালন না করা। এই নীতিসমূহ হতে বিরত না হলে মানবতার বিকাশ আদৌ সম্ভব নয়। এই কারণে মানবতার অগ্রগতির জন্য কার্যকরী পন্থারূপে বুদ্ধ যে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন পঞ্চশীল প্রত্যেকেরই অবশ্য পালনীয় প্রাথমিক কর্তব্য।[২৪]

গ. আমরা যদি পঞ্চশীলের সবগুলো শীলপালন করতে পারি তবেই আমরা মানুষ। এগুলো পালন করার মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করা উচিত। কেননা, এগুলো পালনে মানবাচরণ উন্নত হয় এবং ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়। সমাজে শান্তি ও সুখের জন্য এগুলো পালন করা অপরিহার্য।[২৫]

ঘ. পঞ্চশীল হলো সমগ্র মানবজাতির নৈতিকজীবন গঠনে অত্যন্ত উপাদেয় নীতি। পাঁচটি নীতির উৎকর্ষ সাধন করতে পারলে যে কোনো মানুষ সচ্চরিত্রের অধিকারী হয় এবং সুন্দর জীবন গঠনে সক্ষম হয়। এটি হলো আদর্শ জীবনশৈলী, সর্বজনীন কল্যাণপ্রদ আচার সংহিতা।[২৬]

ঙ. Buddhism is the most profound and wholesome education directed by the Buddha towards all people. Five precepts are the curriculum of Buddhist teaching, which are embraced in moral code of Buddhism. By observing precepts, not only do cultivate your moral strength, but you also perform the highest service to your fellow beings. [২৭]

Dhaka University Institutional Repository

চ. These precepts are not commandments imposed on us, but are on the other hand, the moral codes that we willingly undertake to observe out of clear understanding and firm conviction that they are good for ourselves as well as for our society. Our life would be truly happy and our society would become a much safer and more peaceful place to live in these precepts is observed in earnest.[২৮]

ছ. These five silas are the basic principales of of Buddhistm known to most people. It is the customary for them to be deliveried during almost every religious ceremony and those present at the ceremonies generally make a formal declaration of their intention to comply with them.[২৯]

জ. These are the most meaningful activities one can embark upon in life-something truly gratifying and laudable.The precepts from the basis for everything good. Their essential character is one of non violation. For it is by not violating others that one can perfect the purity of the three karmas of body, speech and mind.[৩০]

পঞ্চশীলের স্বরূপ বিশ্লেষণ

নীতিশাস্ত্রের নীতিকথা বা নৈতিকথা সম্পর্কে কম বেশী সবারই জানা আছে। নীতিশাস্ত্রের যে বিধি-বিধানসমূহ মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণ ও ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করে বুদ্ধের পঞ্চশীলে সেগুলোকে কোনোভাবেই উপেক্ষা করা হয়নি। নীতিশাস্ত্রের যে দিকটি মানুষের মন বা চিত্তকে সুন্দরের পথে, কল্যাণের পথে সততার পথে নিয়ে যায় সেই দিকটার উপর গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। বুদ্ধ বলেন ; 'ইন্দ্রিয় বিজয় ও চরিত্র সংশোধন করে, দয়া-দাক্ষিণ্য মৈত্রীমূলক কল্যাণময় কর্মের মধ্যে দিয়ে শ্রেষ্ঠত্বকে অর্জন করো। এখানে আমরা সবাই জানি, চিত্ত স্পন্দনশীল, চঞ্চল, দূরক্ষণীয়। স্বভাবত কারণে চিত্ত চঞ্চল হয়। এটাকে নিজ আয়ত্বে আনা খুবই কঠিন। চিত্তের গতি বাতাসের গতির চেয়েও ক্ষিপ্র। চিত্ত বিপথগামী হলে পরম শত্রুর চেয়েও বেশী ক্ষতি করতে পারে। তাই চিত্তকে সংযত করা দরকার। সুপরিচালিত চিত্তই একমাত্র চিত্তকে সংযম করতে পারে। সুশাসিত চিত্ত মানুষের যে উপকার করতে

Dhaka University Institutional Repository

পারে, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কিংবা অন্য কেউ তা করতে পারে না।[৩১] জগতে যত প্রকার শক্তি রয়েছে তন্মধ্যে চিত্ত শক্তির কাছে অন্যান্য শক্তি কিছুই নয়। বুদ্ধ বলেন ;

কাযেন সংবুতা ধীরা অথো বাচায সংবুতো

মনসা সংবুতা ধীরা তে বে সুপরিসংবুতা।[৩২]

অর্থাৎ, যে সকল জ্ঞানী ব্যক্তি কায়ে সংযত, বাক্যে সংযত এবং মনে সংযত তাঁদের চিত্ত সত্যিই সুসংযত।

বাচানুরক্খী মনসা সুসংবুতো কাযেন চ অকুসলং ন কযিরা

এতে তযো কম্মপথে বিসোধযে আরাধযে মগ্গমিসিপ্পবেদিতং।[৩৩]

অর্থাৎ, বাক্যে সংযত কিংবা সংযমী হবে, মনকে সংযত রাখবে এবং কায়িক বা শরীর দ্বারা অকুশল সম্পাদন করবে না। জ্ঞানী, পণ্ডিত এবং উত্তম ব্যক্তি কর্তৃক প্রদর্শিত মার্গ অনুসরণ করবে এবং ত্রিবিধ কর্মপথ বিশুদ্ধ রাখবে।

কুশলপথ, সৎপথ বা সততার পথকে বুদ্ধ জীবনে সফলতা লাভের অন্যতম উপায় হিসেবে দেখিয়েছেন। 'দীর্ঘ নিকায়' নামক গ্রন্থের 'সংগীতি সূত্রান্তে' দশবিধ[৩৪] কুশল বা সৎপথের কথার উল্লেখ রয়েছে। এগুলো হলো : ক. প্রাণিহত্যা থেকে বিরতি ; খ. চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন থেকে বিরতি ; গ. ব্যভিচার থেকে বিরতি ; ঘ. মিথ্যাভাষণ কথন থেকে বিরতি ; ঙ. পিশুন বাক্য বলা থেকে বিরতি ; চ. কর্কশ বাক্য বলা থেকে বিরতি ; ছ. অসত্য বা বৃথা প্রলাপ থেকে বিরতি ; জ. অনভিধ্যা ; ঝ. অব্যাপাদ এবং ঞ. সম্যক দৃষ্টি বা সৎদৃষ্টি অর্থাৎ মিথ্যাদৃষ্টি পরায়ণ না হওয়া।

বলা যায়, উপরি-উল্লিখিত দশবিধ কুশলপথ-এর মাধ্যমে সমাজজীবনে কল্যাণ-সুখ-শান্তি আনা সম্ভব। কেননা, এগুলো মানবমনকে প্রতিনিয়ত কুশলকর্ম সম্পাদনে আগ্রহী করে তোলে। মানুষকে চরিত্রবান হতে শেখায়। সত্যবাদী হতে শেখায়। আপন আপন কর্তব্যে কর্মে অটল থাকার উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।

মানবকল্যাণে পঞ্চশীল

মানুষ সুন্দর কর্ম সম্পাদন এবং নৈতিক জীবনযাপনের মাধ্যমে নিজের জীবনকে মহিমান্বিত করে তোলে। একজন মানুষের মধ্যে নৈতিক গুণাবলী না থাকলে তিনি কখনো মানুষের পর্যায়ে পড়ে না। নীতি বা নৈতিকতা বিবর্জিত জীবন কখনো যথাযথ এবং মানবিক হয় না। মানুষ মাত্রই হুস আর জ্ঞান বা মনুষ্যত্ববোধ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। নৈতিক জীবনযাপনের মাধ্যমে তাকে সেগুলো অর্জন করতে হয়। মানবতার ক্রমবিকাশ সাধনে গৌতম বুদ্ধের

Dhaka University Institutional Repository

নীতিসমূহ বা আচরণ বিধিসমূহের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এগুলো পরিপালনে পরিবার ও সমাজে একে অপরের মাঝে মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ভোগবাদী চিন্তা চেতনা মানুষকে লোভ-দ্বেষ-মোহগ্রস্থ করে তোলে। ফলে নানারকম অপরাধ সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে দরকার পঞ্চশীলের প্রায়োগিক ব্যবহার। সমাজচিন্তক ও গবেষক অধ্যাপক যতীন সরকার বলেন ;

> আজকে যে ভোগবাদ দুরারোগ্য কর্কট রোগের মতো সমগ্র সমাজ দেহে ছড়িয়ে পড়েছে সেটি মানুষের দুঃখকে কেবল বাড়িয়ে দিচ্ছে। এর বিপরীতে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চূড়ান্ত ত্যাগী ও কৃচ্ছ্র সাধক হয়েও নিশ্চয়ই দুঃখের নিবৃত্তি ঘটবে না। এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, নির্বিচার ভোগ ও অর্থহীন ত্যাগের মধ্যবর্তী পথই সুবর্ণ পথ। সেই সুবর্ণ পথের পথিক হওয়ার জন্য প্রতিটি ব্যক্তিরই সঠিক প্রস্তুতির প্রয়োজন। পঞ্চশীল সাধনার মধ্য দিয়ে সম্ভব সেই প্রস্তুতি গ্রহণ।[৩৫]

বলা বাহুল্য যে, বুদ্ধ প্রবর্তিত নীতিসমূহ সকল বর্ণের, সকল গোত্রের কিংবা জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকলের এবং সর্বযুগের মানুষের চরিত্রগঠনে অপরিহার্য। সুখ-সমৃদ্ধিময়, শান্তিপ্রিয়, সমাজব্যবস্থায় আদর্শিক জীবনগঠনের জন্য বুদ্ধ এগুলোর প্রবর্তন করেন। শুধু তাই নয়, বিশ্বমানবতার মহাকল্যাণেও এগুলো মাইলফলক হিসেবে কাজ করে। গোত্র-সম্প্রদায় এবং জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে দেশ, রাষ্ট্র কিংবা সমাজের গণ্ডীর মধ্যে নিয়মনীতি বা আচরণ কিংবা বিধিগুলো কখনো সীমাবদ্ধ নয়। এগুলো সর্বজনীন এবং সর্বকালিক। যদি কেউ তা চলেন বা অনুসরণন করে তিনিই প্রকৃত মানুষ। তিনিই প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী হয়। নিচে পঞ্চশীল[৩৫/ক] সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা উপস্থাপন করা হলো :

ক. পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

অর্থাৎ, আমি প্রাণিহত্যা থেকে বিরত থাকার শিক্ষা গ্রহণ করছি।

খ. অদিন্নদানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

অর্থাৎ, আমি অদত্তবস্তু গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি। বা অপরের দ্রব্য চুরি করা থেকে বিরত থাকবো।

গ. কামেসু মিচ্ছাচারা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

অর্থাৎ, ব্যভিচার থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি। অর্থাৎ মিথ্যা কামাচার (অবৈধ যৌন

Dhaka University Institutional Repository

সর্ম্পক) হতে বিরত থাকবো।

ঘ. মুসাবাদ বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

অর্থাৎ, আমি মিথ্যা বাক্য বলা থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

ঙ. সুরামেরেয় মজ্জাপমদট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

অর্থাৎ, আমি মাদকজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

এখানে উল্লেখ থাকে যে, উপরি-উক্ত শিক্ষা বলতে উক্ত কাজগুলো না করার প্রত্যয় রপ্ত আয়ত্ব করার চর্যাবৃত্তিকে বোঝায়।

প্রথম শীল : পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি

ত্রিবিধ কায়িক অধর্মচর্যার মধ্যে প্রাণিহত্যা বিরতি প্রথম এবং প্রধান সোপান। 'পাণাতিপাতো' একটি অর্থবোধক পালি শব্দ। এটি 'পাণা' এবং 'অতিপাতো' শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। এখানে 'পাণা' অর্থ প্রাণী অর্থাৎ জীবনীশক্তি বোঝায়। 'অতিপাতো' অর্থ অকালে পতন বা আয়ুষ্কাল পূর্ণ না হতে দিয়ে অকাল জীবনীশক্তির ধক্ষংস সাধনকে বোঝায়। সুতরাং প্রাণিহত্যা বলতে সকল প্রকার হত্যাকে বোঝায়। যে কোনো ছোট-বড়-মাঝারি, উত্তম-মধ্যম, দূরে নিকটে, দৃশ্যমান-অদৃশ্যমান, হিংস্র-অহিংস্র, উৎপন্ন-অনুৎপন্ন সকল প্রাণিহত্যা থেকে বিরতি বোঝায়। বুদ্ধ প্রাণিহত্যার পাঁচটি অঙ্গ[৩৬] বলে অভিহিত করেছেন এভাবে ;

পাণোভবে পানসঞ্ঞী বধকচিত্তমুপক্কমো

তেন জীবিত নাসো চ অঙ্গা চ বধস্সামি।

অর্থাৎ, পাঁচটি অঙ্গ হলো : ক. প্রাণী, খ. প্রাণী বলে ধারণা, গ. হত্যা করার ইচ্ছা বা সঙ্কল্প গ্রহণ করা, ঘ. হত্যা করার নির্মিত্তে উপক্রম বা প্রচেষ্টা, এবং ঙ. নিজ হাতে কিংবা আদেশ প্রাপ্ত হয়ে হত্যা করা অর্থাৎ মৃত্যু।

উপরি-উক্ত, পাঁচটি অঙ্গ একই সাথে সম্পাদিত হলে তবেই প্রাণিহত্যা সম্পন্ন হয়। তাছাড়া এ বিষয়ে আরো উল্লেখ রয়েছে ;

যথাধিপ্পায আণত্তি তত্থ তং সম্পটিচ্ছনং

পটিঞ্ঞং অবিনাসেত্বা তথা'ব করণম্পি চ।

Dhaka University Institutional Repository

পযোগমং হেট্ঠা বুত্তেসু ছদ্দেত্বাসহ তেহি চ

ছলঙ্গাণত্তিযা হোতি পাণহিংসা তি দীপযে।[৩৭]

অর্থাৎ, ছয় প্রকারে অন্যের দ্বারা প্রাণিহত্যা সংঘটিত হয়। প্রাণিহত্যার অভিপ্রায়, উক্ত অভিপ্রায়কে কর্মে পরিণত করার ইচ্ছা (যার দ্বারা হত্যা সংঘটিত করার ইচ্ছা তার), অনুমতি লাভ, প্রাণী বলে ধারণা, হত্যা করার চেতনা, এবং হত্যা উপক্রম।

শুধু মানসিক হিংসা দ্বারা প্রাণীহত্য হয় না। প্রাণিহত্যা বলতে ইচ্ছাপূর্বক সুস্থ মস্তিস্কে যে কোনো প্রাণীর প্রাণসংহারকে বোঝায়। প্রাণী মাত্রই স্ব-স্ব জীবনকে ভালোবাসে। কেউ শাস্তি পেতে চায় না ; কেউ মৃত্যু কামনা করে না। এ প্রসঙ্গে 'ধম্মপদ' নামক গ্রন্থের দণ্ড বগ্গ (দণ্ডবর্গ)-এর ১২৯ নং সংখ্যক শ্লোকে উল্লেখ রয়েছে ;

সবেক্ষ তসন্তি দণ্ডস্স সবেক্ষ ভযন্তি মুচ্চনো

অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেয্য ন ঘাতযে।[৩৮]

অর্থাৎ, দণ্ডকে সকলেই ভয় পায়। সবাই মৃত্যুকে ভয় করে। সুতরাং নিজের সাথে তুলনা করে কাউকে হত্যা কিংবা আঘাত করা উচিত নয়।

প্রাণ থাকলে প্রাণী হয়। মানুষও প্রাণী। যদি মানুষ প্রাণী হয়ে বেঁচে থাকার অধিকার লাভ করতে পারে তবে অন্যান্য প্রাণীদেরও বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। সুতরাং কাউকে হত্যা করা হত্যায় উৎসাহিত করা অনুচিত। 'সুত্ত নিপাত' নামক গ্রন্থের[৩৯] ধম্মিক সুত্ত (ধার্মিক সূত্র)-এর ৩৯৬ নং সংখ্যক শ্লোকে দেখা যায় ;

পাণং ন হনে চ ঘাতয্যে ন চানুজঞ্ঞা হনতং পরেসং

সবেক্ষসু ভূতেসু নিধায দণ্ডং যে থাবরা যে চ তসা সন্তি লোকে।

অর্থাৎ, প্রাণিহত্যা করবে না ; প্রাণিহত্যার কারণ হবে না ; অন্যে হত্যা করলে তাও অনুমোদন করবে না ; জগতে ভীত ও নির্ভীক সকল প্রাণীর সমানভাবে দয়া পরায়ণ হয়ে দণ্ড পরিত্যাগ করবেন।

কোনো হত্যাই মানবিক হতে পারে না। লোভ-দ্বেষ বা হিংসা-মোহ সচরাচর মানুষকে জীব হত্যায় উদ্বুদ্ধ করে কিংবা উৎসাহিত করে তোলে। লোভ-দ্বেষ বা হিংসা মোহ ত্যাগ করে অপরিমেয় প্রেমের বিকাশ করতে হবে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন ; আমার বোধ হয় সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম জীবে দয়া। প্রেম হচ্ছে সমস্ত

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মের মূলভিত্তি।[৪০] বুদ্ধ দ্বেষ বা হিংসার অগ্নিস্ফলিঙ্গ ত্যাগ করে মানবের কল্যাণসাধনে প্রেমের বিকাশ সাধনের কথা বলেছিলেন। প্রাণিহত্যায় অকাল মৃত্যু হয়। এ বিষয়ে পালি বহির্ভূত সাহিত্যে উল্লেখ রয়েছে ;

সবেব্বাপভোগধনধঞ্ঞবিস্সেলাভী

রূপেন ভো সা মকরদ্ধজসন্নিভোপি

যো যোবক্ষনেপি মরণং লভতে অকামং

কামং পরত্থ পরপাণহরো নরোহি।[৪১]

অর্থাৎ, অপরের প্রাণ হননকারী ব্যক্তি মাত্রই পরজন্মে ধন-ধান্যে ধনকুবরেও রূপ সৌন্দর্য কন্দর্পতুল্য হয়েও অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা ভোগ না করেই অকাল মৃত্যু হয়।

বুদ্ধ প্রাণিহত্যা থেকে বিরত থাকার জন্য এ ধরনের অসংখ্য হিতোপদেশ দিয়েছেন। এক সময় শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিককে উপলক্ষ্য করে বুদ্ধ বলেন ; 'প্রাণিহত্যাকারী তার প্রাণিহত্যার দরুন ইহলোক-পরলোকে ভয়-বৈরব প্রসব করে এবং মানসিক দুঃখ বিষাদ ভোগ করে। প্রাণিহত্যা হতে বিরতজনের ইহলোক-পরলোকেও ভয়-বৈরব উৎপন্ন হয় না। মানসিক দুঃখ ও বিষাদ উৎপন্ন হয় না। প্রাণিহত্যা হতে বিরতজনের এরূপেই তেমন ভয়-বৈরব উৎপন্ন হয় না।[৪২] প্রাণিহত্যায় নিরুৎসাহিত হতে দরকার অপরিমেয় প্রেম বা সীমাহীন প্রেম। এখানে প্রেম বলতে সকলের প্রতি অপ্রমেয় ভালোবাসাকে বোঝানো হয়। প্রেমের কোনো রকম সীমাবদ্ধতা নেই ; কোনো কালাকোল নেই। সকল প্রকার সংকীর্ণতার উর্দ্ধে তার অবস্থান। হৃদয়ে প্রেমানুভূতি বা মৈত্রী চেতনা দ্বারা সকল প্রাণীর মঙ্গল বা কল্যাণ কামনা করা যায়। এতে মানুষের চিত্ত করুণায় সিক্ত হয়ে উঠে। জীবের প্রতি দ্বেষ বা হিংসার উদ্রেক হয় না। প্রেমের সম্প্রসারণ প্রয়োজন প্রাণীকুলের সর্বত্রে। 'খুদ্দক পাঠো' নামক গ্রন্থের মেত্তা সুত্ত-এ (মৈত্রী সূত্র) দেখা যায় ;

মেত্তঞ্চ সবক্ষলোকস্মিং মানসং ভাবযে অপরিমাণং

উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ অসম্বাধং অবেরংমসপত্তং।[৪৩]

অর্থাৎ, জগতের উর্দ্ধে, অধো দিকে, তির্য্যকভাবে, সর্বত্রে প্রত্যেক জীবের প্রতি ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে বৈরীতাহীন শত্রুতাহীন অপ্রমেয় মৈত্রীভাব পোষণ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাণিহত্যার মাধ্যমে কেউ নিজেকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। সুনাম বা যশ খ্যাতি অর্জন করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধ বলেন ; প্রাণিহিংসা করে আর্য হতে পারে না। সর্বোপরি দুর্নাম হয়। অযশ ছড়িয়ে সকল প্রাণির প্রতি অহিংস পরায়ণকে আর্য বলে অভিহিত করা হয়।[৪৪] যার চিত্ত মৈত্রী ও করুণায় পরিপূর্ণ, হিংসা যার দূরীভূত, তিনি প্রাণিহত্যা কিংবা প্রাণিহত্যায় উদ্যোগী হতে পারে না । বিশ্বপ্রেম বা মৈত্রীর স্বরূপ প্রসঙ্গে গৌতম বুদ্ধ তাঁর প্রবর্তিত ভিক্ষু তাঁর সঙ্ঘকে উদ্দেশ্য করে বলেন ;

মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে

এবম্পি সবক্ষভূতেসু মানসং ভাবযে অপরিমাণং।[৪৫]

অর্থাৎ, মা যেমন তার একমাত্র পুত্রকে আপন জীবন দিয়ে সকল প্রকার বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করেন তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রীভাব প্রদর্শন করবে।

এ বিষয়ে মৈত্রীর সম্প্রসারণ সম্পর্কে বুদ্ধ আরো বলেন ;

দিট্ঠা বা যেব অদিট্ঠা যে চ দূরে বসন্তি অবিদূরে

ভূতা বা সম্ভবেসী বা সবেক্ষ সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা।[৪৬]

অর্থাৎ, যে সমস্ত সমুদয় দৃষ্ট বা অদৃষ্ট প্রাণী আছে, যারা দূরে বা নিকটে বসবাস করে, যারা জন্মেছে বা জন্মগ্রহণ করবে সেই সব প্রাণী সুখী হোক।

মৈত্রীভাব হিংসার আগুনকে বিলোপ সাধন করে পারস্পরিক সুভ্রাতৃত্ববোধের বন্ধনে আবদ্ধ করে তোলে। মৈত্রীভাবের ফলে একে-অপরকে আপন ভাবতে পারে ; এক এবং অভিন্ন মনে করতে পারে। এতে কোনো ধর্ম নেই, কোনো বর্ণ নেই। সকল ধর্ম ও বর্ণের উর্দ্ধে তার অবস্থান। মৈত্রী চর্চার আগে মনকে অহিংস বা শান্ত করে তুলেতে হয়। নতুবা মনে মৈত্রীভাব জাগ্রত হয় না। মৈত্রী বলতে অপরিমেয় ভালোবাসা,বন্ধুত্বভাব, সুহৃদ্যতা, দয়া, আন্তরিকতা ইত্যাদি। এক্ষেত্রে বিশিষ্ট নীতিবিজ্ঞানী Tachibana. S তার 'The ethic oF Buddhism' বলেন ;

> The chief function of this virtue is to ward off pain and suffering from other beings, wheather human or non-human and further to promote their pleasure and happiness. It is generic maxim, therefore, according to the Buddhist ethical

Dhaka University Institutional Repository

idea, will be. We ought not to hurt mentally and physically our fellow-creatures as well as our fellow men, but to love and protect them.[৪৭]

প্রত্যেক ধর্মে জীবন সুন্দর করার বিধিবিধান রয়েছে। বুদ্ধ প্রদর্শিত পঞ্চশীল সকল প্রকার পাশবিক ইন্দ্রিয়গুলো দমন করে মানবিক ও আদর্শিক জীবনযাপনে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করে। সবাইকে সুন্দর নৈতিকতাময় সমৃদ্ধ জীবনযাপনে আগ্রহী করে তোলে। সকল প্রাণীর প্রতি মমত্ববোধ জাগ্রত করা এবং অহিংস মনোভাব প্রতিষ্ঠা করাই হলো বুদ্ধের পঞ্চশীলের প্রথম শীলের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রাণিহত্যা কারো কাম্য নয়। প্রাণিহত্যার ফলে অল্প আয়ুর কারণ হয়, বহু রকম ব্যাধির কারণ হয়, বিয়োগ দুঃখের কারণ হয় এবং উদ্বিগ্নে থাকার কারণ হয়'।[৪৮] পঞ্চশীলের প্রথম শীল লঙ্ঘনে মানুষ হিংস্র থেকে হিংস্র হয়ে উঠে। সমাজজীবনে সে নানারকম পাপকাজ বা হীনকর্ম কর্ম করতে কোনো দ্বিধাবোধ করে না।

প্রাণিহত্যা না করার সুফল

প্রত্যেক কাজের সুফল রয়েছে যা পঞ্চশীলের প্রথমশীলের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। এখানে কিছু সুফল[৪৯] তুলে ধরা হলো ;

ক. যারা কাউকে হত্যা করে না কিংবা দুঃখ দেয় না, তারা মৃত্যুর পর সুগতি লাভ করে।

খ. তারা উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করে। ধার্মিক কুলে জন্মগ্রহণ হয়।

গ. তারা সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান এবং রূপবান ও রূপশ্রী হয়ে জন্মগ্রহণ করে।

প্রাণিহত্যার বিরতিতে সুন্দর রূপশ্রী পুত্র-কন্যা লাভ করে।

ঘ. মানুষের হাতে কখনো মৃত্যু হয় না। সাপের কামড়ে বা বাঘের কামরে বা অন্যকোনো আক্রমণে মৃত্যু হয় না। তার সুকর্মই তাকে রক্ষা করে।

ঙ. তাদের অকাল মৃত্যু হয় না। তারা দীর্ঘায়ু লাভ করে। সবাই তাদেরকে ভালোবাসে।

চ. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক থাকে। ভালোবাসা আজীবন স্থায়ী হয়। তাদের মান-সম্মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

ছ. সুস্থ, সুন্দর, শোকহীন হয়ে জীবন যাপন করে। কোনো রকম দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় শীল : অদিন্নদানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি

পালি 'অদিন্নদানা' শব্দটির বাংলারূপ অদত্তবস্তু। এখানে 'অদিন্ন' অর্থ 'অদত্ত' আর 'দানা' অর্থ বস্তু বা দ্রব্য। সুতরাং 'অদত্ত' এবং 'বস্তু' এই দুয়ের সমন্বয়ে বাংলা অর্থ করা হয়েছে 'অদত্তবস্তু'। এখানে 'অদত্ত' বলতে যা দেওয়া হয়নি তাকে বোঝায়। আর 'বস্তু বলতে জিনিস কিংবা নানারকম দ্রব্যকে বোঝায়। সুতরাং 'অদত্ত বস্তু' বলতে যা দেওয়া হয়নি তা গ্রহণ করাকে বোঝায়। পরস্বপহরণকে বোঝায়। অন্যের দ্রব্য বা বস্তু অপহরণকে বোঝায়। চুরি করাকে বোঝায়। পরস্বপহরণ বিভিন্নভাবে হয়। যেমন : ক. অবৈধভাবে বস্তু, দ্রব্য বা অর্থ গ্রহণ, খ. আত্মসাৎকরণ, গ. কারো অজ্ঞাতে কিংবা গোপনে গ্রহণ, ঘ. জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেওয়া, ঙ. লুটতরাজ করে নেওয়া, চ, ডাকাতি করে নেওয়াসহ অন্যান্য অবৈধ উপায়ে নানা দ্রব্য গ্রহণ করা। অদত্ত বস্তু গ্রহণ করা চুরি পর্যায়ভূক্ত হয়। তাছাড়া অন্যভাবে বলা যায়, অপরের স্থাবর-অস্থাবর কোনো বস্তু, এমন কি সামান্য বস্তু কিংবা দ্রব্য পর্যন্তও গোপনে গ্রহণ না করা। অপরকে এ বিষয়ে উৎসাহিত না করা। পরের ক্ষতি কামনাও অন্তরে পোষণ না করা। চুরি করার পাঁচ অঙ্গ।[৫০] শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে :

মনুস্স ভণ্ডং তথাঞ্ঞী থেয্য চিত্তমুপক্কমো

তেনেব ভণ্ডহরণং পঞ্চ অঙ্গানি থেনিনো।

অর্থাৎ, পরের অধিকৃত বস্তু, পরের অধিকৃত বলে ধারণা, চৌর্যচিত্ত বা চুরি করার চেতনা, চুরি করার উপক্রম বা প্রস্তুতি এবং সেই চেতনায় বা উপক্রমে চুরি করা।

অদত্তবস্তু গ্রহণ করা নীতিবর্হিভূত এবং নীতিবির্বজিত সর্বোপরি শাস্তিযোগ্য অপরাধও বটে। যে ব্যক্তি ক্রোধ পরায়ণ, হিংসাপরায়ণ ও পাপ কাজে লিপ্ত সে পরের ধন চুরি করে।[৫১] চুরি করা অন্যায় এবং অপরাধও বটে। এটি এক ধরনের সামাজিক ব্যাধি। কোনো অবস্থাতেই অপরের দ্রব্য বা জিনিষ না বলে গ্রহণ করা পরিবর্জনীয়। 'সুত্ত নিপাত' নামক গ্রন্থের 'ধম্মিক সুত্তে' উল্লেখ রয়েছে ;

ততো অদিন্নং পরিবজ্জযেয্য কিঞ্চি ক্বচি সাবকো বুজ্ঝমানো

ন হারযে হরতং নানুজঞ্ঞা সব্বং অদিন্নং পরিবজ্জযেয্য।[৫২]

অর্থাৎ, যে জিনিস অন্যের বলে জানা, তা যাহাই হোক না কেন, এবং যে কোনো জায়গাতে হোক না কেন তা দেওয়া না হলে পরিত্যাগ করবেন। তিনি অন্যকে চুরি করতে উৎসাহিত করবে না, চুরি করাকে উৎসাহিত দেবে না বা করবে না। সকল প্রকার অদত্ত বস্তু পরিবর্জনীয় হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সুন্দর ও সৎভাবে জীবনযাপন করলে পরিবার, সমাজ, গ্রামে কিংবা রাষ্ট্রের সর্বত্রে শান্তি আসে। সমাজেও সুখ-শান্তি বিরাজ করে। চুরি করা প্রসঙ্গে 'পালিকাব্যে তেলকটাহ গাথা' নামক গ্রন্থের[৫৩] দুচ্চরিত আদীনব বা দুশ্চরিত্রের ফল নামক অধ্যায়ে দেখা যায়। যথা :

যো যাচকো ভবতি ভিন্নকপালহত্থো
মুণ্ডোধিগক্খরসতেহি চ তজ্জযন্তো
ভিক্খং সদারিভবনে স কুচেলবাসো
দেহে পরত্থ পরিবিত্তহরো নরোহি।

অর্থাৎ, অপরের ধন-সম্পদ অহরণকারী ব্যক্তি পরকালে জীর্ণ-শীর্ণ দেহধারী, মলিন বস্ত্র ও ভগ্নপাত্রধারী হতভাগা ভিখারী হয় এবং শত শতবার লাঞ্ছিত হওয়া সত্ত্বেও বারবার শত্রুগৃহে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতে বাধ্য হয়।

বুদ্ধ বলেন, অদত্তবস্তু গ্রহণকারী (চোর) তার অদত্তবস্তু গ্রহণের দরান ইহলোক-পরলোকে ভয়-বৈরব প্রসব করে এবং মানসিক দুঃখ-যন্ত্রণা বিষাদ ভোগ করে। অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরতজনর ইহলোক-পরলোকেও ভয়-বৈরব উৎপন্ন হয় না। মানসিক দুঃখ ও বিষাদ উৎপন্ন হয় না। অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরতজনের এরূপেই তেমন ভয়-বৈরব উৎপন্ন হয় না।[৫৪] চুরি না করা কিংবা অপরের দ্রব্য বা বস্তুর ক্ষতি কামনা করা কখনো উচিত নয়। সর্বদা সকলেই তাদের যথালব্ধ সম্পত্তি বা সম্পদের পরিভোগ হতে কেউ যেন বঞ্চিত না হয়, সেই কামনা করা উচিত। অনেকেই আবার নিজে চুরি না করে অপরকে দিয়ে চুরি করায়। 'সদ্ধম্মোপাযন' নামক গ্রন্থের 'দস অকুসল আদীনব গাথা' বিষয়ক অধ্যায়ের ৬২-৬৩ নং সংখ্যক শ্লোকে[৫৫] এ সম্পর্কে উক্ত হয়েছে ;

যথাধিপ্পাযমাণত্তি তথা তং সম্পটিচ্ছনং
পটিঞ্ঞং অবিনাসেত্বা তথা'ব করণম্পি চ।
ঠানা চাবম্পযোগঞ্চ অপনেত্বান পঞ্চসু
ছলঙ্গমানত্তিযা হোতি অদিন্নতি পদীপযে।

অর্থাৎ, অন্যের দ্বারা চুরি করালে তা ছয় প্রকারে সংঘটিত হয় ; চুরি করার ইচ্ছা, উক্ত ইচ্ছাকে কর্মে পরিণত করার ইচ্ছা, অনুমতি লাভ (চুরি করার জন্য), দ্রব্যকে স্থান চ্যুত করা, উক্ত দ্রব্যকে সরিয়ে ফেলার জন্য প্রয়োগ এবং সবশেষে সরিয়ে ফেলা।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ জীবনযাপন পদ্ধতিতে পঞ্চশীলের দ্বিতীয় শীলের আলাদা তাৎপর্য রয়েছে। দ্বিতীয় শীল-এর গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিখ্যাত নীতিতত্ত্ব বিদ। Tachibana S তাঁর `The Ethics of Buddhism' বলেন :

> `Stealing or theft in its wide sense will include not only that of material objects in connextion with which it is ordinarily explained, but that of immaterials ones. Pickpoketing, burglary, robbery, swindling, blackmail, are not all the forms of theft. There are hundreds of other forms of it; for instance, the infringement of others rights, unasked interference with other's business, the waste of time by those who are employed by private persons or corporate bodies, the neglect of duty, evasion of responsibility, misuse of or tampering with money or property belonging to the public or other persons, etc. I am afraid in fact almost all of of us commit theft in some form or other, whether positively or negatively. Sometimes we are conscious of its being a form of theft, but in many cases we are not, on account of the long habitual practice of it, or form mere ignorance. Certainly all of these cannot properly be called cases of theft, but they are not consistent with the idea of a man who takes only what is given, with which he is content, and who passes his life in honesty and purity of heart, And if we carry on our business exactly as we ought to, our efficiency will be increased by several times'[৫৬].

চুরি না করা সম্পর্কে পালি বর্হিভূত সাহিত্যের 'সদ্ধম্মোপাযন' নামক গ্রন্থের[৫৭] দস অকুসল আদীনব গাথার আটাত্তর নং সংখ্যক শ্লোকে দেখা যায় ;

দলিদ্দযঞ্চ দীনত্তং আসাভঙ্গঞ্চ দারুণং

অঞ্ঞযত্তপ্পবত্তিঞ্চ চাদিন্নাদাযী লভে নরো।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি স্বপ্রবৃত্তি জানার পরও চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করে কিংবা না বলে পরের দ্রব্য গ্রহণ করে সেই ব্যক্তি দরিদ্র হয়, গরীব হয়, এবং সর্বক্ষেত্রে দারুণ আশাহত হয়।

চুরি না করার সুফল

চুরি করাকে সমাজে সবাই ঘৃণা করে। এটি নিন্দনীয় এবং গর্হিত কাজ। চৌর্যবৃত্তির ফলে নিজে যেমন সব জায়গায় অপমানিত হয় তেমনি পরিবারকে অপমান সহ্য করতে হয়। তাই এই অসামাজিক কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করা উচিত। যে বা যারা চুরি করে না তারা বহুবিধ সুফল লাভ করে। যথা[৫৮] :

ক. জন্মে জন্মে ধন-ধান্যে ভোগসম্পদ লাভ হয়। লব্ধ সম্পদ চিরকাল স্থায়ী হয়। ইচ্ছিত বা কাঙ্ক্ষিত বস্তু অনায়াসে লাভ হয়।

খ. নিজ সম্পত্তি রাজা, চোর, অগ্নি, জল, প্লাবন, বাতাস এবং কোনো শত্রু কোনো কারণে কিছুতেই নষ্ট করতে পারে ন।

গ. মানুষের মধ্যেশীল পালনকারীরা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ ও সম্মানিত হয়। তারা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মাধ্যমে জীবনযাপন করে।

ঘ. জন্মান্তরে স্বর্গ কিংবা ধনীর ঘরে জন্ম গ্রহণ করে।

ঙ. সবাই তাদেরকে ভালোবাসে।

তৃতীয় শীল : কামেসু মিচ্ছাচারা বেরামণি সিক্খাপদং সমাদিয়ামি

পঞ্চশীলের তৃতীয় শীল হলো 'কামেসু মিচ্ছাচারা বেরমণী'। 'কাম' শব্দ থেকে ব্যাকরণগতভাবে 'কামেসু' শব্দের উৎপত্তি। 'কাম' শব্দের অর্থ হলো পুলক, সুখানুভব, ইন্দ্রিয় বা মনের পরিতৃপ্তি, কামবাসনা, কামলালসা, আমোদ-প্রমোদ ইন্দ্রিয় সুখের বিষয়বস্তু[৫৯]। 'কাম' দ্বিবিধ। যথা : বস্তুকাম এবং ক্লেশ কাম। রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ প্রভৃতি 'বস্তুকাম'। আর বস্তুকাম-এর প্রতি রাগ-দ্বেষাদি রিপু নিচয়ই হলো 'ক্লেশ কাম'[৬০]। কাম সুখ অল্পস্বাদ যুক্ত। যা অনেক দুঃখ ও নিরাশা-হতাশার কারণ। তাতে বিপদের ক্ষতির সম্ভাবনা অত্যধিক। ত্রিপিটকের সূত্র পিটকের মধ্যম নিকায়ের 'অর্লগদ্দোপম সূত্রে' উল্লেখ রয়েছে : 'কাম ভোগের পরিমাণ দুঃখ এবং বহুবিধ অন্তরায় সৃষ্টি হয়'।[৬১] 'কাম থেকে কামুকের উৎপত্তি, কাম থেকে ভয় উৎপত্তি, যিনি কাম- এর উর্দ্ধে তার শোক এবং ভয় থাকে

Dhaka University Institutional Repository

না'।[৬২] 'মিচ্ছাচারা' বলতে মিথ্যা কিংবা অবৈধ শাররীকি মেলামেশা, অসৎ আচরণ, প্রতারণামূলক আচরণ কিংবা ব্যাভিচারকে বোঝায়।

এখানে অবৈধ মিথ্যাচার কিংবা অবৈধ মিলন স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত অন্য নারী-পুরুষ, পুরুষ-নারী কিংবা তীর্যক প্রাণি জাতীয় স্ত্রী-পুরুষ, পুরুষ-নারী কামসম্ভোগ করাকে বোঝায়। এটি নিন্দনীয়, অশোভনীয়, অকল্যাণকর এবং গর্হিত কাজ। এটি একটি সামাজিক ব্যাধিও বটে। ধর্মীয়, সামাজিক এবং প্রচলিত দেশীয় আইনেও এটি একটি চরম অপরাধ। সুন্দর, বিশুদ্ধ জীবনযাপন বা চরিত্রগঠনের পরিপন্থী। অবৈধ মিথ্যা কামাচারের চার অঙ্গ। [৬৩]যথা : ক. অগমনীয় বিষয়, খ. মৈথুন সেবনের চিত্ত বা মন গ. মার্গে মার্গে বা অঙ্গে অঙ্গে প্রতিপাদন (সম্পাদন), ঘ. সেবনের আস্বাদ অনুভবকরণ বা উপলব্ধি।

যারা এ ধরনের অমানবিক, অসামাজিক, অবিবেচক, রুচিবোধহীন কর্ম সম্পাদন করে তারা সর্বত্রে পরিত্যাজ্য। নানারকম দুঃখভোগ করে। এক্ষেত্রে তিনি (বুদ্ধ) আরো বলেন ; 'ব্যভিচারী তার ব্যভিচারের দরুন ইহলোক-পরলোকে ভয়-বৈরব প্রসব করে এবং মানসিক দুঃখ বিষাদ ভোগ করে। ব্যভিচার হতে বিরতজন ইহলোক-পরলোকেও ভয়-বৈরব উৎপন্ন হয় না। মানসিক দুঃখ ও বিষাদ উৎপন্ন হয় না। ব্যভিচার হতে বিরতজনের এরূপেই তেমন ভয়-বৈরব উৎপন্ন হয় না[৬৪]। সুত্ত পিটকের অন্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের সুত্ত নিপত নামক গ্রন্থের 'পরাভব সূত্র'-এ বুদ্ধ তাদেরকে পরাজিত বলে অভিহিত করেন[৬৫]। 'পালিকাব্যে তেলকটাহ গাথা' নামক গ্রন্থের 'দুচ্চরিত আদীনব' নামক অধ্যায়ে[৬৬] এ বিষয়ে দেখা যায় :

ইত্থী ন মুঞ্চতি সদা পুন ইত্থিভাবং
নারী সদা ভবতি সো পুরিসো পরত্থ।
যো আচরেয্য পরদারমলঙ্গনীয়ং
ঘোরঞ্চ বিন্দতি সদা ব্যসঞ্চ অনেকং।

অর্থাৎ, পরস্ত্রী গমনকারী পুরুষ পরকালে স্ত্রীরূপে এবং পুরুষগামিনী স্ত্রী পুনরায় স্ত্রীরূপে জন্মগ্রহণ করে। ঐশ্বর্য ও ধন বিনাশের কারণে তারা উভয়েই অসংখ্য ভয়ঙ্কর বিপদের সন্মুখীন হোন।

সূত্র পিটকের 'ধম্মপদ'-এর নিরয় বর্গে উল্লেখ রযেছে ;

চত্তারি ঠানানি নরো পমত্তো আপজ্জতি পরদারূপসেবী,
অপুঞ্ঞঞ লাভং ন নিকামসেয্যং নিন্দং ততিযং নিরযং চতুত্থং।[৬৭]

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ, পরদ্বার গমনকারী ব্যক্তির প্রথমতঃ অমঙ্গল, দ্বিতীয়তঃ অনিদ্রা, তৃতীয়তঃ নিন্দা এবং চতুর্থতঃ নরক গমন হয়। প্রমত্ত পর দ্বার গমনকারী ব্যক্তি চর্তুবিধগতি প্রাপ্ত হয়।

অপুঞ্ঞ লাভো চ গতী চ পাপিকা ভীতস্স ভীতায রতী চ থোকিকা,
রাজা চ দণ্ডং গুরুকং পণেতি তস্মা নরো পরদারং ন সেবে।[৬৮]

অর্থাৎ, পরদ্বার গমনকারী ব্যক্তি পাপ সঞ্চয় এবং হীনগতি প্রাপ্ত হয়। ভীতা রমনীর সাথে ভীত নরের অবৈধ কামরতি সম্ভোগ ক্ষণস্থায়ী হয়। তারা রাজার গুরুদণ্ড ভোগ করে। সুতরাং কেউ পরদ্বার গমন করো না।

সঙ্গো এসো পরিত্তমেত্থ সোখ্যং অপ্পস্সাদো দুক্খমেত্থ ভিয্যো,
গলো এসো ইতি ঞত্বা মতীমা একো চরে খগ্গবিসাণকপ্পো।[৬৯]

অর্থাৎ, এই মিলন ক্ষণিক সুখ উৎপাদক, অতি অল্প স্বাদ সম্পন্ন, এবং অনাগতে সীমাহীন দুঃখ সৃষ্টিকারী। জ্ঞানী ব্যক্তি ইহা জ্ঞাত হয়ে গণ্ডারের মতো বিচরণ করে।

এই ধরনের ঘৃণিত ও নিন্দনীয় অপরাধের জন্য প্রত্যেক দেশে তাদের দেশীয় আইনে প্রচলিত বিচারব্যবস্থায় তাদের শাস্তি হয়। তারা সকলের নিকট অবজ্ঞার পাত্র হয়। যারা পরদ্বার গমনকারী, ব্যভিচারী, অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনকারী নর-নারীকে দুঃশীল পরায়ণ এবং দূরাচার বা দূরাচারী বলে সবাই তাদের ঘৃণা করে। নিন্দা করে। তাদের মুখদর্শন কুদর্শনের ন্যায় নাককে কুঞ্চিত করে সবাই চোখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নেয়। তারা সভা-সমিতিতে বা সৎ পুরুষদের সান্নিধ্যে যেতে সাহস পায় না।[৭০] তাই সকলকে সংযমী হওয়া দরকার। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধ বলেন ; 'কায়-বাক্য-মনে কোনো অবস্থাতেই কোনো রকম পাপকর্ম সম্পাদন উচিত নয়। লোভ-দ্বেষ-মোহ পরিত্যাগ করে আত্মসংযত হয়ে অনর্থক দুঃখকে গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকাই উচিত'।[৭১] জ্ঞানী ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের অসংযমতা জলন্ত আগুনের সাথে তুলনা করে সর্বদা বর্জন করে। যদি কেউ মানসিক প্রবৃত্তির উপর সম্পূর্ণ জয়ী হতে অসমর্থও যদি হয় তবু কখনো এরূপ আচরণ করা উচিত নয়।

অবৈধভাবে অবাধ মেলামেশা সমাজে বিরূপ প্রভাব ফেলে। এধরনের মিথ্যা কামাচার মানবসমাজকে নৈতিকভাবে স্খলিত ও আদর্শচ্যুত করে। তাছাড়া অবৈধভাবে পরদার গমনে কিংবা অবৈধসম্পর্ক স্থাপনে নানারকম মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হবার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। ফলে পরিবার বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। এমন কি মৃত্যু হতে পারে। এই নীতি মাধ্যমে একদিকে যেমন নৈতিক চরিত্র গঠন করা যায় অন্যদিকে আবার চরিত্র সুন্দর, পবিত্র,

Dhaka University Institutional Repository

কলঙ্কমুক্ত, নিষ্কলু ও বিশুদ্ধ থাকে। মিথ্যা কামাচার সম্পর্কে 'Buddhist Ethics' গ্রন্থে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়েছে এভাবে ;

suffering in an unhappy state for a long period ; when reborn as a man by virtue of merits acquired in a previous exixtence the birth would occur in a lower from of mankind. Such a person would have many enemies, would be disliked by the people, would be destitute, unable to produce comfortable lodgings, food and clothes and would be full of anger and rage[৭২].

মিথ্যা কামাচারে বিরত থাকার সুফল

তৃতীয় শীলে পরস্ত্রীকে মাতৃসম জ্ঞানে এবং কুমারীদের বোনের দৃষ্টিতে দেখা বাঞ্চনীয়। মিথ্যাচার মানুষকে অসামাজিক কর্মকাণ্ডের শেষ স্তরে নিয়ে যায়। এটি সুন্দর, সুস্থ সমাজ বির্নিমাণে প্রধান অন্তরায়। মিথ্যা কামাচার হতে বিরত থাকার সুফল রয়েছে। এ বিষয়ে[৭৩] দেখা যায় :

ক. মিথ্যা কামাচার হতে বিরত নর-নারীরা শত্রুহীন হয় ;

খ. তারা দেব ও নরের প্রিয় হয় ;

গ. খাদ্য-দ্রব্য, পোষাক-পরিচ্ছেদ, অন্ন-পানীয় লাভ হয় ;

ঘ. সুখে নিদ্রা যেতে পারে এবং জাগ্রত্র হতে পারে ;

ঙ. তারা ক্রোধ ও শত্রুহীন হয় ;

চ. সভা-সমিতিতে নিঃসঙ্কোচে গমন করে ;

ছ. পারস্পরিক মধুর সম্পর্ক স্থাপন হয় ;

জ. দুঃখবিহীন হয়ে সুখে কালযাপন করে এবং

ঞ. মৃত্যুর পর স্বর্গ লাভ হয়।

চতুর্থ শীল : মুসাবাদা বেরামণি সিক্খাপদং সমাদিযামি

Dhaka University Institutional Repository

মিথ্যাকথা বলা থেকে বিরতিই হলো চতুর্থশীল। অসত্য ভাষণই হলো 'মিথ্যাকথা'। অপরকে প্রতারিত কিংবা প্রবঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে কায় এবং বাক্যের অপব্যবহার কিংবা অপপ্রয়োগ করার নাম 'মিথ্যা'। ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত-এর মধ্যে যে বিচ্ছিন্নভাব প্রকটরূপ ধারণ করে তার মূলে রয়েছে মিথ্যা প্রলোভন। মিথ্যাভাষণ পরিত্যাগ করা শুধুমাত্র সাধারণ গৃহীদের জন্য প্রয়োজন তেমনটি নয়। এটি ভিক্ষু-ভিক্ষুণীসহ জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। সুন্দর, সুস্থ সমাজ বিনির্মানে বুদ্ধ একটি পথের কথা বলেছিলেন যেটাকে তিনি 'অরিয় অট্ঠঙ্গিকো মগ্গ' বা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ নামে অভিহিত করেছেন। অষ্টাঙ্গিক মার্গের তৃতীয় মার্গ হলো সম্যক বাক্য। আমরা সবাই জানি, মিথ্যা বলা মহাপাপ। একটি মিথ্যা অনেক অনেক কিংবা অসংখ্য মিথ্যা কথা বলতে বাধ্য করে। সুতরাং অকথনীয় বাক্য বলা থেকে বিরত থাকতে হবে। অকথনীয় বাক্য বলতে মিথ্যা, ভেদকারী, কটূ ও বৃথা কথোপকথন থেকে বিরত থাকাউকে বোঝায়। জ্ঞানত সামান্যতম মিথ্যা বললেও পাপ হয়। মিথ্যা বলা পাপ নয় শুধু অপরাধও বটে। তাই অপ্রিয় হলেও সত্যভাষণ করা উচিত। সুতরাং নিজের জন্য কিংবা অপরের জন্য সজ্ঞানে মিথ্যাভাষণ করা অনুচিত। বুদ্ধ মিথ্যাভাষণ করার চারটি অঙ্গ[৭৪] বলে অভিহিত করেছেন। যেমন :

বত্থুনো বিতথঞ্চেব বিসংবাদমানসং

বাযামতা পরিঞ্ঞাণং মুসাবাদস্স চাতুরো।

অর্থাৎ, অভূত বিষয়, মিথ্যা বলবার চেতনা বা প্রবঞ্চনা চিত্ত, মিথ্যা বলবার চেষ্টা এবং যাকে বলে সে মিথ্যা বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া।

মিথ্যাভাষণ মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে। মাতা-পিতা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব সকলের মধ্যে তখনই একধরনের সদ্ভাব গড়ে উঠবে যখন মনে কোনো মিথ্যার লেশ থাকে না। বুদ্ধ সব ধরনের মিথ্যাভাষণ পরিবর্জন করার কথা বলেছেন। এ বিষয়ে বুদ্ধ বলেন ;

সভগ্গতো বা পরিসগ্গতো বা একস্স বেকো না মুসা ভণেয্য

ন ভাণযে ভণতং নানুজঞ্ঞা সবক্ষ অভূতং পরিবজ্জযেয্য।[৭৫]

অর্থাৎ, সভাগৃহে কিংবা পরিষদ গৃহে কারো সাথে মিথ্যা ভাষণ করা অনুচিত। কাউকে মিথ্যা ভাষণে উৎসাহিত করা অনুচিত। মিথ্যার অনুমোদন করা অনুচিত।

Dhaka University Institutional Repository

সত্য চির অম্লান, চিরসত্য আর মিথ্যা সর্বকালের জন্য মিথ্যা। জন্ম যেখানে হোক না কেন মানুষ তার কর্মের মধ্যে দিয়েই সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে কিংবা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। অসৎ প্রকৃতির মানুষরাই মিথ্যাবাদী হয়। পালি বহির্ভূত গ্রন্থ 'পালি কাব্যে তেলকটাহ গাথা' নামক গ্রন্থে[৭৬] মিথ্যাচার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। যথা :

দীনো বিগন্ধবদনো চ জলো অপঞ্ঞো
মূগো সদা ভবতি অপ্পিযদস্সনো চ।
পপ্পোতি দুক্খমতুলঞ্চ মনুস্সভূতো
বাচং মুসা ভণতি যো হি অপঞ্ঞসত্তো।

অর্থাৎ, মন্দ, অশুভ এবং অসৎ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই মিথ্যাভাষী হয়। তারা মৃত্যুর পর মানবজন্ম লাভ করলেও জড়, মূঢ়, মূক, বধির, অশুচিময় মুখমণ্ডল ও কুরূপ দেহধারী হয়ে নানাবিধ দুঃখ- যন্ত্রণা ভোগ করে।

এই বিষয়ে আরো উক্ত পালি সাহিত্যের 'সুত্ত নিপাত' নামক গ্রন্থে[৭৭] আরো দেখা যায় ;

অভূতবাদী নিরযং উপেতি যো বাপি কত্বা ন করোমি'চাহ
উভোপি তে পেচ্চ সমা ভবন্তি নিহীনকম্মা মনুজা পরত্থ।

অর্থাৎ, মিথ্যাবাদী লোক নরকে গমন করে। যে লোক কর্ম সম্পাদন করে তা স্বীকার করে না সেও নরকে গমন করে। তারা পরলোকে হীনকর্মা মানব হয়।

মিথ্যাভাষণ করা কিংবা অন্যকে দিয়ে মিথ্যাকথা বলাকে প্রতারণার অন্যতম মহৌষধ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। মিথ্যাচার কিংবা মিথ্যাভাষণ বলা অমার্জনীয়, নিন্দনীয় সর্বোপরি শাস্তিযোগ্য অপরাধও বটে। এই ধরনের ভাষণ পরিত্যাগ করে সর্বদা সত্য, প্রিয় অর্থপূর্ণ বাক্য ভাষণ করেই জীবনযাপন উচিত। মিথ্যাকথা বলার অন্যান্য বিষয়সমূহ হলো : ক. পিশুন বাক্য, খ. পুরুষ বা কর্কশ বাক্য এবং গ. সম্প্রলাপ বা বৃথা বাক্য।

ক. পিশুন বাক্য : এটিকে বিদ্বেষমূলক বাক্য ভেদসৃষ্টিকারী বাক্যও বলা হয়। যে বাক্য কথনে অপরের চিত্তকে আঘাত দেয় বা চিত্তকে অম্লান করে তাই পিশুন বাক্য। ইহা পরস্পরের মধ্যে ভেদ বা কলহ সৃষ্টি করে। এ বিষয়ে উক্ত হয়েছে ; 'পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী যে বাক্য ব্যবহৃত হয় তাকে বলা হয় পিশুন বাক্য'।[৭৮] পিশুন বাক্যকে আবার কান লাগানো কথাও বলা হয়। কেননা, এই কান লাগানো কথা দ্বারা তার কাছে নিজকে প্রিয় করে তোলা অপরকে অপ্রিয় করার ভাব প্রবর্তন করা হয়। বুদ্ধ এখানে উপদেশ

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে পিশুন বাক্য প্রসঙ্গে বলেন ; 'কোনো কথা এখানে শোনে ওখানে বলো না ; অনত্র্যে শোনে এখানে বলো না'।[৭৯] তিনি আরো বলেন ; কলহকারীদের মধ্যে মিলন দাতা হোন ; মৈত্রী পরায়ণ ব্যক্তিদের উৎসাহ দাতা হোন।[৮০]

খ. পুরুষ বা কর্কশ বাক্য : কুঠারতুল্য দ্বিধাকারী মর্মচ্ছেদী বাক্য বলা হয় পুরুষ বা কর্কশ বাক্য। এটি দ্বেষমূলক চিত্তজাত। নিজেকে এবং অপরকে পুরুষ বা কর্কশ বাক্য ব্যবহারে প্ররোচিত করা হয়। 'সদ্ধম্মোপায়ন' নাম গ্রন্থে-এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে ; 'অন্যের ভয়-ভীতি সঞ্চারণে কিংবা উৎপাদনের জন্য দুষ্টচিত্ত ব্যক্তি যে অনিষ্টকর শ্রুতিকটু বাক্য ব্যবহার করা হয় তার নাম পুরুষ বা কর্কশ বাক্য'।[৮১]

এই বাক্যে বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। আপনকে পর করে। পরকে আপন করতে সহায়তা করে। যথা সম্ভব সবাই পুরুষ বা কর্কশভাষীকে এড়িয়ে চলে। কেউ সঙ্গী হতে চায় না। কেউ তাকে পছন্দ করে না। সুতরাং কখনো কর্কশ বাক্য ভাষণ করা যথাযথ কিংবা উচিত নয়। বাক্যটি না বলা প্রসঙ্গে বুদ্ধ বলেন;

মা বোচ ফরুস্স কঞ্চি বুত্তা পটিবদেয্যু তং

দুক্খাহি সারম্ভকথা পটিদণ্ডা ফুসেয্যু তং।[৮২]

অর্থাৎ, কাউকেও কখনো কর্কশ বাক্য বলবে না। কেননা, যাকে বলবে প্রত্যুত্তরে সেও আবার কর্কশ বাক্য বলতে পারে। ক্রোধপূর্ণ বাক্য দুঃখদায়ক। দণ্ডের প্রতিদান তোমাকে ভোগ করতে হবে।

বাক্যই মানুষকে আপন করে। বাক্য মানুষকে পর করে। কষ্ট দেয়। যন্ত্রণা দেয়। দুঃখ দেয়। বুদ্ধ কর্কশ বাক্য পরিত্যাগ করে নির্দোষ, শ্রুতিমধুর, কর্ণ সুখকর, প্রীতিজনক, হৃদত্যমূলক, বহুজন কাম্য, বহুজন প্রিয় নাগরিক বাক্য ব্যবহার করার উপদেশ দিয়েছেন[৮৩]।

গ. সম্প্রলাপ বা বৃথা বাক্য : সম্প্রলাপ বা বৃথা বাক্য বলতে নিরর্থক আলাপ, অযথা আলাপ এবং অসার গল্প কিংবা আলাপ কে বোঝায়। এটি মোহ জাত। মানুষ মাত্রই গল্পপ্রিয়। সময় পেলেই আড্ডা দেয়। কিন্তু এটা ঠিক যে, সম্প্রলাপ বাক্য বা অলীক গল্পগুজব মানুষের কোনো উপকারে আসে না বরং ক্ষতিই করে। এক্ষেত্রে বুদ্ধের নির্দেশনা হলো;

সহস্সম্পি চে বাচা অনত্থপদসংহিতা

একং অত্থপদং সেয্যো যং সুত্বা উপসম্মতি।[৮৪]

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ, অর্থহীন, অকল্যাণকর, অপ্রসাঙ্গিক হাজার হাজার কথার চেয়ে যদি অর্থপূর্ণ একটি কথাও শ্রবণ করা যায় তবে মনে প্রশান্তিভাব উৎপন্ন হয়।

মিথ্যাভাষণে বর্ণিত অসার বা বৃথা কথা বলা থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন। মিথ্যাভাষণে কিংবা ভেদমূলক ভাষণে ঐক্যবদ্ধ পরিবার, পাড়া, মহল্লা, সমাজ, ভাই-ভাই, আপনজন কিংবা সুহৃদ এমন কি জন্মদাত মাতা-পিতার মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করে। এই ধরনের বাক্য অপরের দুঃখের কারণ হয়। সকলের মঙ্গল, কল্যাণ এবং শান্তির কথা মনে রেখে কখনো মিথ্যাভাষণ করা ঠিক নয়। এক্ষেত্রে মিথ্যাভাষণ বর্জনীয়। তবে আমাদের এমন কথা বলা দরকার যা যথার্থ এবং সত্য, সময়োচিত, বাস্তবধর্মী, হিতকর, আইন শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা সম্মত, অমূল্য সম্পদের মতো মূল্যবান, যুক্তিসঙ্গত, পরিমার্জিত এবং অর্থবহ। বুদ্ধ একসময় মহাশ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিককে উদ্দেশ্য করে বলেন ; 'মিথ্যাবাদী তার মিথ্যাকথার দরুন ইহলোক-পরলোকে ভয়-বৈরব প্রসব করে এবং মানসিক দুঃখ বিষাদ ভোগ করে। মিথ্যাভাষণ হতে বিরতজন ইহলোক-পরলোকেও ভয়-বৈরব উৎপন্ন হয় না। মানসিক দুঃখ ও বিষাদ উৎপন্ন হয় না। মিথ্যাকথা বলা হতে বিরতজনের এরূপেই তেমন ভয়-বৈরব উৎপন্ন হয় না'।[৮৫]

লোভের কারণে মিথ্যার প্রবৃত্তি জন্মে। একটি সত্য কথাকে আড়াল করতে গিয়ে মানুষ সহস্র মিথ্যার আশ্রয় নেয়। মনকে সংযত করে মিথ্যাভাষণ, কর্কশ বাক্য, ভেদ বাক্য, কূট বাক্য পরিহার করে অর্থপূর্ণ সুন্দর, প্রীতিময় বাক্য এবং মনোময় বাক্য বলাই শ্রেয়। কেননা সুন্দর মনোজ্ঞ, মিলনাত্মক ভাষণ মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য সৃষ্টি করে। পারস্পরিক সম্প্রীতি-সদ্ভাব গড়ে তুলতে সক্ষম। সর্বক্ষেত্রে সত্যকথা বলা একটি বড় এবং অনন্য সাধারণ গুণ। সত্যভাষণ মানুষ মহৎ করে। অন্যজনদের চেয়ে সকলের নিকট প্রিয় হন। সত্য ভাষণ মানুষকে পারিবারিক সুখ-শান্তি আনয়ন, উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধিকরণে সহায়তা করে।

মিথ্যাভাষণ মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করে। মানবতাকে বিনষ্ট করে। পারস্পরিক কলহ-ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। সত্যভাষণ এবং সত্যলাভের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা দ্বারা মিথ্যাবাক্য সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হয়। বুদ্ধ বলেন ;'প্রবঞ্চনাহীন, অজ্ঞানতামুক্ত, দুঃখ সৃষ্টিকারী, ভেদ সৃষ্টিকারী, পাপমিত্র পরিবর্জন করতঃ সত্যবাদী হয়ে জীবনযাপন করা উচিত'।[৮৬]

Dhaka University Institutional Repository

মিথ্যা কথা না বলার সুফল

মিথ্যা বলা কখনো উচিত নয়। মিথ্যাভাষণ থেকে বিরত থাকার সুফল অনেক। এখানে কয়েকটি সুফল [৮৭] তুলে ধরা হলো ; ক. মধুর ও প্রিয় বাক্যভাষী হয় ; খ. ইন্দ্রিয়সমূহ সুপ্রসন্ন হয় ; গ. সুন্দর দেহের অধিকারী হয় ; ঘ. সবাই তাদের সম্মান করে ; ঙ. তাদের চিত্ত সর্বদা শান্ত থাকে এবং চ. মৃত্যুর পর স্বর্গ লাভ হয়।

পঞ্চম শীল : সুরামেরেয় মজ্জপমাদট্ঠানা বেরামণি সিক্খাপদং সমাদিযামি

পঞ্চশীলের পঞ্চম এবং শেষ শীল হলো সুরাজাতীয়/মাদকজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরতি। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিবাক্য। বাক্যটিতে দেখা যায় সুরা, মদ, অহিফেন, ভাং, নানারকম মাদকজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ নীতি বর্হিভূত। নেশা জাতীয় দ্রব্যগুলো গ্রহণ করলে মানুষ হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে এবং সংজ্ঞা রহিত হয়। ত্রিপিটকের বিনয় পিটকের 'পাচিত্তিয়া' নামক গ্রন্থে দেখা যায়, 'সুরামেরেয়' শব্দটি 'সুরা' এবং 'মেরেয়' এই দুইয়ের সমন্বয়ে গঠিত। এখানে 'সুরা' বলতে পিষ্ট বা শস্যের চূর্ণ দ্বারা তৈরী সুরা ; পিষ্টক বা পিঠা দ্বারা তৈরী সুরা; ভাত দ্বারা তৈরী সুরা, নারিকেলসহ অন্যান্য দ্রব্য দিয়ে তৈরী সুরা যার মধ্যে সুরার বর্ণ ও গন্ধাদি স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। 'মেরেয' বলতে পুষ্প দ্বারা তৈরী মদ্য জাতীয় দ্রব্য ; ফল দ্বারা তৈরী মদ জাতীয় দ্রব্য অথবা অন্য কোনো উপায়ে মিশ্রিত খাদ্য দ্রব্য যার মধ্যে মধ্যেও বর্ণ ও গন্ধাদি স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়।[৮৮] এগুলো ছাড়া মাদকজাতীয় যত প্রকার দ্রব্য বস্তু বা পানীয় রয়েছে সবই মাদকজাতীয় দ্রব্য নামে অভিহিত। মাদক দ্রব্য গ্রহণের চারটি অঙ্গ[৮৯]। যেমন :

দ্রব্য বস্তু বা পানীয় রয়েছে সবই মাদকজাতীয় দ্রব্য নামে অভিহিত

তেনেব অঙ্গোহরণং সুরাপানস্স চাতুরো।

অর্থাৎ, সুরা জাতীয় মাদক দ্রব্য পান বা গ্রহণ করা, পান করার চেতনা, পান করার চেষ্টা, সেই ইচ্ছায় পান করা

বুদ্ধ সারাজীবন নিয়ম-নীতির কথা বলেছিলেন। এখানে মাদকজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন ;

মজ্জঞ্চ পানং ন সমাচরেয্য ধম্মং ইমং রোচযে যো গহট্ঠো
ন পাযযে পিবতং নানুজঞ্ঞা উম্মাদনন্তং ইতি নং বিদিত্বা।[৯০]

অর্থাৎ, যেই ধর্ম গৃহীদের রুচিকর হবে, তিনি মদ্য পান হতে বিরত থাকবেন, মদ্য পানে কাউকেও উৎসাহিত করবে না, মদ্য পানের অনুমোদনও দেবে না। কারণ মদ্যপানে আসক্ত ব্যক্তি উন্মাদগ্রস্ত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

মাদক দ্রব্য গ্রহণকারী ব্যক্তির ভালো-মন্দ বিচার-বুদ্ধি থাকে না।হিত-অহিত জ্ঞান থাকে না। কুশল-অকুশল জ্ঞান থাকে না। তাছাড়া অনেক সময় মস্তিষ্কের বিকৃত ঘটে। মাদকাসক্ত ব্যক্তির অর্থনৈতিক বিপর্যয় হয়। স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। অতিরিক্ত মাদক গ্রহণের ফলে ব্যক্তি নিজের মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং পশুর মতো আচরণ করে। এই জাতীয় দ্রব্য গ্রহণের ফলের পরিবার এবং সমাজে অশান্তি বিরাজ করে। এই জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ মানবসম্পদ উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করে। যারা এগুলো গ্রহণ করে বুদ্ধ তাদেরকে পরাজিত বলে উল্লেখ করেন।[৯১]

সূত্র পিটকের দশতম গ্রন্থ হলো 'জাতক'। জাতকটির অন্তর্গত 'সুরাপান জাতক'-এ সুরাপানকে একটি প্রায়শ্চিত্তিক অপরাধ বলে অভিহিত করেছেন[৯২]। বুদ্ধ মতে, মাদকজাতীয় দ্রব্যের আসক্তির ফলে ছয় প্রকার অনিষ্টকর বিষয় উৎপন্ন হয়। সেইগুলো হলো ;

ক. প্রত্যক্ষ ধননাশ হয়, খ, কলহ বৃদ্ধি পায়, গ. নানারকম রোগের উৎপত্তি হয়, ঘ. গৌরব-যশ-ক্যাতি লোপ পায়, ঙ. উলঙ্গ অবস্থায় ঘোরাফেরা করে এবং চ. বুদ্ধি লোপ পায় কিংবা বুদ্ধিনাশ হয়।[৯৩] এ বিষয়ে আরো দেখা যায় ;

উন্মত্তকা বিগতলজ্জগুণা ভবন্তি
দীনা সদা ব্যসনসোকপরাযণা চ।
জাতা ভবেসু বিবিধেসু বিরূপধেহা
পিত্বা হলাহলবিসং ব সুরং বিপঞ্ঞা[৯৪] ।

অর্থাৎ, অজ্ঞ মূর্খ ব্যক্তিরাই সুরাপান করে মৃত্যু পর মনুষ্য কুলে জন্মগ্রহণ করলেও তারা লজ্জাহীন, উন্মত্ত, দরিদ্র, বিপদগ্রস্থ, দুঃখ, মনস্তাপ, শোক পরায়ণ এবং কুৎসিৎ দেহের অধিকারী হয়।

এ সম্পর্কে আরো উল্লেখ রয়েছে ;

যো বারুণী অধনো অকিঞ্চনো
পিপাসো পিবং পপাগতো।
উদমিব ইনং বিগাহতি
অকুলং কাহতি খিপ্পমত্তনো।[৯৫]

অর্থাৎ, যে অকিঞ্চন দরিদ্র ব্যক্তি মদ্যপায়ী হয়, সুরাপানে আসক্ত হয়ে ইচ্ছে মতো সুরাপান করে, সে পানিতে নিমগ্ন হওয়ার ন্যায় ঋণ সাগরে ডুব দিয়ে অবিলম্বে নিজে নিজের সর্বনাশ করে।

Dhaka University Institutional Repository

পালি সাহিত্যে পঞ্চবিধ বাণিজ্যকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[৯৬] আধুনিক সমাজব্যবস্থায় এই পঞ্চবিধ বাণিজ্যের মাদকদ্রব্য সেবন ও ব্যবসা করা দণ্ডনীয় অপরাধও বটে। সুতরাং মাদকজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ সেবন যেমন মানসিক আচরণের পরিপন্থী তেমনি আবার ব্যবসাও মানসিক আচরণকে উদ্বুদ্ধ করে। তাই এটি সেবন এবং ব্যবসা সর্বত্রে পরিত্যাজ্য। বুদ্ধ প্রসঙ্গক্রমে বলতে গিয়ে বলেনে ; সুরা, মদ, গাঁজা সেবনকারী তার নেশা সেবনের দরুন ইহলোক-পরলোকে ভয়-বৈরব প্রসব করে এবং মানসিক দুঃখ বিষাদ ভোগ করে। মাদকজাতীয় নেশা সেবন হতে বিরতজন ইহলোক-পরলোকেও ভয়-বৈরব উৎপন্ন হয় না। মানসিক দুঃখ ও বিষাদ উৎপন্ন হয় না। মাদকজাতীয় দ্রব্য হতে বিরতজনের এরূপেই তেমন ভয়-বৈরব উৎপন্ন হয় না।[৯৭]

সকল প্রকার উন্নতির ক্ষেত্রে পঞ্চম শীলটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বতর অপরাধ হিসেবেই বিবেচিত। মন অপবিত্র হলে সব সাধনা, সকল প্রকার উন্নতিসহ সবধরনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। মাদকজাতীয় দ্রব্য গ্রহণকারী ব্যক্তি উন্মত্ত ও পাগল প্রায়। তার কোনো রকম হিতাহিত জ্ঞান থাকে না অর্থাৎ সে জ্ঞানশূন্য হয়। কোনটি কুশল আবার কোনটি অকুশল তা বুঝতে সক্ষম হয় না। সমাজে তাকে সবাই অপছন্দ করে এবং ঘৃণা করে। এক সময় বুদ্ধ গৃহপতি পুত্র সিগালোকে আহবান করে বলেছেন ; হে গৃহপতি পুত্র ! মাদক কিংবা মাদকজাতীয় দ্রব্য সেবনে ছয় বিষময় ফল রয়েছে। যথা[৯৮] : ক. অকারণে ধন নাশ হয় ; খ. অতিশয় কলহ বৃদ্ধি হয় ; গ. বিবিধ রোগের উৎপত্তি হয় ; ঘ. অকীর্তি প্রচার-প্রসার হয় ; ঙ. লজ্জাভাব শূন্য হয় এবং চ. মেধাহীন ও স্মৃতিশক্তি লোপ পায়। পালি সাহিত্য বা বৌদ্ধ সাহিত্যে পঞ্চ সম্পদের[৯৯] উল্লেখ রয়েছে। পঞ্চ সম্পদগুলো হলো ; ক. জ্ঞাতি সম্পদ, খ. ভোগ সম্পদ, গ. আরোগ্য সম্পদ, ঘ. শীল সম্পদ, এবং দৃষ্টি সম্পদ। শীল বিশুদ্ধ সুখকর। শীলপালনের দ্বারা বংশের ক্রমশঃ যশ-গৌরবগাথা শ্রীবৃদ্ধি হয়, শীলের দ্বারা ধন সম্পদ লাভ হয়।[১০০] বুদ্ধ দানের মধ্যে সংঘদানকে সর্বশ্রেষ্ঠ বা শ্রেয় বলেছেন। পঞ্চশীল রক্ষাকে তদ্‌পেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হয়।[১০১] এ প্রসঙ্গে বুদ্ধের অসাধারণ একটি নির্দেশনা রয়েছে যা সবাইকে সুন্দর আগামীর পথ রচনায় আগ্রহী করে তোলে। যথা :

যো পাণং অতিপাতেতি মুসাবাদঞ্চ ভাসতি
লোকে অদিন্নং আদিযতি পরদারঞ্চ গচ্ছতি।
সুরামেরেয় পানঞ্চ যো নরো অনুযুঞ্জতি
ইধেবমেসো লোকস্মিং মূলং খণতি অত্তনো।[১০২]

অর্থাৎ, যে প্রাণিহত্যা করে, পরের দ্রব্য গ্রহণ করে, ব্যভিচার বা পরদ্বার গমন করে, মিথ্যা কথা বলে এবং মাদক কিংবা মাদকজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করে সে ইহ জগতে নিজে নিজের ধক্ষংস সাধন করে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চশীলের প্রয়োজনীয়তা

পঞ্চশীল মানবজীবনের একধরনের রক্ষাকবচ বিশেষ। প্রাণিহত্যা, চুরি, মিথ্যা কামাচার বা ব্যভিচার, মিথ্যাভাষণ, এবং নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন করে নিজে নিজেরাই সর্বনাশ করে। পঞ্চ অধর্মকে ব্যবহার করে ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরি অন্যান্য মহৎ পেশায় নিয়োজিত থাকলেও সংসারে উন্নতি করতে পারে না। নানাবিধ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে। নিজের ভবিষৎ সুখ সমৃদ্ধির পথকে কণ্টকময় করে তোলে। পঞ্চশীলের সদর্থক দিক হিসেবে দেখা যায় ; প্রাণিহত্যা পরিহারপূর্বক তা থেকে বিরত থাকা। সমস্ত প্রাণীর প্রতি দণ্ডহীন-শস্ত্রহীন, লজ্জাশীল, দয়ালু চিত্ত এবং হিত কামনাযুক্ত হয়ে অবস্থান করা। অদত্তবস্তু পরিহার করে অদত্ত গ্রহণ হয়ে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা। অদত্তগ্রাহ, দত্তপ্রত্যাশী, অচৌর্য, শুচি ও শুভ্রচিত্তে অবস্থান করা। কামাচার পরিহারপূর্বক কামাচার হতে বিরত, মিথ্যা বাক্য পরিহারপূর্বক মিথ্যাভাষণ হতে বিরত। সত্যভাষী, সত্যসন্ধী, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, বিশ্বস্ত হয়ে অবস্থান করা। বিরোধ উৎপন্ন করার জন্য এদিকের কথা ওদিকে না বলা। ওদিকের কথা এদিকে না বলা। বিরোধগ্রস্ত লোকদেরকে মিলনকারী হওয়া, মৈত্রী পরায়ণ লোকদের উৎসাহ দাতা হওয়া বাঞ্চনীয়।[১০৩] মূর্খরা প্রমত্ততার কারণে পাপকার্য সম্পাদন করে। একই কারণে তারা অন্যজনদেরকে উদ্বুদ্ধ করে। এই অপূণ্যায়তন, উন্মাদনা ও বুদ্ধিহীনতা মূর্খ লোকেরই কর্ম। সুতরাং তাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত।[১০৪]

পুত-পবিত্র বিশুদ্ধ জীবন যাপনের পঞ্চশীলের অবদান অস্বীকার করা যায় না। এ নীতিতত্ত্বে এমন কিছু নির্দেশনা বিরাজমান যার দ্বারা জাতি-ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সবাই উপকৃত হতে পারে। এটি শুধুমাত্র বৌদ্ধদের জন্য প্রযোজ্য তেমনটি নয়। সকল প্রকার কুশলকর্মের মূল হলো 'শীল'। এখন প্রশ্ন হতে পারে- তাহলে কুশল কী? বুদ্ধ মতে, 'কুশল হলো, প্রাণিহত্যা হতে বিরতি কুশল, অদত্তগ্রহণ হতে বিরতি কুশল, ব্যভিচার হতে বিরতি কুশল, মিথ্যাবাক্য হতে বিরতি কুশল, পিশুন বাক্য হতে বিরতি কুশল, পুরুষ বা কর্কশ বাক্য হতে বিরতি কুশল, সম্প্রলাপ হতে বিরতি কুশল, অনভিধ্যা কুশল, অব্যাপাদ কুশল, সম্যক দৃষ্টি কুশল'।[১০৫] প্রাণিহত্যা হতে বিরতি, অদত্তগ্রহণ হতে বিরতি, ব্যভিচার হতে বিরতি, মিথ্যাবাক্য হতে বিরতি, পিশুন বাক্য হতে বিরতি, কর্কশ বাক্য হতে বিরতি, সম্প্রলাপ হতে বিরতি, অনভিধ্যা, অব্যাপাদ, সম্যক দৃষ্টিকে ক্রমান্বয়ে ধর্ম, অনাস্রব, অনবদ্য, অনুতাপের যোগ্য, পুনর্জন্মের হেতু ধক্ষংসকারী, সুখের হেতু প্রদানকারী, ধর্ম, সুখ বিপাক, আর্য মার্গ, শুক্লমার্গ সদ্ধর্ম, সৎপুরুষ ধর্ম, উৎপাদনযোগ্য ধর্ম, সম্পাদন যোগ্য ধর্ম ভবিতব্য ধর্ম, বহুলীকৃত ধর্ম এবং অনুস্মরণযোগ্য ধর্ম বলা হয়।[১০৬] কুশলকর্মের মূল হলো অলোভ-অদ্বেষ-অমোহ। কুশলকর্ম সম্পাদনে পঞ্চশীল সহায়তা করে। এটি সকলের সুখ আনয়নেও সহায়তা করে। এ প্রসঙ্গে দেখা যায়

Dhaka University Institutional Repository

> To abstain from evil and do well is the function of sila, the code of ethical conduct taught in Buddhidm. This function is never void of loving compassion. Sila embraces within it qualities of the heart, such as love, modesty, tolerance, pity, charity and happiness at the success of other[১০৭].

শীল পরস্পর পরস্পরকে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে। পারিবারিক সুখ-সমৃদ্ধিকরণে উদ্বুদ্ধ করে। প্রসঙ্গক্রমে হিরন্ময় বন্দ্যোপধ্যায়ের উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ; 'বুদ্ধের পঞ্চনীতিতে যেগুলো বর্জন করার কথা রয়েছে মানবজীবনকে সার্থক এবং সফল করে তোলার জন্য সেগুলো বর্জন করা দরকার'।[১০৮] তিনি আরো বলেন, যে জীবিকা হিংসাত্মক আচরণ এবং অসৎ ভাষণ, মাদকজাতীয় দ্রব্য প্রভৃতির সঙ্গে জড়িত তাও বর্জন করা উচিত।[১০৯] এখানে আরো উক্ত হয়েছে ; 'যে প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয় এবং অন্যকে প্রাণিহত্যা হতে বিরত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে ; যে নিজে অদত্তবস্তু গ্রহণ করে না এবং অন্যকে অদত্তবস্তু গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে না ; যে মিথ্যাকামাচার বা ব্যভিচারে লিপ্ত থাকে না এবং অপরকেও তা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে না ; যে মিথ্যাকথা বলা হতে বিরত হয় এবং অপরকে মিথ্যাকথা পরিত্যাগ করার জন্য পরামর্শ প্রদান করে ; যে ভেদপূর্ণ বাক্য বলা হতে বিরত হয় এবং অন্যকেও ভেদবাক্য না বলার জন্য অনুপ্রাণিত করে ; যে নিজে মিষ্টভাষী কিংবা প্রিয়ভাষী হয় এবং অন্যকে মিষ্টভাষণে উৎসাহ প্রদান করে ; যে বৃথাবাক্য বলা হতে বিরত এবং অন্যকে বৃথাবাক্য ভাষণে নিরুৎসাহিত করে ; যে নিজে অনভিধ্যালু হয় এবং অপরকে অনভিধ্যালু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে, যে নিজে অবিদ্বেষ পরায়ণ হয় এবং অপরকে তাতে প্ররোচিত করে ; যে সম্যক দৃষ্টি পরায়ণ হয় এবং অন্যকে সম্যক দৃষ্টি পরায়ণ হবারজন্য উদ্বুদ্ধ করে তারা কর্মানুসারে সুখভোগ লাভ করে।[১১০]

পঞ্চশীল সুন্দর সমাজ বির্নিমানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বুদ্ধের পঞ্চনীতি সহস্রাব্দের সংঘাতমুক্ত ও দারিদ্রমুক্ত নতুন মানবসভ্যতা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে সহায়ক হতে পারে। এগুলো শুধু বৌদ্ধদের জন্য পালনীয় বিষয় নয়, সমগ্র বিশ্বাবাসীদের জন্য তাঁর দেওয়া পঞ্চনীতি আদর্শমানব সমাজগড়ার অন্যতম হাতিয়ার। যত দ্রুত এর প্রচার-প্রসার সম্ভব হবে, ততোদ্রুত মানুষে মানুষে, রাষ্ট্র ও সমাজে-সমাজে ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য সৃষ্টির ক্ষেত্র সহায়ক হবে।[১১২] পঞ্চশীলের প্রায়োগিক ব্যবহার সম্পর্কে দেখা যায় ; The five precepts, along with the Triple Gem Refuge represent the motivating force for the purification of society. We must not only under take and ovserve the five precepts in passive manner; we must do

Dhaka University Institutional Repository

so actively as well. Not only must we retrain from killing. We must also protect life; not only must we retrain from stealing, we must also practice generosity; not only must retrain from sexsual misconduct; we must also give respect; not only we must we retrain from lying; we must give true words; and not only must we refrain from consuming intoxicants; we must also act correctly. This is because the meaning of the precepts.[১১৩] মানুষের মধ্যে যে গুণটি সবচেয়ে বেশী দরকার তা হলো শীল বা নৈতিকতা। নৈতিকতাবিহীন মানবাচরণ কখনোই দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। নীতি বা নৈতিকাতার ফলে একজন মানুষ সমাজব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এনে দিতে পারে। নৈতিকতায়ই পারে মানুষের মাঝে সুপ্ত যে জ্ঞান তার দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত করতে। যে পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মানুষ পাশবিক নানাবিধ অকল্যাণকর কাজে উদ্বুদ্ধ হয়, সেই সময় নৈতিকতার পথেই তার নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত ধম্মপদ-এর 'বুদ্ধবর্গ' নামক অধ্যায়ে নৈতিকতা সম্পর্কে উক্ত হয়েছে ;

সবক্ষ পাপস্স অকারণং কুসলস্স উপসম্পদা

সচিত্ত পরিযোদপনং এতং বুদ্ধানুসাসনং।[১১৪]

অর্থাৎ, সকল প্রকার পাপ বা অন্যায় কাজ থেকে বিরতি, কুশল কাজ সম্পাদন করা এবং আপন চিত্তকে সংযত করাই বুদ্ধগণের উপদেশ।

নৈতিকতা স্বাধীন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। একজন মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে নীতিবান হয় এবং নৈতিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ হয়। আধ্যাত্মিক সাধনায় লক্ষ্য অর্জনের জন্য সে প্রয়োজন কোনো অতিজাগতিক সত্তার ভয়-ভীতি থেকে বা কোনো ঐশ্বরিক শক্তিকে সন্তুষ্ট করার ধারণা থেকে উদ্ভুত নয় বরং আপন আপন সিদ্ধান্ত থেকে তা প্রসূত। নৈতিকতার দুটি দিক দেখা যায়। ক. নঞর্থক এবং খ. সদর্থক। তিনটি স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মাধ্যমে নৈতিকতার ধারণা প্রদান করা যায়। উদাহরণ :

ক. সকল প্রকার অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকা ;

খ. উত্তম বা কুশল কাজ সম্পাদন করা ;

গ. নিজের মন বা চিত্তকে পরিশুদ্ধ করা।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে 'নঞর্থক' দিকটির প্রধান যার অন্যতম ভিত্তি হলো সকল প্রকার অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকা। উত্তম বা কুশল কাজ সম্পাদন করা এবং নিজের মন বা চিত্তকে পরিশুদ্ধ করা হলো 'সদর্থক'। বুদ্ধের পঞ্চশীল হলো 'সদর্থক' দিকটির অন্যতম মূলস্তম্ভ। তিনি ছিলেন সারাজীবন নীতিবোধে বিশ্বাসী একজন মহামানব। তাঁর ধর্ম নীতিতত্ত্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পঞ্চশীল মানবচরিত্রকে বলিষ্ট করে তোলে। সমাজজীবনে চরিত্র নিষ্কলুষ, বিশুদ্ধ এবং সুন্দর না হলে সত্যিকার বিকাশ সাধন কখনো সম্ভব নয়। এতে রয়েছে অখন্ড মানবতার কথা, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা, আদর্শিক কথা এবং সঠিক দিক নির্দেশনার কথা। সর্বোপরি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় নৈতিকতায় উদ্বুদ্ধকরণের কথা।

পঞ্চশীলের পঞ্চানিশংস বা ফল

পঞ্চশীল হলে নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের প্রতিষ্ঠা ভূমি। অশুভ বা অকুশল চিন্তা-চেতনা প্রবেশ করতে দেয় না। 'মহাপরিনিবক্ষাণ সুত্তং' নামক গ্রন্থে[১১৫] পঞ্চশীলের আনিশংস ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে দেখা যায় একসময় বুদ্ধ পাটলী গ্রামের উপাসককে উপলক্ষ্য করে বলেন ; পঞ্চিমে গহপতযো আনিসংসা সীলবতো সীলসম্পদায। সকত মে পঞ্চ? ইধ গহপতযো সীলবা সীলসম্পন্নো, অপ্পমাদাধিকরন্থ মহন্তং ভোগক্খন্ধং অধিগচ্ছতি। অযং পঠমো আনিসংসো সীলবতো সীলসম্পদায। পুনচ পরং গহপতযো সীলবতো সীলসম্পনস্স ; কল্যাণো কিত্তিসদ্দো অব্ভুগচ্ছতি। অযং দুতিযো আনিসংসো সীলবতো সীলসম্পদায। পুনচ পরং গহপতযো সীলবা সীলসম্পন্নো ; যঞ্ঞদেব পরিসং উপসঙ্কমতি; যদি খত্তিযপরিসং, যদি ব্রাহ্মণ পরিসং, যদি গহপতিপরিসং যদি সমণ পরিসং, বিসারদো উপসঙ্কমতি, অমঙ্কুভূতো। অযং ততিযো আনিসংসো সীলবতো সীলসম্পদায। পুনচ পরং গহপতযো সীলবা সীলসম্পন্নো অসম্মূল্হো কালং করোতি। অযং চতুত্থো আনিসংসো সীল সম্পদায। পুনচ পরং গহপতযো সীলবা সীলসম্পন্নো কাযস্স ভেদা পরম্মরণা সুগতি সগ্গং লোকং উপ্পজ্জতি। অযং পঞ্চমো আনিসংসো সীলবতো সীলসম্পদায। ইমে খো গহপতযো পঞ্চ আনিসংসা সীলবতো সীলসম্পদাযাতি।

অর্থাৎ, হে গৃহপতিগণ! শীলপালন হেতু শীলবানের পাঁচটি আনিশংস বা ফল লাভ হয়। পাঁচটি আনিশংস বা ফলসমূহ হলো ; প্রথমতঃ ইহলোকে শীলবান শীলসম্পন্ন ব্যক্তি, অপ্রমত্ততার দ্বারা মহাভোগ সম্পত্তি লাভ করে। ইহাই শীলবানের প্রথম পুরষ্কার। দ্বিতীয়তঃ হে গৃহপতিগণ ! শীলবান ব্যক্তির কল্যাণ কীর্তি শব্দ (যশ ও সুখ্যাতি) সর্বত্র প্রচারিত হয়। ইহাই শীলবানের দ্বিতীয় পুরষ্কার। তৃতীয়তঃ হে গৃহপতিগণ! শীলবান ব্যক্তি, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি ও শ্রামণ চারি জাতীয় যে কোনো পরিষদে গমন করুক না কেন বিশারদ হয়ে নিঃসঙ্কোচে গমনাগমন করেন। চতুর্থতঃ হে গৃহপতিগণ! শীলবান ব্যক্তি সজ্ঞানে মৃত্যুবরণ করে। ইহা শীলবানের চতুর্থ পুরষ্কার। পঞ্চমতঃ

Dhaka University Institutional Repository

হে গৃপতিগণ! শীলবান ব্যক্তি কায় ভেদ, মৃত্যুর পর সুগতি লাভ করে। ইহাই শীলবানের পঞ্চম পুরষ্কার। হে গৃহপতিগণ! শীলবানের শীল পালনের এই পঞ্চ আনিশংস বা ফল লাভ করে।

শীলের আনিশংস বা ফল সম্পর্কে আরো উক্ত হয়েছে ;

ন গঙ্গা যমুনা চাপি সরভূ বা সরস্সতী

নিন্নগা বাচিরবতা মহীচাপি মহানদী।

সক্কুণন্তি বিসোধেতুং তস্মলং ইধ পাণিনং

বিসোধযতি সত্তানং যং বে সীলজলং মলং। [১১৬]

অর্থাৎ, গঙ্গা, যমুনা সরস্বতী, অচিরবতী ও মহতী মহানদীর পানিও প্রাণিদের পাপমল ধৌত করতে পারে না। বরঞ্চ শীলাচার রূপ পানির দ্বারাই মানবমনের পাপমল বিশোধিত করতে পারে।

প্রচলিত আইনে পঞ্চশীল

সুন্দর চরিত্রের আদিতে রয়েছে কুশলকর্ম। বর্তমান বিশ্বে যে শান্তির কথা হচ্ছে তা আদৌ হবে কিনা সন্দেহ রয়েছে। কেননা, একদিকে মারণাস্ত্রের হুমকি আবার অন্যদিকে শান্তি প্রক্রিয়া-তা কখনোই শুভ ফল দায়ক নয়। পৃথিবীতে শান্তিতে বসবাস করার ক্ষেত্রে বুদ্ধের পঞ্চশীল অনন্য ভূমিকা রাখতে পারে। 'ধর্ম' এবং 'আইন' দুটি আলাদা বিষয়। তবে দুটির মধ্যে মিল রয়েছে। যার ধারক ও বাহক হলো মানুষ। মানুষ রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাস করে তখন সেই দেশের আইন-কানুন মেনে চলতে হয়। অমান্যতায় হয় অপরাধ। অপরাধের জন্য রয়েছে শাস্তিভোগ, দণ্ডভোগ এবং অর্থদণ্ড। মেনে চলার ব্যাপারে মানুষের কোনো রকম বাধ্যবাধকতা নেই। কোনো রকম শাস্তি নেই। তবে ধর্ম অমান্যতায় রয়েছে পাপের বিধান। মৃত্যুর পর ধর্মীয় অনুশাসন ভঙ্গের জন্য প্রচলিত আইন ভঙ্গের মতো পাপীকে জবাবদিহি করতে হবে বলে মানুষ বিশ্বাস করে। ইহলোকে পাপের শাস্তি নেই বলে বিশ্বাস করে। তবু ধর্ম এবং আইন দুটিকে মেনে চলার চেষ্টা করে। কেউ ধর্মকে পরকাল ভেবে ভয় পায় আবার কেউ আইনকে ইহকাল ভেবে ভয় পায়। আবার অনেকেই আছে যারা দুটিকে ইহকাল ভেবে ভয় পায়। আমাদের দেশে প্রচলিত দণ্ডবিধি আইন ১৮৬০ সালে প্রণীত হয়। এখানে বুদ্ধ প্রদর্শিত পঞ্চশীলকে দেশে প্রচলিত আইনের পাশাপাশি একটি ছকাকারে[১১৭] প্রদান করা হলো :

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমানুসারে পঞ্চশীল	প্রচলিত আইনের সংজ্ঞা	দণ্ডবিধির ধারা	সর্বোচ্চ শাস্তি
১. প্রাণিহত্যা করো না। (যদি মানুষ-পশু হয়)	খুন কোনো পশুকে মৃত্যু ঘটনানোজনিত ক্ষতি	৩০২-৩০৪ (খ) ৪২৯	মৃত্যুদণ্ড ৫ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড
২. চুরি করো না।	চুরি	৩৭৯-৩৮০	৭ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড
৩. কামাচার	ব্যভিচার	৪৯৭	৫ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড
৪. মিথ্যা কথা বলো না।	মিথ্যা অভিযোগে ক্ষতি করা।	২১১	৭ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড
৫. মাদকজাতীয় দ্রব্য সেবন করো না।	মদ্যপ হয়ে কারো ক্ষতি করা	৫১০	২৪ ঘন্ট পর্যন্ত শাস্তি

বুদ্ধের পঞ্চশীল নৈতিক আচার-আচরণে বিশ্বাসী করে তোলে। নৈতিক উৎকর্ষ লাভের জন্য সর্ব প্রথম সকল প্রকার অনিয়ম, অনাচার, দূনীতি, অমঙ্গলজনক কাজকে পরিত্যাগ করে চরিত্রের বিশুদ্ধিতা আনা দরকার। যারা নীতিবান তাদের যশ-খ্যাতি বাতাসের অনুকূল-প্রতিকূল উভয় দিকে প্রবাহিত হয়। পঞ্চশীলের পরিপালন, পরিপোষণ পরিলালন সকল দেশে সকল কালে সর্বাবস্থায় মঙ্গলজনক, কল্যাণকর, হিতকর, মঙ্গলময় এবং সুখকর। ধর্মবর্ণনির্বিশেষে মানবকল্যাণে কিংবা মানব চরিত্রের উন্নয়নে পঞ্চশীল প্রাণ সঞ্চারক হিসেবে কাজ করে। পারস্পরিক ঐক্য-সংহতি, ভ্রাতৃত্ববোধ জাগরণেও এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দক্ষ মানবসম্পদ সম্প্রসারণ এবং সংরক্ষণে আজ থেকে আড়াই হাজার বছরের পূর্বে বুদ্ধ এই নীতির প্রবর্তন করেছিলেন। এক্ষেত্রে বুদ্ধ প্রদর্শিত পঞ্চশীলকে যুগান্ত সৃষ্টিকারী পদক্ষেপ হিসেবে অভিহিত করা হয়। নীতিগুলো শুধুমাত্র বৌদ্ধ অনুসারীদের জন্য প্রযোজ্য তেমনটি নয়। কেননা, বুদ্ধ ছিলেন সকল কালের উদ্ধে, সকল বর্ণের উর্দ্ধে। সকল ধর্মের উর্দ্ধে। তাঁর এই নীতিগুলো সর্বজনীন এবং সর্বকালীন।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা ও তথ্য নির্দেশিকা

১. শীলরত্ন ভিক্ষু, পালি-বাংলা অভিধান (ঢাকা : ২০০২), পৃ.২৬৫

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০১

৩. মহিম চন্দ্র অনূদিত, বিমুক্তিমার্গ (রাঙ্গামাটি-২০১২), পৃ. ১১

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১-১২

৫. প্রাগুক্ত ,পৃ. ১২

৬. T. W Rhys Davids and William Stede, Pali-English Dictionary (Delhi: 2003), p.712

৭. প্রসূন বসু সম্পাদিত, সৌন্দরানন্দম/১৩-২৬-২৮, ৯ম খণ্ড (কলিকাতা : ১৯৮০)

৮. অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া অনূদিত, পারিবারিক সম্প্রীতি (চট্টগ্রাম : ২০১০), পৃ. ১৯৯

৯. শীলানন্দ ব্রহ্মচারী অনূদিত, সংযুক্ত নিকায়, প্রথম খণ্ড (কলিকাতা : ১৪০০ বাংলা), পৃ. ১২৭

১০. Narada Mahathera, The Buddha and His Teaching, (Colombo: 1971), p. 161

১১. http://www.web.singnet.com.sg/~alankhoo/precepts.html

১২. http://www.urbandharma.org/udharma2/5precepts.html

১৩ .গিরিশ চন্দ্র বরুয়া অনূদিত, ধম্মপদ (ঢাকা : ১৯৭৭), পৃ. ১২৬

১৪. প্রজ্ঞাবংশ ভিক্ষু সম্পাদিত, বিশুদ্ধিমার্গ ও বৌদ্ধ সাধনা (কলিকাতা : ১৯৩৬), পৃ. ৫৫

১৫. শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত, মিলিন্দ প্রশ্ন (কলিকাতা : ১৯৮৭), পৃ. ৩৪

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

১৮. বিমুক্তিমার্গ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

১৯. প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষ অনূদিত, অঙ্গুত্তর নিকায়, পঞ্চম নিপাত (রাঙ্গামাটি : ২০০৮), পৃ. ১৯০

২০. ধম্মপদ, ক্রোধবর্গ/২৩১

২১. ধম্মপদ, ক্রোধবর্গ/২৩২

২২. ধম্মপদ, ক্রোধবর্গ/২৩৩

Dhaka University Institutional Repository

২৩. সুমঙ্গল বড়ুয়া, বুদ্ধবাণীর মূলমন্ত্র (ঢাকা : ২০১০), পৃ. ১১৭

২৪. জ্যোতিপাল স্থবির অনূদিত, আচার্য শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতার (ঢাকা : ১৯৯৪), পৃ. ২৫

২৫. পারিবারিক সম্প্রীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯

২৬. দীপঙ্কর, বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশন-এর মুখপত্র (ঢাকা : ২০০০), পৃ. ২৯

২৭. http://www.web.singnet.com.sg/~alankhoo/precepts.html

২৮. Phra Suntharn Plamintr, Basic Buddhism Course, (USA :1991),113

২৯. http://www.angelfire.com/indie/ann_jonesl/sila.html

৩০. Robert Smitheram Translated, The Five Precepts (USA : 2011), p. 1

৩১. ধম্মপদ, চিত্ত বর্গ/৪৩

৩২. ধম্মপদ, ক্রোধ বর্গ/২৩৪

৩৩. ধম্মপদ, মার্গবর্গ/২৮১

৩৪. ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, দীর্ঘ নিকায়, তৃতীয় খণ্ড (কলিকাতা : ১৩৬১), পৃ. ২৩৭

৩৫. ড. বেণীমাধব ও ফণীভূষণ বড়ুয়া স্মারক বক্তৃতার পঞ্চম বক্তৃতা, প্রবন্ধ : মহান বুদ্ধের উজ্জ্বল উত্তরাধিকার ও একুশ শতকের বিশ্ব, অধ্যাপক যতীন সরকার, অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, ১ জুন, (চট্টগ্রাম : ২০০৭), পৃ. ২১

৩৫/ক. শিশির বড়ুয়া চৌধুরী সংকলিত, সদ্ধর্ম-রত্ন সংগ্রহ, (চট্টগ্রাম : অমিতাভ প্রকাশনী, ২০১৬)

৩৬. ধর্ম্মতিলক স্থবির, সদ্ধর্ম রত্নাকর (কলিকাতা : ১৯৩৬), পৃ. ৮৯

৩৭. Morris Edited, Saddhammopayan, Journal of Pali Text Society (London : 1887), Dasa Akusala Adinav/59-60

৩৮. ধম্মপদ, দণ্ডবর্গ/১৪২

৩৯. সাধনানন্দ মহাস্থবির অনূদিত, সুত্ত নিপাত (বান্দরবান : ২০০৭), পৃ. ১০৪

৪০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছিন্নপত্রাবলী (কলিকাতা : ১৮৯৪), পৃ. ১১৭

৪১. মিসেস নীরু বড়ুয় অনূদিত, পালিকাব্যে তেলকটাহ গাথা (ঢাকা : ২০০৮), পৃ. ৩১ ও ৪৪

৪২. প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু অনূদিত, অঙ্গুত্তর নিকায়, দশম ও একাদশ নিপাত (রাঙ্গামাটি : ২০১১), পৃ. ২১৫

৪৩. শ্রী ধর্ম্মজ্যোতি স্থবির অনূদিত, খুদ্দক পাঠো (কলিকাতা : ১৯৫৫), পৃ. ৪৬

Dhaka University Institutional Repository

৪৪. ন তেন অরিযো হোতি যেন পানানি হিংসতি

অহিংস সবক্ষপাণানং অরিযোতি পবুচ্চতি। ধম্মপদ, ধর্মার্থ বর্গ/২৭০

৪৫. শ্রী ধর্ম্মজ্যোতি স্থবির, খুদ্দক পাঠো প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

৪৭. S, Tachibana The Ethics of Buddhism (New Delhi : 2013), p. 189

৪৮. Saddhammopayan, Ibid, Dasa Akusala Adinav/77

৪৯. নিরোধানন্দ ভিক্ষু, শীলে আত্ম প্রতিষ্ঠা (চট্টগ্রাম : ২০০৮), পৃ. ৩১

৫০. শ্রী ধর্ম্মতিলক স্থবির, খুদ্দক পাঠো প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

৫১. রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, পালি সাহিত্যে ও ইতিহাস (ঢাকা : ১৯৮৮) পৃ. ৩০১

৫২. সাধনানন্দ মহাস্থবির অনূদিত, সুত্ত নিপাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

৫৩. মিসেস নীরু বড়ুয়া, পালি কাব্যে তেলকটাহ গাথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১ ও ৪৪

৫৪. প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষ অনূদিত, অঙ্গুত্তর নিকায়, দশম ও একাদশ নিপাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫

৫৫. Saddhammopayan, Ibid, Dasa Akusala Adinav/62-63

৫৬. S Tachibana, Ibid, p. 62

৫৭. Saddhammopayan, Ibid, Dasa Akusala Adinav/78

৫৮. নিরোধা ভিক্ষু, শীলে আত্ম প্রতিষ্ঠা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪-৩৫

৫৯. শীলররত্ন ভিক্ষু, পালি-বাংলা অভিধান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

৬০. বোধিপাল শ্রামণ, বিদর্শন পূর্ণ শান্তি সমাধান (চট্টগ্রাম : ১৯৯৯), পৃ. ১১৫

৬১. বিনয়েন্দ্র নাথ চৌধুরী, মধ্যম নিকায়, তৃতীয় খণ্ড (কলিকাতা : ১৯৯৩), পৃ. ৬৬

৬২. কামতো জাযতে সোকো কামতো জাযতে ভযং

কামতো বিপ্পমুত্তস্স নত্থি সোকো কুতো ভযং। ধম্মপদ,প্রিয়বর্গ/২১৫

৬৩. অজ্ঞচরিয বথুঞ্চ তত্থ সেবনমানসং

মগ্গেনমগ্গভজনং তীণি অব্রহ্মচারিণো। সদ্ধম্ম রত্নাকর, পৃ. ৮৯-৯০

৬৪. প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু, অঙ্গুত্তর নিকায়, দশম ও একাদশ নিপাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫

Dhaka University Institutional Repository

৬৫. সাধনানন্দ মহস্থবির, সুত্ত নিপাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪-২৮

৬৬. মিসেস নীরু বড়ুয়া, পালিকাব্যে তেলকটাহ গাথা, প্রাগুক্ত, পৃ, ৩১ ও ৪৫

৬৭. ধম্মপদ, নিরয় বর্গ/৩০৯

৬৮. ধম্মপদ, নিরয় বর্গ/৩১০

৬৯. সুত্ত নিপাত. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

৭০. ধর্মদীপ্তি মহাস্থবির, বুদ্ধের জীবন ও বাণী (চট্টগ্রাম : ১৩৯৯ বাংলা) , পৃ. ৮৬

৭১. শীলানন্দ ব্রহ্মচারী অনূদিত, সংযুক্ত নিকায়, প্রথম খণ্ড (কলিকাতা : ১৪০০ বাংলা), পৃ. ৯

৭২. H. Saddhatissa, Buddhist Ethics (London : 1970), P.6

৭৩. নিরোধানন্দ ভিক্ষু, শীলে আত্ম প্রতিষ্ঠা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

৭৪. শ্রী ধর্ম্মতিলক স্থবির, খুদ্দক পাঠো, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

৭৫. সাধনানন্দ মহাস্থবির অনূদিত, সুত্ত নিপাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

৭৬. মিসেস নীরু বড়ুয়া, পালিকাব্যে তেলকটাহ গাথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১ ও ৪৫

৭৭. সাধনানন্দ মহাস্থবির অনূদিত, সুত্ত নিপাত, প্রাগুক্ত, গাথা-১৮৪

৭৮. Saddhammopayan, Ibid, Dasa Akusala Adinav/66

৭৯. রাজগুরু শ্রীমৎ ধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির অনূদিত, দীর্ঘ নিকায়, প্রথম খণ্ড (রেঙ্গুন : ১৯৬২), পৃ. ৪

৮০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

৮১. Saddhammopayan, Ibid, Dasa Akusala Adinav/67

৮২. ধম্মপদ, দণ্ডবর্গ/১৩৩

৮৩. ধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

৮৪. ধম্মপদ, সহস্রবর্গ/১০০

৮৫. প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু, অঙ্গুত্তর নিকায়, দশম ও একাদশ নিপাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬

৮৬. সাধনানন্দ মহাস্থবির অনূদিত, সুত্ত নিপাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

৮৭. নিরোধানন্দ ভিক্ষু, শীলে আত্ম প্রতিষ্ঠা, পৃ. ২৫

৮৮. করুণাবংশ ভিক্ষু , পাচিত্তিয়া (চট্টগ্রাম : ২০০৭), পৃ. ১৯৬

Dhaka University Institutional Repository

৮৯. শ্রী ধর্ম্মতিলক স্থবির, খুদ্দক পাঠো, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

৯০. সাধনানন্দ মহাস্থবির অনূদিত, সুত্ত নিপাত, , ১০৫

৯১. ইত্থী সুরাধুত্তো অক্খধুত্তো চ যো নরো

লদ্ধং লদ্ধং বিনাসেতি তং পরাভবতো মুখং। সুত্ত নিপাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

৯২. ঈশান চন্দ্র ঘোষ, জাতক, প্রথম খণ্ড, জাতক সংখ্যা-৮১

৯৩. ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, দীর্ঘ নিকায়, তৃতীয় খণ্ড (কলিকাতা : ১৩৬১), পৃ. ১৫০

৯৪. মিসেস নীরু বড়ুয়া, পালিকাব্যে তেলকটাহ গাথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২ ও ৪৫

৯৫. ধর্মতিলক স্থবির, সদ্ধর্ম্ম রত্নাকর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭

৯৬. পঞ্চবিধ বাণিজ্যগুলো হলো : ক. প্রাণি ব্যবসা, খ. মাংস ব্যবসা, গ. মাদকজাতীয় দ্রব্য ব্যবসা, ঘ. অস্ত্র ব্যবসা এবং ঙ. বিষ ব্যবসা।

৯৭. প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু, অঙ্গুত্তর নিকায়, দশম ও একাদশ নিপাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫

৯৮. ভিক্ষুশীল ভদ্র, দীর্ঘ নিকায়, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

৯৯. ভিক্ষু শীলভদ্র, দীর্ঘ নিকায়, অখণ্ড, পৃ. ৫৩২ নি

১০০. ভিক্ষু শীলভদ্র, দীর্ঘ নিকায়, অখণ্ড, পৃ. ৪৪২

১০১. ভিক্ষু শীলভদ্র, দীর্ঘ নিকায়, অখণ্ড, পৃ. ৪৪৬

১০২. ধম্মপদ, মলবর্গ/২৪৬ ও ২৪৭

১০৩. রাজগুরু শ্রীমৎ ধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির অনূদিত, দীর্ঘ নিকায়, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

১০৪. মদাহি পাপানি করোন্তি বালা করোন্তি চঞ্ঞেজনে পমত্তে

এতং অপুঞ্ঞায়তনং বিজ্জতে উন্মাদনং মোহনং বালকন্তং। সুত্ত নিপাত, পৃ, ১০৫

১০৫. বেণীমাধব বড়ুয়া অনূদিত, মধ্যম নিকায়, প্রথম খণ্ড (কলিকাতা : ১৯৪০), পৃ. ৪৬

১০৬. প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু, অঙ্গুত্তর নিকায়, দশম ও একাদশ নিপাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯-৩৪১

১০৭. Gems of Buddhism, (Kuala Lumpur) : 1999), p. 159

১০৮. রনব্রত সেন সম্পাদিত, ধম্মপদ, প্রবন্ধ : গৌতম বুদ্ধের দার্শনিক চিন্তা (কলিকাতা :১৯৮৮) পৃ. ২১

১০৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

Dhaka University Institutional Repository

১১০. প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু, অঙ্গুত্তর নিকায়, দশম ও একাদশ নিপাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯-৩৪১

১১১. Phra Suntharn Plamintr, Basic Buddhism Course (USA :1991),113

১১২. সৌম্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধ ছাত্র সংসদের মুখপত্র (ঢাকা : ২০০০), পৃ. ৭

১১৩. .Robert Smitheram Translated, The Five Precepts, Ibid, p. 29

১১৪. ধম্মপদ, লোকবর্গ/১৮৩

১১৫. রাজগুরু শ্রী ধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির, মহাপরিনিব্বানং সুত্তং (চট্টগ্রাম : ১৯৪২), পৃ. ২৯

১১৬. ধর্মতিলক স্থবির, সদ্ধম্ম রত্নাকর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

১১৭. সংঘশক্তি (চট্টগ্রাম : ১৯৯৭), পৃ. ২২-২৩

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বুদ্ধের শিক্ষায় সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য : প্রায়োগিক ব্যবহারের স্বরূপ অন্বেষণ

মানবসংস্কৃতি ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারার স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বন-জঙ্গল কিংবা পাহাড়-পর্বত থেকে গ্রামের উৎপত্তি হয়। গ্রাম হলো কতকগুলো পরিবারের সমষ্টি। সমাজজীবন ব্যবস্থাপনায় সামাজিক সঙ্ঘবদ্ধতা (territorial orgination) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি কৌম যখন একটি নির্দিষ্ট জনপদে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে তখন আত্মীয়তার পরিবর্তে ভূমির সম্পর্ক দ্বারা তার সামাজিক সঙ্ঘবদ্ধতা (territorial orgination) সুসংগঠিত হয়। এই স্তরে কৃষিক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে একদল মানুষ কৃষিক্ষেত্রের নিকটে আশ্রয় গ্রহণ করে বসতি গড়ে তোলে। তখন তাদের বসতিগুলোকে বলা হয় গ্রাম। এসব গ্রাম ছিল বিভিন্ন আয়তনের। পালি সাহিত্য হতে জানা যায় ; কোনো কোনো গ্রাম ছিল এক কুটি। কোনোটি দুই কুটি। কোনোটি আবার তিন কুটি। এমন কি এক হাজার কুটির বিশিষ্ট্য গ্রামের নামও উল্লেখ রয়েছে।[১] ধারণা করা হয়, এখানে এক কুটির গ্রাম বলতে এমন কোনো গ্রামকে বোঝানো হতো যেখানকার প্রতি গৃহ ছিল এক কুটির বিশিষ্ট্য। অনুরূপভাবে দুই কুটিরের গ্রাম বলতে গ্রামটির প্রত্যেক গৃহে দুটি মাত্র কুটির ছিল এমনটি বোঝায়। হাজার কুটির বলেতে হাজারে গঠিত এক বা একাধিক সুবৃহৎ গৃহের সমষ্ঠিকে বোঝায়। এখানে সহজেই একটা বিষয় অনুধাবনযোগ্য যে, গ্রাম গড়ে উঠেছিল কতকগুলো গৃহ নিয়ে। গৃহ পরিবারের অন্যতম স্থান বিশেষ। পরিবার গড়ে উঠেছিল রক্তের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। পারিবারিক সম্পর্কোন্নয়নে বুদ্ধের নির্দেশনা সবাইকে একটি সুন্দর পথনিদের্শনা করে যার মাধ্যমে একটি নৈতিক ও সহনশীল পরিবার গড়ে তোলা সম্ভব। এ বিষয়ে B C Law বলেন ; 'The Buddha's doctrine of love and good will between man and woman is here set forth in a domestic and social ethics with more comprehensive details than elsewhere. In a canon was complied by members of a religious order and largely concerned with the mental experience and ideals of recluses, and with their outlook on the world, it is of great interest to find in it a sutra entirely devoted to outlook and relations of the layman and to his surroundings'.[২] বৌদ্ধমতে, যারা মহামানব বুদ্ধকে শরণ করে, তাঁর প্রবির্তত ধর্মকে শরণ করে এবং তার প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘকে শরণ করে তারাই গৃহী বৌদ্ধ (Buddhist laymen-laywomen) নামে অভিহিত। সঙ্ঘের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথেই গৃহীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এখানে

Dhaka University Institutional Repository

গৃহীপুরুষকে (Buddhist laymen)বলা হয় উপাসক এবং গৃহীনারীকে (laywomen) বলা উপাসিকা। বুদ্ধের প্রথম দুইজন উপাসক বণিক ত্রপুষ এবং ভল্লিক। তৃতীয় উপাসক হলেন যশ কুমারের মাতা-পিতা।[৩] বুদ্ধের সময়ে ধনী-দরিদ্র,-শ্রেষ্ঠী, কামার-কুমার-ছুতারসহ অন্যান্য পেশাধারী লোকেরা ব্যবসা-বাণিজ্য করে স্ত্রী-পুত্র, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়, স্বজন-বন্ধুবান্ধব, আচার্য-শিষ্য এবং দাসকর্মকার নিয়ে সুখে বসবাস করত। বুদ্ধ তাদের বিভিন্নভাবে আত্মসচেতন হয়ে কল্যাণমিত্রদের সংসর্গে সুখে জীবনযাপন করার উপদেশ প্রদান করেন। পরিবারকে সুখী ও সমৃদ্ধশালী করে তোলার জন্য বুদ্ধ অনেক উপদেশ প্রদান করেছেন যা পালি সাহিত্য কিংবা বৌদ্ধ সাহিত্যের বিভিন্ন স্থানে আমার দেখতে পাই। বুদ্ধ কর্তৃক প্রদত্ত উপদেশসমূহকে বলা হয় গৃহীবিনয়। সমাজ ব্যবস্থাপনায় পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিবারে এমন একজন প্রকৃত বন্ধু দরকার যার মাধ্যমে স্বামী পাবে একজন প্রকৃত স্ত্রী, স্ত্রী পাবে প্রকৃত স্বামী, মাতা-পিতা পাবে প্রকৃত সন্তান-সন্ততি, সন্তান-সন্ততি পাবে আদর্শবতী মাতা ও আদর্শবান পিতা, মিলবে আদর্শ বন্ধু-বান্ধব কিংবা আত্মীয়-স্বজন, আচার্য ও শিষ্য, প্রভু ও দাস কিংবা ভৃত্য। সমাজে উন্নতিকল্পে প্রথমেই দরকার কল্যাণমিত্রতা যার প্রায়োগিক ব্যবহার রয়েছে সমাজ ব্যবস্থাপনার সর্বত্রে। এ প্রসঙ্গে দেখা যায় ; having a good friend seeking out sources of wisdom and good examples. This is to live with or be close to good people, beginning with one`s parents as good friends in the family; to influence and encourage each other to betterment in conduct, mentality and wisdom. It is especially [that association which encourage one to] learn and develop communication and realitions with fellow human beings through goodwill, to have the faith to follow good examples, and to know how to utilize external resources, be they people, books or other communications media, for seeking knowledge and virtue for one`s life development, problem solving and constructive action.[৪] বুদ্ধের দৃষ্টিতে প্রত্যেক মানুষেরই রয়েছে সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। রয়েছে একে-অপরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, সম্মান দেখানো, বিশ্বাসস্থাপনসহ নানাবিধ কল্যাণময় দিক নির্দেশনা। বুদ্ধ নিজে কর্ম ও কর্মফলে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম-দর্শনে দেখা যায়- প্রত্যেকই নিজ নিজ কর্ম অনুয়ায়ী ফলভোগ ফলভোগ করে।[৫] সুতরাং এমন কর্ম করা উচিত যার মাধ্যমে কোনো রকম অকুশলকর্ম সৃষ্টি না হয়। তবে এটা সত্য যে বুদ্ধ কর্মহীন কিংবা অলস ব্যক্তিকে ধিক্কার জানিয়েছেন। খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত 'ধম্মপদ' নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে ;

যো চ বস্‌স জীবে কুসীতো হীনবীরিযো

একাহং জীবিতং সেয্যো বিরিযমারভতো দল্‌হং।[৬]

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ, যে অলস আর হীনবীর্য হয়ে একশ বছর বেঁচে থাকে তার জীবন অপেক্ষা দৃঢ়বীর্য ব্যক্তির একদিনের জীবনও শ্রেয়।

এখানে বুদ্ধ বলেছেন, সতত সৎ, সুন্দর, কুশল কর্মে উদ্যোগী হয়ে জীবনকে সুচারুরূপে গড়ে তোলা উচিত। এতে প্রত্যেকেই রয়েছে করণীয় কর্ম যার মাধ্যমে সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদিত হয়। বুদ্ধ মাতা-পিতাকে পূর্ব দিকরূপে, আচার্যদেরকে দক্ষিণ দিকরূপে, স্ত্রী-পুত্রদেরকে পশ্চিম দিকরূপে, দাস কর্মকারকদেরকে অধোধিকরূপে এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণদেরকে উর্দ্ধ দিকরূপে জানার উপদেশ দিয়েছেন।[৭]

মাতা-পিতা এবং সন্তান-সন্ততি

বৌদ্ধধর্মে ঈশ্বরের কোনোরূপ ধারণ নেই। ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই। অদৃশ কোনো বিশ্বাস কিংবা শক্তির উৎসও বৌদ্ধধর্মে নেই। তবে সাক্ষাৎ সৃষ্টিকর্তার কথা বুদ্ধ বলেছেন। সেই সাক্ষাৎ সৃষ্টিকর্তা হলো আমাদের পরম পূজনীয় মাতা-পিতা। আমরা মাতা-পিতা ব্যতীত কেউ পৃথিবীর আলোর মুখ দেখতে পেতাম না। বৌদ্ধ মতে, জন্ম লাভ করতে হলে তিনটি শর্ত পূরণ করা অবশ্যম্ভাবী। সেই তিনটি শর্ত হলো যথাক্রমে ; ক. নারীর ঋতুমতী হওয়া, খ. নারী পুরুষের মিলন এবং গ. গন্ধর্ব বা প্রতিসন্ধি (জন্ম) গ্রহণকারী সত্ত্বের উপস্থিতি।[৮] উপরি-উক্ত তিনটি শর্ত ব্যতীত অন্যকোনো ভাবে জন্মধারণ করার কথা বৌদ্ধধর্মে স্বীকৃত নয়। কী করে মাতা-পিতা সাক্ষাৎ সৃষ্টিকর্তা হয় এ বিষয়ে বুদ্ধ বলেন ; 'মাতা-পিতা ব্রহ্ম থেকেও শ্রেষ্ঠ এবং পূর্বাচার্য হিসেবে খ্যাত। আহবানের যোগ্য। পূজার লাভের যোগ্য'।[৯] এখানে মাতা-পিতাকে ব্রহ্ম থেকে শ্রেষ্ঠ এবং পূর্বাচার্য হিসেবে বলার অন্যতম কারণ হিসেবে দেখা যায়, জীবনধারণের প্রাথমিক ভিত্তি আমরা মাতা-পিতার কাছ থেকে লাভ করি। তাই সঙ্গতকারণে, ঈশ্বরজ্ঞানে মাতা-পিতাকে সেবা করা, পূজা করা, এবং আরাধনা করা সকলের উচিত।

মাতৃজঠরে প্রতিসন্ধি গ্রহণের পর থেকে মাতা-পিতা অহোরাত্র সন্তান-সন্ততির প্রতি মৈত্রী-করুণা-মুদিতা-উপেক্ষা ভাবনা করেন। সন্তান-সন্ততির প্রতি মাতার মৈত্রীভাব পোষণ কতো যে গভীর তা ব্যাখ্যা করতে বুদ্ধ 'করণীয় মৈত্রী সূত্র'[১০]-এ উল্লেখ করেছেন এভাবে ; 'মাতা যথা নিযং আয়ুসা এক পুত্তো অনুরক্খে' অর্থাৎ, ' মা নিজের জীবনের বিনিময়ে একমাত্র পুত্র রক্ষা করেন'। এখানে মাতার কথা বলা হলেও পিতার কথা সমভাবে প্রযোজ্য। কারণ মাতা-পিতা সন্তান-সন্ততির নিকট অবিচ্ছেদ্য অংশবিশেষ। যেখানে মাতার কথা বলা হয় সেখানে এমনিতেই পিতার কথা চলে আসে। আর যেখানে পিতার কথা বলা হয় সেখানে মাতার কথা চলে আসবেই। সুতরাং মাতাকে বাদ পিতা এবং পিতাকে বাদ দিয়ে মাতার অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না কখনো। প্রত্যেকেই নিজেকে দিয়ে বিষয়টি

Dhaka University Institutional Repository

অনুভব কিংবা উপলব্ধি করতে পারে। প্রত্যেক মাতা-পিতা নিজের ছেলেকে নিজের চেয়ে বেশী ভালোবাসে। কোনো সন্তান-সন্ততি দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হলে মাতা নিজের জীবনের বিনিময়ে তাদের সুস্থতা কামনা করে। এ ধরনের অনন্ত ভালোবাসা সন্তান-সন্ততি বুঝতে পারে কি। প্রশ্ন রয়েই যায়। এ প্রসঙ্গে মাতৃ বন্দনায় দেখা যায় ; 'দসমাসে উরে খীরং পাপয়েত্ব বড্ঢেসি দিবা রত্তিঞ্চ পোসেতি'। অর্থাৎ, মাতা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে গর্ভ রক্ষা করে রক্ত সঞ্জাত দুধ কোলে বসিয়ে পান করিয়ে দিন-রাত অতন্দ্র প্রহরীর মতো সন্তান-সন্ততিদের দেহ বৃদ্ধি করান। আবার পিতৃ বন্দনায় দেখা যায়, 'পোসেসি বুদ্ধিং কারেসি। বুদ্ধিকারো আলিঙ্গিত্বা চুম্বিতা পিযপুত্তকং সিক্খাপেতি নানা সিপ্পং।[১২] অর্থাৎ, আমাকে শিক্ষা দিয়ে জ্ঞানবুদ্ধি দান করেনে। প্রিয় সন্তান-সন্ততিকে সস্নেহে চুম্বন ও আলিঙ্গনের মাধ্যমে ক্রোড়ে-বক্ষে রেখে বর্ধনকারী, বিভিন্নরকম শিল্পশিক্ষা বিষয়ক জ্ঞান দান করেন। এখানে দেখা যায়, তারা অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে সন্তান-সন্ততিদেরকে উপযুক্ত করে তোলেন। মানুষের মতো মানুষ কারে তোলেন। সুতরাং বলা যায়, সন্তান-সন্ততিদের জীবনে মাতা-পিতার ঋণ অপরিসীম ও অতুলনীয় যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। শুধু মাত্র উপলব্ধি কিংবা অনুভব করা যায়।

মাতার-পিতার অনন্ত গুণরাশি অপরিশোধযোগ্য। মায়ের একনাল দুধের এবং পিতার এক মুহূর্তের পরিশ্রমের ঋণ শোধ করা যায় না কখনো। চামরী মৃগ যেমন জীবনের বিনিময়ে নিজের লেজকে রক্ষা করে। কানা লোক যেমন তার একমাত্র চক্ষুকে রক্ষা করে। ক্ষান্তিবান যেমন সর্বত্রে ক্ষান্তি প্রদর্শন করে। শীলবান যেমন নিজের জীবন দিয়ে শীল রক্ষা করেন অনুরূপভাবে মাতা-পিতা নিজের জীবনের বিনিময়ে তাদের গর্ভজাত-ঔরসজাত সন্তান-সন্ততিদের রক্ষা করে। মাতা-পিতা ব্রহ্মাসদৃশ। যে সব পরিবারে মাতা-পিতা পূজিত হন সেই পরিবার ব্রহ্মা সৃদশ। যে সব পরিবারে মাতা-পিতা পূজিত সেই সব পরিবার পূর্বাচার্য পরিবারের সাথে তুলনীয়। যে পরিবারে মাতা-পিতা পূজিত হন সেই পরিবার সম্মানের যোগ্য। বুদ্ধ একসময় উপদেশ প্রদান কালে ভিক্ষুসঙ্ঘকে উপলক্ষ্য করে বলেন ; 'হে ভিক্ষুগণ ! মাতা-পিতার গুণ অচিন্তনীয়। কেননা, মাতা-পিতা ছেলে-মেয়ের জন্য অনেক কিছু করেন। ছেলে-মেয়েদের লালন পালন করেন। ভরণ-পোষণ করেন। পুত্র-কন্যাদের বহু উপকারী। জন্ম হতেই রক্ষাকারী। তাদেরকে পরিচিতি করে তোলেন'।[১৩] পালি সাহিত্যে মাতা-পিতার অবদানকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। একদিন বুদ্ধ তাঁর মহতী ভিক্ষুসঙ্ঘকে উপলক্ষ্য করে বলেন ; 'যে গৃহে পুত্র-কন্যাদের নিকট মাতা-পিতা পূজিত হয় সে গৃহাদিতে তারা ব্রহ্ম সদৃশ। যে গৃহে পুত্র-কন্যাদের নিকট মাতা-পিতা পূজিত হয় সে গৃহাদিতে তারা পূর্বাচার্য সদৃশ। যে গৃহে পুত্র-কন্যাদের নিকট মাতা-পিতা পূজিত হয় সে গৃহাদিতে তারা পূর্বদেবতা সদৃশ। যে গৃহে পুত্র-কন্যাদের নিকট মাতা-পিতা পূজিত হয় যে গৃহাদিতে তারা পূজার উপযুক্ত'।[১৪] এখানে 'ব্রহ্মা' হচ্ছে মাতা-পিতার অধিবচন। 'পূর্বাচার্য' হচ্ছে মাতা-পিতার অধিবচন। 'পূর্বদেবতা' হচ্ছে মাতা-

Dhaka University Institutional Repository

পিতার অধিবচন। পূজার উপযুক্ত হচ্ছে মাতা-পিতার অধিবচন। তিনি আরো বলেন ; সেই সব গৃহ আহবানের যোগ্য যে গৃহে মাতা-পিতা পূজিত হন। বন্দিত হন। সম্মানিত হন। শ্রদ্ধা-ভক্তি লাভ করেন। আহবানের কারণ কি? কারণ মাতা-পিতা সন্তান-সন্ততির জন্য অনেক কিছু করেন। সন্তান-সন্ততিদের লালন-পালন করেন, ভরণ-পোষণ করেন এবং তাদেরকে পরিচিতি করে তোলেন।[১৫] আরো উল্লেখ রয়েছে ; তিনি আরো বলেন ; মাতা-পিতার প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য পালনের জন্য তারা ইহজীবনে প্রশংসা লাভ করে।[১৬] এ প্রসঙ্গে ভিক্ষুসঙ্ঘকে আহবান করে বুদ্ধ বলেন ; হে ভিক্ষুসঙ্ঘ !

পুত্রদের প্রতি অনুকম্পা পরায়ণ
ভবে আছে যে সকল মাতা-পিতাগণ ;
তারাই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম পূর্বাচার্য আর
আহুনেয় বলে খ্যাত হন নিরন্তর।
তদ্ধেতু তাদেরকে দেবতার মতন
সৎকার নমস্কার করে পণ্ডিতগণ ;
অন্ন-পানীয় ও বস্ত্র-শয্যা অনুলেপন
স্নান পদধৌতকরণ দ্বারা অনুক্ষণ।
মাতা-পিতার পরিচর্যায় হন রত
ভবেতে আছেন প্রকৃত পণ্ডিত যত ;
তাঁরাই ইহলোকে হন প্রশংসিত
পরলোকে স্বর্গেতেও হন প্রমোদিত।[১৭]

মাতা-পিতা সন্তান-সন্ততির উন্নয়নে আজীবন সংগ্রাম করেছেন। অমানবিক পরিশ্রম করেছেন । নিজে না খেয়ে সন্তান-সন্ততিদের খাইয়েছেন। অসুস্থ হলে নিজে সারারাত্র না ঘুমিয়ে পুত্র-কন্যাদের সেবা করেন। সুতরাং তাদের ঋণকে স্বীকার করা অত্যাবশকীয়।

মানুষ মাত্রই পুত্র সন্তান লাভ কামনা করে। বুদ্ধ বলেন ; পাঁচটি বিষয় বিবেচনা করে মাতা-পিতা পরিবারে মধ্যে পুত্র সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা করে। সেই পাঁচটি বিষয় হলো ; ক. সে আমাদের ভরণ-পোষণ করবে ; খ.

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের জন্য করণীয়াদি সম্পাদন করবে, গ. কুলবংশ দীর্ঘদিন রক্ষা করবে ; ঘ. পৈত্রিক সম্পত্তি যোগ্যতাবশে প্রাপ্ত হবে ; এবং ঙ. আমাদের মৃত্যুর পর প্রেতদের উদ্দেশ্যে দান করবে।[১৮]

এ বিষয়ে একটি উচ্ছ্বাস গাথা নিচে প্রদত্ত হলো ;

পণ্ডিতগণ করে চিন্তা পঞ্চ বিষয় অতি
পুত্র লাভের তরে তাই চিত্ত পায় গতি।
পুত্র মোদের করবে ভরণ-পোষণ
প্রয়োজনীয় কর্ম নিত্য করবে সম্পাদন।
কুলবংশ করবে রক্ষা দীর্ঘদিন ধরে
পিতৃসম্পদ প্রাপ্ত হবে মোদের মৃত্যুর পরে।
সর্বোপরি করবে পুত্র প্রেতোদ্দেশে দান
সেই হেতুতে তখন মোরা লভিব সুখ ত্রাণ।
পণ্ডিতগণ করে চিন্তা উক্ত পঞ্চ বিষয়,
পুত্র লাভের তরে চিত্ত বেগ প্রাপ্ত হয়,
সেই কারণে শান্ত আর সৎপুরুষগণ
কৃতজ্ঞ ও বাধিত থাকেন পুণ্যপূত মন।
মাতা-পিতার গুণ তারা করে অনুস্মরণ,
নিত্য করে সেবা পূজা তাদের আমরণ।
উপকারীর প্রত্যুপকার করে নিরন্তন
সেইরূপ মান্যকারী পালিত পুত্রগণ।
মাতা-পিতাকে করে পোষ্য অক্ষুন্ন মন,
যথাসময়ে করে তারা কুলবংশ রক্ষণ।
সেরূপ শীল ও শ্রদ্ধাবান পুত্র যত আছে
প্রশংসিত হয় তারা এ জগত মাঝে।[১৯]

Dhaka University Institutional Repository

পুত্র সন্তানে লাভের কথা এখানে উল্লেখ করা হলেও কন্যাা সন্তানকে সমাধিকার দেওয়া হয়েছে। মা যখন গর্ভে সন্ত ানকে ধারণ করে তখন পুত্র কিংবা কন্যা এ ধরনের চিন্তা করেননি। কন্যা সন্তানও তার জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সমাজ-সংসারে বিজয়িনী হয়। শাস্ত্রে পাঁচটি[২০] অপরিমেয় গুণের কথা বলা হয়েছে। এখানে সন্তান-সন্ততিদের ক্ষেত্রে বুদ্ধগুণের মতো মাতা-পিতার গুণও অপরিমেয় ও অসীম। এমতাবস্থায় মাতা-পিতাকেও সেবা করলে বুদ্ধকে পূজা করার ন্যায় পুণ্য সঞ্চিত হয়। দীর্ঘ নিকায়ের অন্তর্গত সিগালবাদ সূত্রে গৃহীদের ষড়দিকের মধ্যে মাতা-পিতা হলো পূর্বদিক। পাঁচ প্রকার কর্তব্য-দায়িত্ব পালনের দ্বারা সর্বদা মাতা-পিতারূপী দিক শ্রেষ্ঠ পূর্বাদিক বজায় রাখতে হয়। তা হলো : ক. মাতা-পিতা যেভাবে লালন-পালন করেছেন বৃদ্ধকালে তাদের ভরণ-পোষণ নির্বাহ করা ; খ. নিজের কাজ ফেলে মাতা-পিতার কাজ আগে সম্পাদন করা ; গ. বংশ মর্যাদা রক্ষা করা ; ঘ. তাদের উপদেশ মেনে চলে বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকার হওয়া ; এবং ঙ. পরলোকগত জ্ঞাতিবর্গের উদ্দেশ্যে দান দেওয়া কিংবা পুণ্যানোমোদন অনুষ্ঠান করা।[২১] তাছাড়া পাঁচ প্রকার কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে মাতা-পিতাকে পুত্রের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতে হয়। যেমন : ক. পুত্রকে পাপকর্ম থেকে নিবারণ করা ; খ. কল্যাণকর কাজে উৎসাহিত করা ; গ. উপযুক্ত বয়সে শিক্ষাদান করা ; ঘ. যথাসময়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করা ; এবং ঙ. যথাকালে বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করা।[২২] এখানে মাতা-পিতা এবং পুত্রগণ উভয়েই আপন আপন কর্ম সম্পাদন করা অভিব্যক্ত প্রকাশ পায়। 'মহামঙ্গল' সূত্রে মাতা-পিতার সেবা করাকে উত্তম মঙ্গল বলে বুদ্ধ অভিহিত করেন।[২৩] মাতা-পিতার গুণরাশি অচিন্তনীয়ও অকল্পনীয় যা প্রকাশ করতে বুদ্ধ ভিক্ষুসঙ্ঘকে উপলক্ষ্য করে বলেন ; ভিক্ষুগণ ! দুইজনের উপকারের প্রত্যুপকার জাগতিক কোনো রকম পূজা-সৎকার দ্বারা হয় না। সেই দুইজন কে কে ? মাতা এবং পিতা। হে ভিক্ষুগণ ! একস্কন্ধে শর্তবর্ষজীবী মাতাকে এবং অপরস্কন্ধে শতবর্ষ জীবী পিতাকে রেখে কোনো কৃতজ্ঞ সন্তান যদি সেখানেই মল-মূত্রাদি পরিত্যাগ করান, মাটিতে পা স্পর্শ না করিয়ে স্কন্ধেই ঔষধপত্র, খাদ্য-ভোজ্যাদি-পথ্যাদি দিয়ে সেবা করেন তথাপি ভিক্ষুগণ ! সন্তানের পক্ষে মাতা-পিতার ঋণের প্রত্যুপকার কিংবা ঋণ পরিশোধ করা হয় না কখনো। বস্তুত জাগতিক কোনো রকম সেবা-পূজা দিয়ে সন্তান-সন্ততি কখনো মাতা-পিতার উপকারের প্রত্যুপকার করা হয় না।[২৪] বুদ্ধ স্বয়ং নিজে মাতা-পিতাকে কত যে উর্দ্ধে স্থান দিয়েছেন তা বলে শেষ করা যাবে না। এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় ; রাজকুমার সিদ্ধার্থ এবং নন্দ উভয়েই গৃহত্যাগ করে চলে সন্ন্যাসধর্ম পালন করেন। সেই সময় বৃদ্ধ পিতা রাজা শুদ্ধোদনের রাজসিংহাসন গ্রহণের একমাত্র ভরসা ছিল পৌত্র রাহুলের উপর। পিতার নিকট সাত বছর বয়সী রাহুল পিতৃধন প্রার্থনা করলে বুদ্ধ রাহুলকেও বুদ্ধশাসনে প্রব্রজ্যা প্রদান করেন। এতে রাজা অত্যন্ত হৃদয় ভারাক্রান্ত হলেন। তারপর তিনি আশাহত হৃদয়ে বুদ্ধের কাছে গিয়ে তার ব্যাথার কথা জানিয়ে নিবেদন করলেন এভাবে ; কোনো পুত্র-কন্যাকে যেন তাদের মাতা-পিতার অনুমতি ব্যতীত প্রব্রজ্যা

Dhaka University Institutional Repository

বা উপসম্পদা প্রদান করা না হয়। বুদ্ধ পিতার অনুরোধ রক্ষার্থে মহতী ভিক্ষুসঙ্ঘকে আহ্বান করে তা বিনয়ের আইন হিসেবে প্রজ্ঞাপ্ত করেন।[২৫] উপরি-উক্ত কাহিনি থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, বুদ্ধ মাতা-পিতাকে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও মর্যাদার সাথে কতো উপরে স্থান দিয়েছেন। তাঁদের বাক্য শিরোধার্য করে সঙ্ঘে প্রবেশের আইন প্রণয়ন করে দেন তিনি।

পৃথিবীতে অগ্নি এবং পানি দুটি বিষয়রই যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। আমাদের শরীরে দুটির ধাতুরই গুরুত্ব রয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায়ও ধাতু দুটির গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যবহারিক জীবনে অগ্নি ও পানির সীমাহীন উপকারিতা লাভ করলেও তার বিপরীত দিকটাও আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন। অগ্নি ও পানি আমাদের জীবন রক্ষা উপাদানরূপে উপকার সাধন করে। আবার যদি আমরা তাদের অপব্যবহার করি তাহলে আমাদের জীবনের সর্বনাশ হয়। অনুরূপভাবে মাতা-পিতাকে অগ্নি এবং পানি হিসেবে মান্য করা যায়। মাতা-পিতাকে সেবা-পূজা কিংবা সৎকার করলে জীবনে যেমন মহামঙ্গল সাধিত হয় তদ্রুপ অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা, অপমান, তিরস্কার ও মনোকষ্ট দিলে সন্তান-সন্ততিদের জীবন হয় অভিশপ্ত। তাদের জীবনে নানারকম অমঙ্গল নেমে আসে। পালি সাহিত্যের 'পরাভব' এবং 'বসল' সূত্রে বুদ্ধভাষিত উপদেশে তারই প্রতিধ্বনি দেখা যায়। এখানে উভয় সূত্রে[২৬] বলা হয়েছে ;

যো মাতরং বা পিতরং বা জিন্নকং গতযোব্বনং

পহুসন্তো ন ভরতি তং পরাভবতো মুখং।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার বিগত যুবক-যুবতী মাতা-পিতাকে ধনবান ও সমর্থবান হয়ে ভরণ-পোষণ ও সেবা-পূজা করে না, তার জীবনে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সে বৃষল বা চণ্ডাল বলেই কথিত হয়। মাতা-পিতাকে অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা কিংবা মাতা-পিতার গুণরাশি অস্বীকার করলে জীবনে নেমে আসে দুর্দশা ও অমঙ্গল। তার একটি উদাহরণ নিম্নরূপ; বুদ্ধের দ্বিতীয় অগ্রশ্রাবক মহামৌদ্গল্যায়ন স্থবির। অনেক জন্ম আগে গৃহীজীবনে তিনি অত্যন্ত মাতৃ-পিতৃ ভক্ত হয়েও স্ত্রীর প্ররোচনায় মোহান্ধ হয়ে দৃষ্টিশক্তিহীন বৃদ্ধ মাতা-পিতাকে হত্যার জন্য গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে নিজে ডাকাত বেশ ধারণ করে মাতা-পিতাকে বেদম প্রহার করলে কাতর স্বরে বৃদ্ধ মাতা-পিতা ছেলের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন ; বাছা প্রাণধন! আমাদের ডাকাত প্রহার করছে। তুমি শীঘ্রই এখান থেকে পলায়ন করে নিজের প্রাণ রক্ষা করো।' কী আশ্চর্য ও হৃদয় বিদারক আবেদন। তারা নিজের জীবনের কথা বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে ছেলের জীবন কী করে রক্ষা করা যায় তা নিয়ে অস্থির হয়ে উঠে। সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার এহেন অকৃত্রিম ভালোবাসা দেখে ডাকাতরূপী সন্তান আবার ডাকাতের বেশ ত্যাগ করে মাতা-পিতার সামনে এসে দৃষ্টিশক্তিহীন বৃদ্ধ মাতা-পিতাকে নানাবিধ ভৈষজ্য দিয়ে চিকিৎসা করে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আবার পূর্বের

Dhaka University Institutional Repository

ন্যায় শ্রদ্ধা-ভক্তি ও সেবা-পূজা-সৎকার করার মাধ্যমে ভরণ-পোষণ করেন। মাতা-পিতার উপর অমানবিক নির্যাতন চালানোর ফলে তাকে অনেক জন্মাবধি নরকে পতিত হয়ে দুঃখ ভোগ করতে হয়। শুধু তাই নয়, অন্তিম জন্মে বুদ্ধের দ্বিতীয় অগ্রশ্রাবক মহাঋদ্ধিসম্পন্ন অরহৎ মৌদ্গল্যায়ন স্থবির হয়েও অবশিষ্ট কর্মফল থেকে অব্যাহতি পাননি। মৃত্যুর পূর্বে ডাকাতরা তাকে আঘাত করতে করতে মাংস পিণ্ডবৎ করে মৃত্যু নিশ্চিত মনে করে চলে চলে যায়।[২৭] কর্ম কাউকে ছাড় দেয় না। এখানে কর্মের ভয়ানক পরিণতি সবাইকে ভোগ করতে হয়। এখানে কর্মের অসাধারণ ও বিচিত্রশক্তির কথা জানা যায়। তাই উক্ত হয়েছে ;

কম্মস্সকা মানবা সত্তা কম্মদাযদা কম্মযোনি

কম্ম বন্ধু কম্ম পটিসরণা যং কম্ম করিস্সামি

কল্যাণং বা পাপকং বা তস্স দাযাদ ভবিস্সতি।[২৮]

অর্থাৎ, হে মানব ! প্রাণিগণের কর্মই আপন। সকলেই কর্মেরই উত্তরাধিকারী। কর্মই তাদের পুনর্জন্মের কারণ। কর্মই বন্ধু। কর্মই আশ্রয়। কুশল-অকুশল কর্মের মধ্যে যে যেরূপ কর্ম সম্পাদন করবে সে সেই রূপ কর্মেরই উত্তরাধিকারী হয়।

আরো উক্ত হয়েছে ;

যথাধেনু সহস্রেসু বৎস ভিন্দতি মাতরম্

যথাপুব্বং কৃত কর্মং কর্তার মনুগচ্ছতি।[২৯]

অর্থাৎ, সহস্র গাভীর মধ্যে বাছুর যেমন কেবল তার মাতার পিছনেই ধাবিত হয় তদ্রুপ পূর্বকৃত কর্মও অনুক্ষণ কর্তাকেই অনুসরণ করে।

কর্ম অনুসারে সবাইকে ফল ভোগ করতে হয় এটাই চিরন্তন রীতি। যে যেমন গাছের বীজ রোপন করে সে সেই রকমই ফল ভোগ করে। কুশলকর্ম সম্পাদন করলে সুফল লাভ করা যায়। অকুশলকর্ম সম্পাদন করলে দুঃখময় ফল ভোগ করতে হয়। এ প্রসঙ্গে দেখা যায় ; 'যেমন বীজ বপন করা হয় তেমনি ফলও লাভ হয়। কল্যাণকারী কল্যাণ লাভ করে। পাপকারী পাপপ্রাপ্ত হয়'।[৩০] মহাঋদ্ধিবান বুদ্ধের দ্বিতীয় অগ্রশ্রাবক মহামৌদ্গলায়ন স্থবির যেখানে অর্হৎ হয়েও মাতা-পিতাকে নির্যাতনের কর্মফল থেকে কোনো অবস্থাতেই রক্ষা পাননি। এখানে সাধারণ লোকজনের কথাই বা আর কি বলা হয়?

Dhaka University Institutional Repository

ত্রিপিটকের খুদ্দকনিকায়ের অন্তর্গত 'ইতিবুত্তক' গ্রন্থের 'পুত্র' নামক সূত্রে তিন প্রকার পুত্রের উল্লেখ রয়েছে। পৃথিবীতে তিন রকমের পুত্রের রয়েছে বলে বুদ্ধ তাঁর প্রবর্তিত ভিক্ষুসঙ্ঘ বলেন। তিন প্রকার পুত্র[৩১] হলো : ক. অতিজাত, খ. অনুজাত, এবং গ. অবজাত।

ক. অতিজাত/অভিজাত পুত্র : পৃথিবীতে কোনো কোনো মাতা-পিতা এমন পুত্র রয়েছে যারা বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করে না ; ধর্মের শরণ গ্রহণ করে না ; সংঘের শরণ গ্রহণ করে না ; প্রাণিহত্যা হতে বিরত নয় ; অদত্তবস্তু (চুরি) গ্রহণ হতে বিরত নয় ; মিথ্যা কামাচার (অবৈধভাবে শারীরিক মিলন) হতে বিরত নয় ; মিথ্যা বাক্য বলা হতে বিরত নয় ; মাদকজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত নয় এবং অবিরত দুঃশীল ও পাপধর্মে রত। তাদের পুত্র যদি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করে। ধর্মের শরণ গ্রহণ করে ; সংঘের শরণ গ্রহণ করে ; প্রাণিহত্যা হতে বিরত থাকে ; অদত্তবস্তু (চুরি) গ্রহণ হতে বিরত থাকে ; মিথ্যা ও অবৈধ মেলামেশা কিংবা কামাচার (অবৈধভাবে শারীরিক মিলন) হতে বিরত থাকে ; মিথ্যা বাক্য বলা হতে বিরত থাকে ; মাদকজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকে এবং শীলবান ও কুশলকর্ম সম্পাদন করে। এটি হলো অতিজাত/অভিজাত পুত্র।

খ. অনুজাত পুত্র : পৃথিবীতে কোনো কোনো মাতা-পিতার এমন পুত্র আছে যারা বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করে ; ধর্মের শরণ গ্রহণ করে ; সংঘের শরণ গ্রহণ করে ; প্রাণিহত্যা হতে বিরত ; অদত্তবস্তু (চুরি) গ্রহণ হতে বিরত ; মিথ্যা কামাচার (অবৈধভাবে শারীরিক মিলন) হতে বিরত ; মিথ্যা বাক্য বলা হতে বিরত ; মাদকজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত এবং শীলবান ও কুশলধর্ম সম্পাদন করে। তাদের পুত্র যদি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করে। ধর্মের শরণ গ্রহণ করে ; সংঘের শরণ গ্রহণ করে ; প্রাণিহত্যা হতে বিরত থাকে ; অদত্তবস্তু (চুরি) গ্রহণ হতে বিরত থাকে ; মিথ্যা কামাচার (অবৈধভাবে শারীরিক মিলন) হতে বিরত থাকে ; মিথ্যা বাক্য বলা হতে বিরত থাকে ; মাদকজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকে এবং শীলবান ও কুশলকর্ম সম্পাদন করে। তাদরকে অনুজাত পুত্র বলে।

গ. অবজাত পুত্র : পৃথিবীতে কোনো কোনো মাতা-পিতার এমন পুত্র আছে যারা বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করে ; ধর্মের শরণ গ্রহণ করে ; সংঘের শরণ গ্রহণ করে ; প্রাণিহত্যা হতে বিরত ; অদত্তবস্তু (চুরি) গ্রহণ হতে বিরত ; মিথ্যা কামাচার (অবৈধভাবে শারীরিক মিলন) হতে বিরত ; মিথ্যা বাক্য বলা হতে বিরত ; মাদকজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত এবং শীলবান ও পুণ্যময়-কল্যাণধর্মে রত থাকে। তাদের পুত্র যদি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ না করে। ধর্মের শরণ গ্রহণ না করে ; সংঘের শরণ গ্রহণ না করে ; প্রাণিহত্যা হতে বিরত না হয় ; অদত্তবস্তু (চুরি) গ্রহণ হতে বিরত না হয় ; মিথ্যা কামাচার (অবৈধভাবে শারীরিক মিলন) হতে বিরত না হয় ; মিথ্যা বাক্য বলা হতে বিরত না

Dhaka University Institutional Repository

হয় ; মাদকজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত না হয় এবং পবিত্র-কল্যাণময় ও কুশলকর্ম সম্পাদন করে না তারা অবজাত পুত্র।

উপরি-উক্ত তথ্য থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, যারা মাতা-পিতা থেকে জ্ঞানে-গুণে, বিদ্যা-বুদ্ধিতে, আচার-আচরণে, স্বভাব-চরিত্রে, ধর্ম-কর্মে, শৌর্য-বীর্যে উন্নত তাদেরকে অতিজাত কিংবা অভিজাত পুত্র হিসেবে পরিচিতি। মাতা-পিতার গুণে গুণান্বিত সন্তান-সন্ততিদের অনুজাত পুত্র হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া মাতা-পিতা থেকে অপেক্ষাকৃত কম গুণান্বিত সন্তান-সন্ততিদের অবজাত পুত্র বলা হয়েছে। জ্ঞানী-গুণী, শিক্ষিত-পণ্ডিত এবং ধার্মিক ব্যক্তি সব সময় অতিজাত/অভিজাত এবং অনুজাত সন্তান সন্ততি কামনা করে। কখনো অবজাত পুত্র কেউ কামনা করে না। বলতে গিয়ে উপরি-উক্ত বিষয় সম্পর্কে বুদ্ধ লেন ;

অভিজাত অনুজাত পুত্র দুই প্রকার
পণ্ডিতেরা কামনা করেন বারংবার।
অবজাত পুত্র কিন্তু কেহ নাহি চায়
বংশর মর্যাদা ধ্বংস করবে তাই।
অভিজাত অনুজাত এই পুত্রদ্বয়
জগতে তারাই প্রকৃত উপাসক হয়।
শ্রদ্ধা ও শীলের দ্বারা উদার তারা হয়
মাৎসর্য ত্যাগী তারা সুখ-শান্তিতে রয়।
পরিষদে সভায় তারা হয়ে আলোকিত
মেঘমুক্ত চন্দ্র যেন আকাশে উদিত।[৩২]

অভিজাত এবং অনুজাত পুত্র যেহেতু নীতিবান, শীলবান, বিনয়ী সুতরাং তারা সমাজে পরিবারে, সমাজে ও গ্রামে সর্বোপরি রাষ্ট্রে কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। তারা নিজেরা নিজেদের জীবনের সর্বদা মঙ্গল সাধন করে। তারা কৃতজ্ঞ ও তার প্রতি কৃত উপকার স্মরণ করে। বুদ্ধ তাদেরকে সৎপুরুষ বলে অভিহিত করেন।[৩৩] মাতা-পিতার অনুগতত হওয়া সন্তা-সন্ততির একান্ত বাঞ্চনীয়। যথাযথভাবে মাতা-পিতার সেবা ও পূজা করা অত্যাবশ্যক। বুদ্ধ ভিক্ষুসঙ্ঘকে বলেন ; 'হে ভিক্ষুসঙ্ঘ ! দুই জন ব্যক্তি হলো মাতা এবং পিতা। হে ভিক্ষু সঙ্ঘ! সন্তান-সন্ততি যদি মাতা-পিতাকে পৃথিবীর আধিপত্য দান করে বহু ধন সম্পত্তির অধিকারী তথাপিও মাতা-পিতার ঋণ সন্তান-সন্ততির

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষে পরিশোধ করা সম্ভব নয়। কারণ, মাতা-পিতা তার ছেলে-মেয়েদের লালন-পালন করেন, ভরণ-পোষণ করেন এবং পৃথিবীতে যোগ্য সন্তান-সন্ততি হিসেবে গড়ে তোলেন।[৩৪] বুদ্ধ এটা ভিক্ষুসঙ্ঘকে আহবান করে বলেন ; 'প্রয়োজন হলে মাতা-পিতাকে ভরণ-পোষণ এবং বস্ত্র দান করা যায়'।[৩৫] পরিবারে সন্তান-সন্ততির দায়িত্ব-কর্তব্য 'মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র, দাস-দাসকে স্ব-স্ব কাজে উৎসাহিত করা একান্ত করণীয়। মাতাপিতার সেবা করা। তাদের সকলের সুখ-অসুখে দেখাশোনা করা। এটি সম্ভব হলে পরিবারের গৌরব বৃদ্ধি পায়। সমৃদ্ধি লাভ করে। সুখ-শান্তি আনয়ন হয় এবং তা স্থিতি লাভ কর। মাতা-পিতা নিজের সর্বস্ব দিয়ে সন্তান-সন্ততিরকে মানুষের মতো আদর্শ মানুষ করে তোলেন। কখনো নিজের কথা মনে ভাবেননি। একসময় বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত বিহারে অবস্থান কালে সারথি মাতালি দেবেন্দ্র শক্রকে বললেন ;'যে গৃহস্থগণ ধার্মিক, শীলবান, ধর্মতঃ জীবনযাপন করে, স্ত্রী-পুত্র লালন-পালন করে এবং দাস-দাসীর খোঁজ খবর রাখেন তাঁরা জগতের শ্রেষ্ঠ।[৩৬] বুদ্ধ চার প্রকার[৩৭] বিষয়ের কথা বলেছেন। তন্মধ্যে হিতচর্যা অন্যতম। মাতা-পিতাকে সেবা করলে হিতচর্যা হয়। সন্তান-সন্ততির সুখ লাভ হয়। সম্মান বৃদ্ধি পায় সর্বত্রে পূজিত হয়। নিম্নলিখিত উক্তিতে তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায় ;

.. .. পিতা-মাতা সেবনে

পুত্র পায় সম্মান পূজা ঐ কার্য সেবনে।[৩৮]

'The Ethics of Buddhism' নামক গ্রন্থে If a man is dutiful to his parents, and faithful and affectionate to his wife and child, and protects them, the family life which these people lead among themselves will be a very peaceful and happy one; there will be nothing more to desire. And the village or the clan which these families compose will be very pleasent to live in. [৩৯] মাতা-পিতা সন্তান-সন্ততির নিকট দেবতুল্য তাতে কোনো রকম কারো সন্দেহ নেই। অনেক ত্যাগ স্বীকার করে দুঃখ-কষ্টের মাধ্যমে সন্তান-সন্ততিদেরকে মানুষের মতো মানুষ করে তোলে। সেই দেবতুল্য মাতা-পিতার সেবা না করলে পরিণাম ভয়াবহ বলে পালি সাহিত্য হতে জানা যায়। পরিণাম কেমন হতে পারে এ সর্ম্পকে উল্লেখ রয়েছে ;

পুত্রের প্রত্যক্ষ ব্রহ্মা পূর্বাচার্যদ্বয়
মাতা আর পিতা সর্বশাস্ত্রে কয়।
যে করে তাদের সেবা ধন্য সেই জন।

Dhaka University Institutional Repository

নরশ্রেষ্ঠ সকলের প্রশংসা ভাজন।

মাতৃসেবা না করলে, শুনি লোকে কয়

ধনশালী পুরুষের হয় ধনক্ষয়।

মাতার যে পরিচর্যা না করে দুমতি

ধননাশ হেতু দুঃখ পায় সেই অতি।

পিতৃসেবা না করলে, শুনি লোকে কয়

ধনশালী পুরুষের হয় ধনক্ষয়।

পিতার যে পরিচর্যা না করে দুমতি

ধননাশ হেতু দুঃখ পায় সেই অতি।[৪০]

আচার্য এবং শিষ্য

আচার্য-শিষ্য কিংবা শিক্ষক-শিষ্য বা ছাত্র উভয়ের মধ্যকার পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক মর্যাদাপূর্ণ। প্রত্যেক রাষ্ট্রে কিংবা সমাজে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই ধরনের সম্পর্ক আরো জোরদার হয়। বৌদ্ধধর্মে আচার্য-শিষ্যর সর্ম্পককে অত্যন্ত সম্মানজনক আসনে বসানো হয়েছে। শিক্ষক তাঁর শিষ্যদেরকে নৈতিক, শৃঙ্খলাবদ্ধ আচর-আচরণসহ উন্নতজীবন গঠনে সহায়তা করে। এ ধরনের সম্পর্ক রক্তের সম্পর্কের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। এ বিষয়ে J. Gonda বলেন ; the conception that true birth is birth to immorality, and that the teacher who initiates the novice to his 'new birth' shall be regarded as his father is Pan-Indian and also taken up by the Buddhist. [৪১] আচার্য-শিষ্যের দায়িত্ব-কর্তব্য কেমন হওয়া উচিত এ সম্পর্কে একটি সুন্দর নির্দেশনা রয়েছে বিনয় পিটকের 'মহাবর্গ' নামক গ্রন্থে। এখানে আচার্য শিষ্যকে পুত্রের ন্যায় এবং শিষ্য আচার্যকে পিতার ন্যায় সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার কথা বলা হয়েছে।[৪২] একজন আচার্যকে জগতে হতে হয় দেব-মানুষের মাঝে বিদ্যাচরণ সম্পন্ন।[৪৩] বুদ্ধ নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটিকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে। যথা ; 'মানুষ মাত্রই নিজেকে প্রথমে উত্তম ও সুন্দর একটি অবস্থানে বসাতে হবে। তারপর তিনি অন্যদেরকে সুখকর, কল্যাণকর, মঙ্গলময় কুশলকর্ম ও হিতসহ নানাবিধ উপদেশ দিতে পারে'।[৪৪] একসময় বুদ্ধ কৌশাম্বীর ঘোষিতারাম-এ অবস্থান করেন। এমন সময় মৌদ্গল্যায়নের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন ; মৌদ্গল্যায়ন ! পৃথিবীতে পাঁচ প্রকার আচার্য বিদ্যমান। তাঁরা হলেন : ক. কোনো কোনো আচার্য শীলে অপরিশুদ্ধ হয়েও মনে করে যে, আমি পরিশুদ্ধ শীলবান। আমার শীল পরিশুদ্ধ, বিশুদ্ধ ও অসংক্লিষ্ট। খ. কোনো কোনো আচার্য জীবিকা

Dhaka University Institutional Repository

অবলম্বনে অপরিশুদ্ধ হয়েও মনে করে যে, আমি পরিশুদ্ধ জীবিকাধারী। আমার জীবিকা পরিশুদ্ধ, বিশুদ্ধ ও অসংক্লিষ্ট। গ. কোনো কোনো আচার্য ধর্ম দেশনায় অপরিশুদ্ধ হয়েও মনে করে যে, আমি পরিশুদ্ধ ধর্ম দেশনাধারী। আমার ধর্মদেশনা পরিশুদ্ধ, বিশুদ্ধ ও অসংক্লিষ্ট। ঘ. কোনো কোনো আচার্য অপরিশুদ্ধ ব্যাখ্যাকারী হয়েও মনে করে যে, আমি পরিশুদ্ধ ব্যাখ্যাকারী। আমার ব্যাখ্যা পরিশুদ্ধ, বিশুদ্ধ ও অসংক্লিষ্ট। ঙ. কোনো কোনো আচার্য জ্ঞানদর্শনে অপরিশুদ্ধ হয়েও মনে করে যে, আমি পরিশুদ্ধ জ্ঞান দর্শনধারী। আমার জ্ঞানদর্শন পরিশুদ্ধ, বিশুদ্ধ ও অসংক্লিষ্ট।[৪৫] ব্যক্তি অন্যদেরকে উপদেশ দেয় বটে কিন্তু সে নিজেকে নিজে কী পরিমাণ বুঝতে পেরেছে সেটা দেখার বিষয়। একজন আচার্য মৌলিক তিনটি বিষয়কে গুরুত্ব প্রদান করে। এগুলো হলো যথাক্রমে : মুক্ত হস্তে দান দেওয়ার কথা ; খ. সদ্ধর্মানুশাসনে প্রবেশ করার কথা ; এবং গ. মাতা-পিতার ব্যয় নির্বাহ করার কথা।[৪৬] শুধুমাত্র আচার্য উপরি-উক্ত তিনটি বিষয়কে প্রাধান্য দেয় তাই নয়, জ্ঞানী ও সৎপুরুষ মাত্রই এগুলোর প্রশংসা করেন। প্রকৃত আচার্য লাভে শিষ্যের জীবনে মঙ্গল বয়ে নিয়ে আসে। প্রকৃত আচার্যের সান্নিধ্যে থাকলে সম্যক ধারণা উৎপন্ন হয়। সম্যক ধারণার বশবর্তী জনের সংকল্প সম্যক হয়। সম্যক সংকল্পকারীর বাক্যও সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। সত্যভাষণকারীর জীবিকা অবলম্বন সতত সুন্দর হয়। সৎ উপায়ে জীবিকা নির্বাহকারীর সকল প্রকার প্রচেষ্টাও সম্যক হয়। সম্যক প্রচেষ্ঠাকারীর মনোযোগ যথাযথ হয়। সম্যক চর্চাকারীর সমাধিও যথাযথ হয়।[৪৭] অর্থাৎ, প্রকৃত আর্চাযের সান্নিধ্যে থাকলে জীবন অর্থবহ নয় শুধু পরিশীলিত, মার্জিত, নন্দিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ, আদর্শিকভাবে নিজেকে গঠন করতে পারবে তাতে কোনো রকম সন্দেহ নেই। একজন আচার্যকে শীল, সমাধি এবং প্রজ্ঞাময় জ্ঞানের অধিকারী হয়। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা এবং উপেক্ষায় নিজেকে নিয়োজিত রাখে। সকল প্রকার পাপকাজ থেকে বিরত থাকে।[৪৮] একজন আচার্য হয় কল্যাণশীল, কল্যাণধর্মী এবং কল্যাণপ্রাজ্ঞ। তিনি এরূপ ধর্ম বিনয়ে পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে উত্তমপুরুষ বলে অভিহিত হয়।[৪৯] পালি বর্হিভূত 'মিলিন্দ প্রশ্ন' নামক গ্রন্থে শিষ্যর প্রতি আচার্যের পঞ্চবিংশতি গুণের উল্লেখ রয়েছে। গুণসমূহ নিম্নরূপ ; ১. সবসময় যত্নসহকারে রক্ষণাবেক্ষণ করা ; ২. দায়িত্ব-কর্তব্য বিষয়ে উপদেশ দেওয়া ; ৩. প্রমাদ-অপ্রমাদ সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়া ; ৪. শয়ন করার স্থান সম্বন্ধে দৃষ্টি দেওয়া ; ৫. অসুস্থ হলে সুস্থ করে তোলা ; ৬. খাদ্য-ভোজ্য পেয়েছে কিনা খোঁজ নেওয়া ; ৭. শিষ্যের বিশেষ চরিত্র সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া ; ৮. ভিক্ষান্ন বণ্টন করে দেওয়া ; ৯. সৎ কাজে উৎসাহিত করা ; ১০. সংসর্গ সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করা ; ১১. গ্রামের সঙ্গী সম্পর্কে লক্ষ্য রাখা ; ১২. বিহারের সঙ্গী সম্পর্কে লক্ষ্য রাখা ; ১৩. হাস্য-কৌতুক বর্জন করার উপদেশ বর্জন করা ; ১৪. তার দোষ ক্ষমা করা ; ১৫. আদর্শ শিক্ষা দান করা ; ১৬. অখণ্ড শিক্ষা দান করা ; ১৭. কোনো কিছু গোপন না রাখা ; ১৮. নিজজ্ঞান নিঃশেষে শিক্ষা দান করা ; ১৯. পুত্রের ন্যায় মনে করা ; ২০. শিষ্য যাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা ; ২১. প্রকৃত

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা ; ২২. মৈত্রী পরায়ণ হওয়া ; ২৩. বিপদে শিষ্যকে পরিত্যাগ না করা ; ২৪. কর্তব্য কর্মে অবহেলা করতে না দেওয়া ; এবং ধর্মানুসারে শিষ্যকে পরিচালিত করা।[৫০] পাঁচ প্রকার কর্ম দ্বারা আচার্যকে শিষ্যের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতে হয়। এগুলো হলো : ক. সুন্দরভাবে আচারণ-আচরণ করার শিক্ষা দান কার অর্থাৎ সুবিনীত করে তোলা ; খ. উত্তমরূপে শিক্ষা দান করা ; গ. পঠনীয়-অপঠনীয় এবং করণীয়-অকরণীয় বিষয় সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করেন ; ঘ. মিত্র সহায়ক নির্বাচনে সাহায্য করা ; এবং ঙ. আপদ-বিপদে সবতোভাবে রক্ষা করা।[৫১] আচার্য শিষ্যের জ্ঞান উন্নয়নে এভাবে সহায়তা করে আসছে অতীতের সুদীর্ঘকাল থেকে। আচার্য কতৃর্ক এ ধরনের অভয় পেয়ে শিষ্য শান্তিপূর্ণ এবং ভয়হীন হয়ে অবস্থান করে।

পালি সাহিত্য কিংবা বৌদ্ধ সাহিত্য শিষ্যকে 'সেকো' বা 'শিক্ষার্থী' নামে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ শিক্ষাধীন। একজন শিষ্য শিক্ষা করে উচ্চতর নৈতিকতা, উচ্চতর মননশীলতা এবং উচ্চতর প্রজ্ঞা। এই কারণেই তাকে সেকো বা শিক্ষার্থী বলা হয়।[৫২] সচরাচর শিষ্য তিন প্রকার ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে। সেই তিনি প্রকার তিন ইন্দ্রিয় হলো যথাক্রমে ; ক. অজ্ঞাত অনুসন্ধান ইন্দ্রিয় অর্থাৎ, অজ্ঞাত অনুসারে জানবো বিশ্বাসে কার্যক্ষমতা বা মনেবৃত্তি ; খ. প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয় অর্থাৎ, জ্ঞানের পরিপূর্ণতা লাভের মনেবৃত্তি ; এবং গ. জ্ঞাত ইন্দ্রিয় অর্থাৎ, সম্যক জ্ঞানে ইন্দ্রিয়।[৫৩] এ বিষয়ে বুদ্ধ বলেন ;

শিক্ষার্থী হয়ে শিক্ষা করো যা সর্বোত্তম
ঋজুমার্গ অনুসর বলে লোকোত্তম।
জানতে নাহি পারে অলস যেজন
আরো জানতে অক্ষম হয় মূর্খজন।[৫৪]

শিক্ষা গ্রহণকারী চার প্রকারের শিষ্য রয়েছে যারা নিজেরা নিজেরা শিক্ষা গ্রহণ করেন। চার প্রকার শিষ্য হলো ; ক. উদ্‌ঘাটিতজ্ঞ অর্থাৎ, যিনি অভ্যাসে সব বোঝেন ; খ. বিপশ্চিতজ্ঞ, অর্থাৎ, যিনি সামান্য ব্যাখ্যায় সব বুঝতে পারেন ; গ. নীয়মান অর্থাৎ, যিনি পদে পদে বুঝিয়ে বুঝিয়ে অর্থবোধ লাভ করেন ; এবং ঘ. পদ-পরম অর্থাৎ, যিনি পদমাত্র মুখস্থ করতে অক্ষম ও অর্থবোধেও অক্ষম।[৫৫] শিষ্য আচার্যকে যথোপযুক্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করে। একজন শিষ্যর চরিত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটন করা হয়েছে ; সকল আসক্তির বন্ধন ছিন্ন করে যিনি নির্ভয় হয়েছেন সেই নিরাসক্ত বন্ধনমুক্ত পুরুষকে ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত করা হয়।[৫৬] ত্রিবিধ রকম শিষ্যের পরিহানি হয় না কখনো। যথা : অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তায় আনন্দিত হয় না; অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তায় রমিত হয় না ; এবং অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা

Dhaka University Institutional Repository

বলে এমন লোকের সংসর্গে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন না। নিদ্রায় আনন্দিত হয় না ; নিদ্রায় রমিত হয় না ; এবং নিদ্রালু ব্যক্তির সংসর্গে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন না।[৫৭]

পালি সাহিত্য কিংবা বৌদ্ধ সাহিত্যে দেখা যায়, শিষ্য আচার্যের প্রতি পাঁচ প্রকারে কর্তব্য সম্পাদন করেন ; ক. শিক্ষকের সামনে আসন থেকে উঠে যাওয়া ; খ. সেবা করার জন্য আচার্যর নিকট গমন করা ; গ. আচার্যের আদেশ যথাযথ পালন করা ; ঘ. মনোযোগ সহকারে আচার্যের উপদেশ শ্রবণ করা ; এবং সসম্মানে বিভিন্ন রকম বিদ্যাভাস করা।[৫৮] শিষ্যকে আচার্যের অনুবর্তী হয়ে সকল প্রকার কর্ম সম্পাদন করা উচিত। সেই সময় সহবিহারী শিষ্য আচার্যের অনুবর্তী হতো না। বিষয়টি বুদ্ধকে জানালে বুদ্ধ তার নিন্দা করে বলেন ; শিষ্য আচার্যের অনুবর্তী না হয়ে চলতে পারে না। যে সম্যকভাবে অনুবর্তী না হবে তার দুক্কট অপরাধ হবে। অর্থাৎ, গুরুতর অপরাধ হবে।[৫৯] আচার্য শিষ্যকে পুত্র চিত্ত অর্থাৎ অপত্য স্নেহে দেখাশোনা করবেন। শিষ্য আচার্যের প্রতি পিতৃচিত্ত (বাৎসল্য) প্রদর্শন করবেন। এরূপে তারাঁ পরস্পর গৌরবে, সসম্ভ্রমে এবং সমজীবী হয়ে অবস্থান করলে_ধর্ম-বিনয়ে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি এবং বিপুলতা লাভ করবে। দশ কিংবা দশাধিক বয়স্ক শিষ্য অপরকে উপসম্পদা প্রদান করতে পারবে।[৬০]

স্বামী এবং স্ত্রী

বিবাহ সভ্যসমাজে অন্যান্য ব্যাপারের মত প্রকৃতির অভিপ্রায়ের সঙ্গে মানুষের অভিপ্রায়ের সন্ধি স্থাপনের ব্যবস্থা।[৬১] বিবাহ শুধু আমাদের সমাজে নয় সকল দেশে এবং সকলসমাজে মানুষের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিয়ে দুটি মানুষের মধ্যে যে সম্পর্কের সূচনা করে তার সঙ্গে অন্যকোনো সামাজিক বন্ধনের তুলনা করা হয় না।[৬২] K Sri Dhammananda বলেন ; Marriage is a partnership in which two individual of opposite sex but equal worth as human being choose to live together.[৬৩] বিবাহের মাধ্যমে একজন নারী-পুরুষ সমাজে মর্যাদার সাথে বসাস করে। তারা উভয়েই সততার মাধ্যমে পারিবারিক জীবন অতিবাহিত করে। তবে, এটা ঠিক যে, পারিবারিক সম্পর্ক উন্নয়নে একে-অপরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস যেমন স্থাপন করা দরকার তেমনি আবার একে-অপরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করাও ঐকান্তিক দায়িত্ব-কর্তব্য। একসময় বুদ্ধ শ্রাবস্তীর পূর্বারামে মিগারমাতা নির্মিত বিহারে অবস্থান করেন। এ সময় বিশাখা (যিনি মহোপসিকা নামে খ্যাত) বুদ্ধের নিকট গিয়ে উপস্থিত হন। বুদ্ধকে যথাযথ অভিবাদন বন্দনা জানিয়ে তিনি একপাশে উপবেশন করেন। তারপর বুদ্ধ তাকে উপলক্ষ্য করে বলেন ; বিশাখা ! চার গুণে গুণান্বিতা নারী সকলকে জয় করে। এ চারটি গুণ হলো :

Dhaka University Institutional Repository

ক. একজন স্ত্রী লোকে তার নিজ নিজ কর্মে সমর্থ ; খ. সে সুচারুরূপে দাস-দাসী পরিচালনা করতে সক্ষম ; গ. সে তার কাজের দ্বারা স্বামীর প্রিয়পাত্রী হয় এবং ঘ. সে তার স্বামীর সঞ্চিত ধন-সম্পদ দক্ষতার সাথে সংরক্ষণ করে।[৬৪] একসময় বুদ্ধ মধুরা (উত্তর ভারতের মথুরায় অবস্থিত) ও বেরঞ্জের মধ্যবর্তী রাস্তা দিয়ে গমন করছিলেন। হাঁটতে হাঁটতে কিছুক্ষণ পর বুদ্ধ পাশের এক বৃক্ষমূলে বসে বিশ্রাম করেন। এমন সময় রাস্তা দিয়ে কিছুসংখ্যক স্বামী-স্ত্রী গমন করে। বুদ্ধকে বৃক্ষমূলে দেখতে পেয়ে তারা বুদ্ধের নিকটে গিয়ে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করে। বুদ্ধ তাদেরকে উপদেশ করার সময় বললেন ; সংসার জীবনযাপনের চার রকমের স্বামী-স্ত্রী মিলন দেখা যায়। যথা :

ক. অসুরের সাথে অসুরীর মিলন কিংবা রাক্ষসের সাথে রাক্ষুসীর মিলন : জগতে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই নীতিহীন, দুঃশীল, মিথ্যাবাদী, হিংসুক, কর্কশভাষী, কৃপণ, পাপধর্ম পরায়ণ, কলহ পরায়ণ, হলে সে-ই মিলনকে বলা হয় অসুরের সাথে অসুরীর মিলন কিংবা রাক্ষসের সাথে রাক্ষুসীর মিলন।

খ. অসুরের সাথে দেবীর মিলন কিংবা রাক্ষসের সাথে দেবীর মিলন : জগতে স্বামী দুঃশীল, পাপধর্ম পরায়ণ, কৃপণ, কর্কশভাষী, মিথ্যাবাদী, হিংসুক, ক্রোধী, কিন্তু স্ত্রী শীলবতী, সদ্ধর্ম পরায়ণা, প্রিয়ভাষিনী ও পবিত্র-বিশুদ্ধ মনের অধিকারী সে-ই মিলনকে বলা হয় অসুরের সাথে দেবীর মিলন কিংবা রাক্ষসের সাথে দেবীর মিলন।

গ. অসুরীর সাথে দেবের মিলন কিংবা রাক্ষসীর সাথে দেবের মিলন : জগতে স্ত্রী দুঃশীল, পাপধর্ম পরায়ণা, কৃপণ, কর্কশভাষী, মিথ্যাবাদী, হিংসুক, ক্রোধী, কিন্তু স্বামী শীলবান ও শীলবান, সদ্ধর্ম পরায়ণ, প্রিয়ভাষী ও পবিত্র-বিশুদ্ধ মনের অধিকারী সে-ই মিলকে বলা হয় অসুরীর সাথে দেবের মিলন কিংবা রাক্ষুসের সাথে দেবের মিলন।

ঘ. দেবের সাথে দেবীর মিলন : জগতে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই কোনো রকম অন্যায় কাজ কিংবা গর্হিত কাজ করে না। তারা উভয়েই ধর্মের প্রতি অগাধ বিশ্বাস স্থাপন করে। শ্রদ্ধাযুক্ত ও প্রিয়ভাষী হয়। সংযত চিত্তের অধিকারী হয়। পাপকর্ম কিংবা পাপধর্ম সম্পাদন করে না। এই ধরনের মিলনকে বলা হয় দেবের সাথে দেবের মিলন।[৬৫]

উপরি-উক্ত চার রকমের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শেষোক্ত অর্থাৎ দেবের সাথে দেবীর মিলন স্বামী-স্ত্রীরই বুদ্ধ প্রশংসা করেছেন। নিম্নলিখিত উক্তি থেকে তারই সত্যতা প্রতিভাত হয়। যথা :

Dhaka University Institutional Repository

'.. .. ..উভয়ে শ্রদ্ধাশীল, মিষ্টভাষী, সংযত ধার্মিক,
দম্পত্তি তারা, পরস্পরের আনন্দদায়ক।
ভোগাকাঙ্ক্ষাবহুল, আমোদ প্রিয়ে আবির্ভাব,
সমাচরিতে লভে অমিত্র, দুঃখ কারাবাস।
উভয়ে হলে লোকে শীলবান ও ধর্মচারী,
দেবলোকে আনন্দিত, সব ইচ্ছা পূরণকারী'।[৬৬]

একসময় বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক প্রদত্ত বিহারে অবস্থান কালে সুজাতাকে উপদেশ প্রদানের সময় সাত প্রকার ভার্যা কিংবা স্ত্রীর কথা বলেছেন। এগুলো হলো[৬৭] যথাক্রমে :

ক. বধক সমা : যেই স্ত্রী দুষ্ট প্রকৃতির, অহিতকামী, পরপুরুষে আসক্ত, স্বামীর অমঙ্গলকামী এবং স্বামীকে অপমান ও অসম্মান করে সর্বোপরি স্বামী বধে উৎসাহিত হয় তাকে বধক সমা ভার্যা কিংবা স্ত্রী বলে।

খ. চোরী সমা : যে স্ত্রী-স্বামীর শিল্প-বাণিজ্য ও কৃষি দ্বারা কষ্টে অর্জিত ধন-সম্পদ বিনষ্ট করে তাকে চোরীসমা ভার্যা কিংবা স্ত্রী বলে।

গ. আর্য সমা : পুরুষের যে ভার্যা কিংবা স্ত্রী নিষ্কর্মা, আলস্য পরায়ণা, পেটুক, ব্যাভিচারিনী, স্বামীকে মহৎ কাজ সম্পাদনে নিরুৎসাহিত করে এবং স্বামীর বিনয়ী ভাষণ উপস্থাপনে ক্ষিপ্ত হয় তাকে আর্য সমা ভার্যা কিংবা স্ত্রী বলে।

ঘ. মাতৃ সমা : যে স্ত্রী প্রতিনিয়ত স্বামীর মঙ্গল কামনা করে, হিত কামনা করে স্বামীকে সকল প্রকার বিপদ-আপদ থেকে মা যেভাবে রক্ষা করে ঠিক সেই ভাবেই রক্ষা করে এবং স্বামী সঞ্চিত ধন সতত রক্ষা করে সেই ভার্যা কিংবা স্ত্রীকে মাতৃ সমা ভার্যা বলে।

ঙ. ভগ্নিসমা : যে স্ত্রী কনিষ্ঠা ভগ্নির ন্যায় স্বামীর প্রতি অনুগতা হয়, লজ্জাশীলা হয় এবং স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী সবকর্ম অত্যন্ত সুন্দর-সুষ্ঠভাবে সম্পাদন সেই ভার্যা কিংবা স্ত্রীকে ভগ্নি সমা বলে।

চ. সখী সমা : দীঘদিন পর কোনো সখী সখা দর্শনে যেভাবে আনন্দিত হয় সেরূপ স্বামীর আগমনে যে স্ত্রী আনন্দিত হয় সেই কুলসম্পন্না শীলবতী পতিব্রতা স্ত্রী-ই ভার্যা কিংবা স্ত্রীকে সখী সমা বলে অভিহিত।

Dhaka University Institutional Repository

ছ. দাসী সমা : যে স্ত্রী স্বামীর প্রতি কোনোরূপ ক্রোধ কিংবা বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে না, স্বামীর আদেশ মেনে চলে এবং সর্বোপরি স্বামী অনুগতা হয় তাকেই বলে দাসী সমা ভার্যা কিংবা স্ত্রী।

বুদ্ধ দাসী সমা ভার্যা কিংবা স্ত্রীর প্রশংসা করেছেন। অবিরত গুণগান করেছেন। এ বিষয়ে পালি কিংবা বৌদ্ধ সাহিত্যে রক্ষিত একটি চমৎকার পদ্যাংশ তুলে ধরা হলো ;

যে স্ত্রী হয় স্বামীর প্রতি করে না ক্রোধ প্রকাশ,
করে সহ্য পতির বাক্য নির্দোষ চিত্তে-
পুরুষের যে স্ত্রী/ভার্যা হয় অক্রোধী, স্বামী অনুগতা,
সেই স্ত্রী-ই দাসী সমা বলে পরিচিতা।[৬৮]

সংসারে নারীর অবস্থা প্রসঙ্গে খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত 'সুধাভোজন জাতক'-এ দেখা দেখা যায় ;

গৃহে পতিব্রতা নারী সুশীলা সদ্বংশ জাতা
রূপে-গুণে সৃদশী ভার্যার
তার সংসর্গে থাকি বাসনা সংযত করি
পরলোকে করতে সংসার।[৬৯]

নারী তার কর্তব্যকর্মের মধ্যে দিয়ে সকলের প্রিয়ভাজন হয়। একজন আদর্শবর্তী নারী চরিত্র বর্ণনা করা হয়েছে অঙ্গুত্তর নিকায়ের উগ্গহ বা উগ্রহ সূত্রে। উগ্গগ বা উগ্রহ-এর কন্যারা স্বামীদের গৃহে গমনকালে বুদ্ধ তার কন্যাদেরকে উপদেশ দিয়ে পরিবারের সুখ সমৃদ্ধি, হিত ও কল্যাণ কামনায় পঞ্চ বিষয়ে সচেতন হবার জন্য বলেন ; ক. স্ত্রী স্বামীর পূর্বে শয্যা ত্যাগ করবে এবং রাত্রে সকলে পরে শয্যা করবে। খ. স্বামীদের মাতা-পিতাকে সম্মান এবং শ্রদ্ধা করতে হবে, মান্য করতে হবে, পূজা করতে হবে। স্বামীর গৃহে বেড়াতে আসা আত্মীয়-স্বজনকে যথাযথ আসন ও পানীয় জল দিয়ে সেবা করতে হবে। গ. স্বামীর গৃহে যে সমস্ত কর্ম রয়েছে সে কার্য সমূহ নানাভাবে নিজেকে করতে হবে কিংবা অপরকে দিয়ে করাতে হবে। ঘ. স্বামীদের গৃহের আভ্যন্তিক লোকজন (দাস/অন্যান্য কর্মচারী) দ্বারা সম্পাদিত কর্মকে সম্পাদিত এবং অসম্পাদিত কর্ম অসম্পাদিতরূপে জানতে হবে। রোগীদের শারীরিক সক্ষমতা এবং অক্ষমতা সম্পর্কে জানতে হবে। ঙ. স্বামীরা যে সমস্ত ধন-সম্পদ, স্বর্ণ-রৌপ্য কঠোর পরিশ্রম করে লাভ করে তৎসমূহ অতি সযত্নে সংরক্ষণ করতে হবে।[৭০] বুদ্ধ এ বিষয়ে আরো বলেন ; একজন

Dhaka University Institutional Repository

স্ত্রীলোকের চার প্রকার গুণ যার মাধ্যমে তিনি সকলকে আপন করে নিতে পারে। এগুলো হলো যথাক্রমে ক. বিশ্বস্ত, খ. গুণবতী, গ. দানশীলা, এবং ঘ. বিদূষী।[৭১]

এ বিষয়ে 'ধম্মপদট্ঠকথা' নামক গ্রন্থে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আচরণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় মাধ্যমে একজন নারী সুশৃঙ্খলবদ্ধ ও আদর্শ পরিবার গঠেনে সমর্থ হয়। এই দশবিধ আচরণ ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী তার মেয়ে বিশাখাকে শ্বশুরালয়ে যাবার উপদেশাকারে প্রদান করেন। নারীর সংসার জীবনকে সুখময় করে তোলার জন্য তাঁর পিতা তাঁকে যে মূল্যবান দশটি[৭২] উপদেশ দিয়েছিলেন সেগুলো শুধু প্রাচীনকালে নয়, বর্তমান সময়েও যে কোনো নারীর জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। সেগুলো হলো

ক. ঘরের আগুন বাহিরে নিয়ে না। অর্থাৎ, শ্বশুর-শাশুড়ি, স্বামী এবং পরিবারের দোষকথা আগুন সাদৃশ।তা বাইরে কারো কাছে এমনকি পিত্রালয়েও সেকথা বলবে না। তাতে শ্বশুরবাড়ির গৌরব ও মর্যাদা নষ্ট হয়।

খ. বাইরের আগুন ঘরে আনবে না। অর্থাৎ, প্রতিবেশীরা শ্বশুর-শাশুড়ি, স্বামী ও পরিবারের অন্যান্যদের দোষ বললে সেকথা শুনে ঘরের কাউকে এমনকি দাস-দাসীকেও বলবে না। কারণ এটি আগুন সদৃশ যা পরিবারে অশান্তি বৃদ্ধি করবে।

গ. যে দেয় তাকে দেবে। অর্থাৎ, যারা কোনো দ্রব্য ধার নিয়ে পুনরায় ফেরত দিতে পারে তাদের দেবে।

ঘ. যে দেয় না তাকে দেবে না। অর্থাৎ, যারা ধার নিয়ে কখনো পরিশোধ করে না। তাদের ধার দেবে না।

ঙ. ধার নিয়ে দিতে না পারলেও দেবে। অর্থাৎ, যদি কোনো দরিদ্র আত্মীয়-স্বজন ধার নিয়ে ফেরত দেবার ইচ্ছা থাকলেও অভাবজনিত কারণে দিতে না পারে তাদের দেবে ।

চ. সুখে উপবেশন করবে। অর্থাৎ, শ্বশুর-শাশুড়ি, স্বামী প্রভৃতি আচার্যজনদের দেখে উঠতে না হয় এমন আসনে, জায়গায় কিংবা স্থানে বসবে।

ছ. সুখে আহার করবে। অর্থাৎ, শ্বশুর-শাশুড়ি, স্বামী প্রভৃতি আচার্যজনদের আহারের পর আহার করবে।

জ. সুখে শয়ন করবে। অর্থাৎ, শ্বশুর-শাশুড়ি, স্বামী প্রভৃতি আচার্যজনদের প্রয়োজনীয় কার্য সমাধান করে নিশ্চিত মনে শয়ন করবে।

Dhaka University Institutional Repository

ঝ. অগ্নি সেবা করবে। অর্থাৎ, অগ্নিতুল্য শ্বশুর-শাশুড়ি, স্বামী প্রভৃতি আচার্যজনদের পরিচর্যা করবে।

ঞ. গৃহদেবতাকে ভক্তি করবে। অর্থাৎ, শ্বশুর-শাশুড়ি,স্বামী প্রভৃতি আচার্যজনদের দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করবে।

একজন আদর্শবতী স্ত্রী স্বামীকে পুত-পবিত্র ও মঙ্গলময় পাপহীনকর্ম সম্পাদনে উদ্বুদ্ধ করে। স্বামীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। সকল প্রকার কুশল কর্মে স্বামীকে সহায়তা করে। স্বামীর অর্থ-বিত্ত নিজের বুদ্ধি ও কৌশল দিয়ে রক্ষা করে কিংবা সংরক্ষণ করে। পরিবারে সুখ-শান্তি আনয়নে অর্থনৈতিক উন্নয়নে কিংবা শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনে, বিনয়ীকরণে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ভূমিকা যা সবাইকে একবাক্যে স্বীকার করে নিতে হবে। বৌদ্ধ সাহিত্য একজন উত্তম স্বামীকে 'দেব' এবং একজন উত্তম স্ত্রীকে দেবী নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বুদ্ধ যে সমস্ত পুরুষ নৈতিক চরিত্রের অধিকারী মাতৃ-পিতৃ সেবক, বয়োঃবৃদ্ধদের সম্মান প্রদর্শনকারী, সুমধুরভাষী, বৃথা বাক্য-পিশুন বাক্য পরিহারকারী, মাৎসর্য অপোনদরত, সত্যবাদী এবং ক্রোধ দমনকারী সেই ব্যক্তিকেই বুদ্ধ সৎপুরুষ নামে অভিহিত করেন।[৭৩] স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য সম্পর্কেও বুদ্ধ যুগোপযোগী উপদেশ প্রদান করেন এভাবে ; স্ত্রীর প্রতি সম্মানসূচক বাক্য ব্যবহার করা। কখনো অভদ্র কিংবা অসম্মান আচারণ না করা। অপরের স্ত্রীর প্রতি আসক্ত না হয়ে নিজ স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত থাকা। স্ত্রীকে যথাযথ কর্তৃত্ব প্রদান করা। সবশেষে যথাসম্ভব বসন-ভূষণ ও অলঙ্কারাদি কিনে দেওয়া।[৭৪]

বন্ধু এবং বান্ধব

মানুষ মাত্রই বন্ধু-বান্ধব কিংবা কামনা করে। কমবোশী সকলের বন্ধু-বান্ধব রয়েছে। ধারণা করা হয় এমন কোনো ব্যক্তি নেই যার কোনো বন্ধু কিংবা বান্ধব নেই। তবে এমন বন্ধু-বান্ধব দরকার যার মাধ্যমে কল্যাণ বয়ে আনা সম্ভব। বুদ্ধ ভিক্ষুসঙ্ঘকে বলেন ; 'কল্যাণমিত্র লাভ করলে তাকে পূজা করা এবং সেবা উচিত'।[৭৫] উত্তম সুহৃদ কিংবা বন্ধু নির্বাচনে নিজেকে উদ্যোগী হতে হয়। বন্ধুত্ব একজন ব্যক্তির জীবনে ভীষণ প্রভাব বিস্তার করে। একজন অসৎ বন্ধুর সংসর্গ জীবনে অশান্তি ডেকে নিয়ে আসে। অপরদিকে একজন কল্যাণমিত্র সুখ-শান্তি সমৃদ্ধি বৃদ্ধিকরণে সহায়তা করে।[৭৬] তবে বুদ্ধ সর্বদা অসৎ বন্ধু কিংবা বান্ধব পরিত্যাগ করা এবং পণ্ডিত ব্যক্তির পূজা বা সান্নিধ্য লাভ করার কথা বলেছেন। এখানে তিনি বলেন : 'অসেবনা চ বালানং পণ্ডিতাঞ্চ সেবনা'। অর্থাৎ অশিক্ষিত, দুর্জন ব্যক্তির সেবা না করা এবং পূজনীয় ব্যক্তির পূজা করা।[৭৭] তবে বুদ্ধ কেমন বন্ধু-বান্ধব হওয়া দরকার এ বিষয়ে বলেন ;

Dhaka University Institutional Repository

কেমন ব্যক্তির সাথে মিত্রতা করবে

সংসর্গ করবে কার সাথে তাও জানবে।

গুণবান হবে সদা এই ভব সংসারে

আত্মবৎ বন্ধুর সঙ্গে সদা বিচরিবে।[৭৮]

চলার পথে সৎ ও কল্যামিত্র লাভ করা একান্ত অত্যাবশ্যকীয় কেননা তা যদি সম্ভব হয় তবে জাগতিক জীবন সুন্দর সুখময় হয়। 'অঙ্গুত্তর নিকায়'-এর কল্যাণমিত্রতা বর্গে বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। এখানে বুদ্ধ বলেন ; ভিক্ষুগণ ! কল্যাণমিত্রতা ব্যতীত আমি আমি অন্যকোনো একধর্ম দেখছি না যার প্রভাবে অনুৎপন্ন কুশলধর্ম (গুণ) সমূহ উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন অকুশল ধর্মসমূহ পরিহানি প্রাপ্ত হয়। যেমন : কল্যাণমিত্রতা। কল্যাণমিত্রের (সৎ ব্যক্তির সাথে বসবাসকারী) অনুৎপন্ন কুশলধর্ম সমূহ উৎপন্ন হয় এবং অকুশল ধর্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।[৭৯] এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন : বাহ্যিক ধর্মকে কারণ বলে ধরলে কল্যাণমিত্রতার ন্যায় মহান অর্থকর অন্যকোনো কারণ দেখা যায় না। কল্যাণমিত্রতা মহান হিতকর হয়।[৮০] বুদ্ধ মতে, পৃথিবীতে তিন রকম ব্যক্তি রয়েছে। যথা হলো : ক. কোনো প্রকার ব্যক্তি রয়েছে যাকে অনুসরণ করা যায় না, সেবা করা যায় না ও সম্মান করা যায় না ; খ. কোনো প্রকার ব্যক্তি রয়েছে যাকে অনুসরণ করা যায়, সেবা করা যায় ও সম্মান করা যায় এবং গ. কোনো প্রকার ব্যক্তি রয়েছে যাকে শ্রদ্ধার সাথে অনুসরণ করা যায়, শ্রদ্ধার সাথে সেবা করা যায় ও শ্রদ্ধার সাথে সম্মান করা যায়।[৮১] এখানে 'গ' নং সংখ্যক ব্যক্তিই সব সমাজে সমাদৃত হয়। কেননা, তারা শীলবান, প্রজ্ঞাবান, ক্ষান্তিবান, ধৈর্য্য পরায়ণ নৈতিক চরিত্রের অধিকারী সকল প্রকার কুশলকর্ম সম্পাদনে নিজেকে নিয়োজিত রাখে। এ ধরনের ব্যক্তিরাই যথোপযুক্ত সেবা লাভ করে। সকলে তাঁদেরকে গৌরব সহকারে অনুসরণ করে। সকলেই সর্বত্রে সম্মান লাভ করেন। তাই বুদ্ধ বলেন ; 'যে হীন বন্ধুকে অনুসরণ করে সে শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। সমতুল্য ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করলে সে কখনো ব্যর্থ হয় না। যে মহান, উদার ব্যক্তির সাথে সংসর্গ লাভে করে তার উত্থান হয়, যশ ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। তাই নিজের চেয়ে উত্তম ব্যক্তির সংসর্গ কিংবা সান্নিধ্য লাভ করা এবং সেবা করা উত্তম।[৮২] অশিক্ষিত, মূর্খ, ধূর্তজনদের পরিত্যাগ করা ভালো। তারা কখনো বন্ধু-বান্ধব কিংবা আত্মীয়-স্বজনের উপকার করে না। মঙ্গল বয়ে আনে না। আত্মোন্নয়নে সদা তারা বদ্ধপরিকর। এ বিষয়ে একটি কাহিনি সবার মনোযোগ আকর্ষন করতে সমর্থ হবে। কাহিনিটি নিম্নরূপ ; একসময় মহাকাশ্যপ স্থবির রাজগৃহের পিপ্পলী নামক গুহায় বাস করতেন। এ সময় তাঁর দুইজন শিষ্য ছিলেন। তারা তাঁর সেবা করতো। তাদের মধ্যে একজন সত্যিকারের সেবার করার মনোভাব নিয়ে শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে আচার্যর সেবা এবং পরিচর্যা করতো। অন্যজন কিছুই করতো না। অপরের করা কাজ নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

প্রায় সময় অহঙ্কার করতো। এটা তার একধরনের শঠতা। একদিন তার এহেন শঠতা আচার্যের নিকট ধরা পড়ে গেল। আচার্য (মহাকাশ্যপ) তাকে উপদেশ দিয়ে বললেন ; শঠতা এক ধরনের পাপ। এটা উচিত নয়। কাজেই তুমি ঐ পথ ছেড়ে দাও। এটি শোনার পরপরই শিষ্য উল্টো রেগে গেল। পরের দিন সে আর আচার্যের সাথে রাগ করে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বের হলো না। এক পরিচিত বাড়ি থেকে আচার্যের নামে খাবার এনে নিজে খেয়ে ফেললো। এ কথাটিও আচার্যর কানে গেল। আচার্য তাকে আবার সংশোধন করে দেবার চেষ্টা করে উপদেশ দিলেন। এবারের উপদেশও হিতে বিপরীত হলো। শিষ্য আচার্যের কথায় রাগান্বিত হয়ে বাসস্থানের জিনিসপত্র তছনছ করে দিল। এক পর্যায়ে আশ্রমে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেল। এ সময় বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন। রাজগৃহ থেকে বুদ্ধ বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হন। এ প্রসঙ্গে তিনি উপদেশ দিয়ে বলেন ;

চরং চে নাধিগচ্ছেয্য সেয্যং সদিসমত্তনো

একচরিযং দল্হং করিযা নত্থি বালে সহাযতা।[৮৩]

অর্থাৎ, সংসার পথে চলতে চলতে যদি নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিংবা নিজের তুল্য সঙ্গী পাওয়া না যায়, তবে মন শক্ত করে একাই চলা ভালো। কিন্তু অজ্ঞানী কিংবা মূর্খের সংসর্গ কখনোই নয়।

এখানে বুদ্ধ বোঝাতে চেয়েছেন যে, মূর্খের সংসর্গ করলে তার পরিণতি দুঃখেরই হয়। সংসার পথে অনেক সঙ্গী হতে পারে। তবে দেখে-শোনে সঙ্গী নির্বাচন করা আবশ্যক। কিন্তু কখনো খারাপ বন্ধু কিংবা সঙ্গী নির্বাচন করা উচিত নয়।

এ প্রসঙ্গে বুদ্ধ আরো বলেন ;

ন ভজে পাপকে মিত্তে ন ভজে পরিসাধমে

ভজেথ মিত্তে কল্যাণে ভজেথ পুরিসুত্তমে।[৮৪]

অর্থাৎ, পাপী-মিত্র ও নীচু ব্যক্তির সংসর্গ কখনো কারো কাম্য নয়। কল্যাণমিত্র এবং সৎব্যক্তির সঙ্গ কিংবা সাহচর্য লাভ করা উচিত।

'সংযুক্ত নিকায়' নামক 'সব্ভি সুত্ত'-এ 'সৎপুরুষের সাহচর্য লাভ করার কথা এবং তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা কথা উল্লেখ রয়েছে'।[৮৫] এ প্রসঙ্গে জাতক সাহিত্যে অনন্য সাধারণ উদাহরণ রয়েছে। এধরনের একটি জাতক 'গিরিদন্ত জাতক'। জাতকের কাহিনিটি নিম্নরূপ ; প্রাচীনকালে শ্যামরাজ নামক এক রাজা বারাণসীতে রাজত্ব করতেন। সে সময় বোধিসত্ত্ব অমাত্যকুলে জন্মগ্রহণ করে তাঁর ধর্মানুশাসক হয়েছিলেন। শ্যামরাজের পাণ্ডব নামে একটি মঙ্গল

Dhaka University Institutional Repository

ঘোড়া ছিল। গিরিদন্ত নামে এক খোঁড়া ব্যক্তি ঘোড়াটির সহিসের কাজ করতো। গিরিদন্ত অশ্বের মুখের রশি ধরে ধরে সামনের দিকে চলত। অশ্বটি মনে করত, সহিস তাকে তার মতো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে শিক্ষা দিচ্ছে। অশ্বও সহিসের মতো তাকে অনুসরণ করতো। শেষে সে ঘোড়াও খোঁড়া হয়ে হাঁটতে শুরু করলো।

রাজাকে খবরটি জানালে রাজা মঙ্গল ঘোড়া জন্য একজন বৈদ্য পাঠালেন। তিনি অশ্বটির কোনো রকম রোগ নির্ণয় করতে পারল না। অবশেষে শ্যামরাজ ধর্মানুশাসক বোধিসত্ত্বকে তার কারণ খুঁজে বের করার জন্য প্রেরণ করেন। বোধিসত্ত্ব গিয়েই বুঝতে পারলেন যে, মঙ্গল অশ্বের সহিসের সংসর্গ থেকে এরূপ হয়েছে। সহিসের চাল-চলন দেখই এটা সে শিখেছে। রাজা পরবর্তী কর্তব্য সম্পর্কে বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞেস করলেন। তিনি একজন সুস্থ সুঠাম দেহের অবিকলাঙ্গ সহিস নিয়োগের কথা বললেন। তবেই মঙ্গল অশ্ব পূর্বের ন্যায় হয়ে যাবে। রাজা বোধিসত্ত্বের পরামর্শ অনুয়ায়ী সহিস নিযুক্ত করলেন। নতুন সহিস কয়েকদিন ঘোড়া মুখে রশি ধরে ঘোড়াকে পরিচালনা করলেন। অশ্ব ধীরে ধীরে খোঁড়াভাব ত্যাগ করলো। সে পূর্বের চলনশক্তি ফিরে পেল।[৮৬]

বন্ধু নির্বাচনের স্বরূপ বিষয়ে দেখা যায় ; নির্বোধ বন্ধুর চেয়ে পণ্ডিত শত্রুও ভালো।[৮৭] মিত্র যদি অশিক্ষিত কিংবা মূর্খ হয় তবে সে মঙ্গলকর্ম কিংবা কুশলকর্ম করতে গিয়ে অমঙ্গল কিংবা অকুশলকর্ম সম্পাদন করে।[৮৮] সংসর্গ মানুষের জীবন সুন্দর যেমন করতে পারে তেমনি আবার নষ্টও করতে পারে। তবে একটা সহজ এবং সাধারণ নিয়ম সবার মেনে চলা উচিত তা হলো পাপী, চরিত্রহীন, অসৎ, অকল্যাণকামী লোক সবসময় পরিত্যাগ করা উচিত। আবার অন্যদিকে সৎ চরিত্রবান, হিত কর্মরত ব্যক্তির সাহচর্য লাভ করা উচিত। In Tune With the infinite নামক গ্রন্থে মনস্বী র‍্যাল্‌ফ ওয়ালডো ট্রাইন বলেন সঙ্গী নির্বাচন প্রসঙ্গে বলেন ; we can be our own best friends or we can be oue own worst enimies. In the degree that we becaome friends to the highest and best within us, we become friends to all, and in the degree that we become enimies to the highest and best with in us do we become enimies to all[৮৯]

ব্যক্তি জীবন এবং পারিবারিক জীবনে কল্যাণমিত্র কিংবা উপকারী বন্ধু সুখ আনয়ন করে। শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। সকলের উচিত এ ধরনের বন্ধু কামনা করা। একজন আদর্শ বন্ধুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কেমন হওয়া উচিত এ সম্পর্কে নিম্নলিখিত উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য : `It is said that a teacher is a good friend to a wayfarer, a mother a good friend at home, a comrade is a good friend in need, and the meritorious deed a good friend in the life to come. [৯০]

Dhaka University Institutional Repository

একজন কল্যাণমিত্র সর্বদা প্রিয়, পরোপকারী আচার্যপূজক, দয়ালু, বিনয়ী, সদা সত্যবাদী, ধ্যানী এবং অন্যায়কর্মে কখনো নিজেকে নিয়োজিত করে না।[৯১] বুদ্ধ সপ্তবিষয়ে গুণে গুণান্বিত মিত্র সংসর্গ লাভ করার বলেন। তার একটি ধারণা নিম্নরূপ ; 'তিনি যা দেওয়া কঠিন তা দেয়। দুষ্কর্ম সম্পাদন করে। যা ক্ষমা করা দরকার ক্ষমা করে। নিজের দোষ স্বীকার করে। পরের দোষ গোপন করে। আপদ-বিপদের সময় কখনো পরিত্যাগ করে না। ধ্বংসের মুখোমুখি হলেও কখনো কাকেও ঘৃণা করে না।[৯২] বুদ্ধ সুহৃদ মিত্রের স্বরূপ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে গৃহপতিপুত্র সিগালককে চার প্রকার মিত্রকে সুহৃদ হিসেবে জানতে বলেন। চার প্রকার সুহৃদ হলো ; ক. প্রমত্ত হলে তিনি রক্ষা করেন ; প্রমত্তের ধন-সম্পত্তি রক্ষা করেন ; ভয়ার্তের শরণ হন। কর্তব্য সম্পাদনে প্রয়োজনে দ্বিগুণ অর্থ প্রদান করে। খ. তিনি আপনার যা গোপন তা প্রকাশ করেন ; মিত্রের যা গুপ্ত বিষয় তা উত্তমরূপে গুপ্ত রাখেন। বিপদে-আপদে পরিত্যাগ করেন না ; মিত্রের জন্য তিনি আত্মত্যাগ পর্যন্ত করেন। গ. তিনি পাপ হতে সংযত করেন ; কল্যাণকর্মে নিয়োজিত হতে প্রবুদ্ধ করেন ; যা অশ্রুত তা প্রকাশ করেন ; স্বর্গের মার্গ প্রদর্শন করেন এবং ঘ. মিত্রের অমঙ্গলে আনন্দিত হন না ; মিত্রের মঙ্গলে আনন্দ লাভ করেন ; কেউ মিত্রর নিন্দা করলে তিনি নিবারণ করেন ; প্রশংসা করলে তিনি প্রশংসা করেন।[৯৩] আদর্শ মিত্রের কিংবা সুহৃদের গুরুত্ব রয়েছে। একজন মিত্র কিংবা সুহৃদ পাঁচভাবে সর্ম্পকোন্নয়নে এক-অপরকে সহায়তা করতে পারে। 'দান, প্রিয় বাক্য, আর্থিক সহায়তা, সম্মান প্রদর্শন এবং অবিংসংবাদিতা দ্বারা'।[৯৪] নীতিবান ও আদর্শবান সুহৃদ কিংবা মিত্র সম্পর্কে বলতে বুদ্ধ গিয়ে উল্লেখ করেন ;

একবার মাত্র যদি সাধু সঙ্গে থাকো তুমি
তার চরিত্র তব করবে রক্ষণ।
অসতের সঙ্গে কিন্তু থাকলেও বহুবার
দুঃখ হতে ত্রাণ পাবে না কখন।
থাকো বন্ধু সাধুসহ মৈত্রীপাশে অহরহ
সাধুর সংসর্গে সদা থাকো সযতনে।
সদ্ধর্মে সুপ্রতিষ্ঠত হবে তুমি নিশ্চিত
প্রবেশিতে না পারবে পাপ তব মনে।
সুদূরে আকাশ আছে সুদূর বিস্তৃত ধরা

Dhaka University Institutional Repository

সুদূরে সাগর পার আছে অবস্থিত।

সাধু আর অসাধুর আচরিত ধর্ম যা

আরো বহু দূরে করে প্রভাব বিস্তৃত।[৯৫]

গৃহপতি এবং দাস/ভৃত্য

মূল পিটকীয় গ্রন্থে গৃহস্বামী ও ভৃত্য-এর অর্থ করা হয়েছে যথাক্রমে 'গহসামী' এবং 'দাসকম্মকার' যার ইরেজি অর্থ এবং employer and employee. গৃহস্বামী বাড়িতে যারা কাজ করতো তারা ভৃত্য নামে পরিচিতি হতো। গৃহস্বামীর বাড়িতে কাজকর্ম করতো তারা অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ লাভ করে। ফলে তারা সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারতো। শুধু তাই নয় উভয়ে উভয়ের সাথে একধরনের বন্ধুত্বপুর্ণ আচরণ, সম্মান এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত। বর্তমান সময়ে উপরি-উক্ত দুটির অর্থের পরিবর্তে মালিক (the master)এবং চাকুরীজীবী/শ্রমজীবী (worker) নামে সমধিক পরিচিত।

প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত কিছু কিছু স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এহেন বৈশিষ্ট্য দ্বারা অনেকের মধ্য থেকে তাদেরকে সহজেই আলাদা করা যায় কিংবা খুব সহজেই চেনা যায়। তা ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণে যেরূপ দেখা যায় ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণে সেরূপ দেখা যায়। আবার ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ে যেরূপ দেখা যায় ক্ষত্রিয়-ক্ষত্রিয়ে সেরূপ দেখা যায়। আবার বৈশ্য ও শূদ্রে যেরূপ দেখা যায় বৈশ্য-বৈশ্যে-সেরূপ দেখা যায়। আবার বৈশ্য ও শূদ্রে যেরূপ দেখা যায় শূদ্রে-শূদ্রে সেরূপ দেখা যায়। এসমস্ত বৈশিষ্ট নিজ নিজ চারিত্রিক গুণের জন্যেই হয়। বস্তুত জন্মের দ্বারা কেউ ব্রাহ্মণ কিংবা অব্রাহ্মণ হয় না। কর্মের দ্বারাই মানুষ ব্রাহ্মণ কিংবা অব্রাহ্মণ হয়। কৃষক, শিল্পী বণিক চোর, যোদ্ধ, যাচক ও রাজা কর্ম দ্বারাই হয়। বুদ্ধ সবাইকে এক এবং অভিন্ন করে দেখেছেন।' অশ্বলায়ন সূত্রে' দেখা যায় তিনি বর্ণব্যবস্থা অত্যন্ত সুন্দরভাবে খণ্ডন করেন।[৯৬] অর্থনৈতিক কারণে মানুষ মাত্রই নানাবিধ কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। একসময় মথুরার গুন্দাবনে মহাকাত্যায়ন অবস্থান করেন। এমন সময় মথুরার রাজকুমার বর্ণব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন ; 'যদি একজন শূদ্র ধন-ধান্য, স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য দ্বারা সমৃদ্ধ হয় তবে প্রিয়ভাষী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য তার দাস হয়। অনুরূপভাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য-এর ক্ষেত্রে এটি সত্য'।[৯৭] এখানে তিনি দেখিয়েছেন বর্ণই সমান। তাতে কোনো প্রভেদ নেই। অতীতে প্রায় প্রতিটি পরিকারে দাস-দাসী রাখা হতো। যার উদাহরণ আমারা দেখতে পাই 'সংযুক্ত নিকায়ের' মহাবর্গ নামক বর্গে। এখানে দেখা যায় একদিন বুদ্ধ সামান্য পরিমাণ নখাগ্রের ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বলেন ; 'অল্পমাত্রই সত্ত্ব রয়েছে যারা

Dhaka University Institutional Repository

দাস-দাসী গ্রহণ থেকে বিরত হয়। অধিকন্তু দাস-দাসী গ্রহণকারীরসংখ্যাই বেশী'।[৯৮] দাস-দাসী বলতে বর্তমান সময়ে আমরা চাকুরীজীবী, শ্রমজীবীসহ খেটে খাওয়া সকল মানুষকে।

দাস-দাসী কিংবা ভৃত্যর প্রতি গৃহপতির কর্তব্য পাঁচ প্রকার। যথা : ক. দাস-দাসী কিংবা ভৃত্যর শক্তি অনুসারে তাদের কার্যভার অর্পণ করা ; খ. যথাসময়ে তাদেরকে যথোপযুক্ত বেতন প্রদান করা ; গ. অসুস্থ হলে সেবা শ্রূষা করা ; ঘ. উন্নতমানের খাদ্য-ভোজ্য প্রদান করা ; ঙ. মধ্যে মধ্যে ছুটি দেওয়া অর্থাৎ যথাসময়ে কর্ম হতে অবকাশ প্রদান করা।[৯৯] অনুরূপভাবে পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালনের মাধ্যমে দাস-দাসী কিংবা ভৃত্যকে গৃহপতির প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে হয়। যথা : ক. গৃহপতির পূর্বে শয্যাত্যাগ করা ; খ. সকলের পরে শয়ন করা ; গ. অজ্ঞাতসারে কিছু গ্রহণ না করে কেবল প্রদত্ত বস্তুগ্রহণ করা ; ঘ. যথার্থরূপে কর্ম সম্পাদন করা ; এবং সর্বসধারণের কাছে গৃহস্বামীর সুখ্যাতি ও প্রশংসা করা।[১০০] এভাবে গৃহপতির প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে দাস-দাসী কিংবা ভৃত্যরা নিজেরা নিজেদেরকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ করে তোলে।

গৃহী এবং ভিক্ষু

এটা সর্বজনবিদিত যে, বুদ্ধের সময়কালীন সময়ে গৃহীদের সাথে ভিক্ষুদের অত্যন্ত আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। ত্রিপিটকের সর্বত্রে তার প্রমাণ মেল। এখানে ভিক্ষু বলতে বুদ্ধ প্রবর্তিত মহান ভিক্ষুসঙ্ঘকে বোঝায়। সচরাচর ভিক্ষুরা নয়টি গুণের অধিকারী। এগুলো হলো : ক. সুপ্রতিপন্ন অর্থাৎ স্রোতাপত্তি মার্গ ও ফললাভী; খ. ঋজুপথ বা সোজা পথ অর্থাৎ, সকৃদাগামী মার্গ ও ফললাভী ; গ. ন্যায় প্রতিপন্ন অর্থাৎ, অনাগামী মার্গ ও ফললাভী ; ঘ. সম্যক পথ প্রতিপন্ন অর্থাৎ, অর্হৎ মার্গ ও ফল লাভী ; ঙ. আহবানের যোগ্য ; চ. সেবা করার যোগ্য ; ছ. দক্ষিণা লাভের যোগ্য ; জ. অঞ্জলিবদ্ধ প্রণামযোগ্য এবং জগতের শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র।[১০১] আরো উল্লেখ রয়েছে সঙ্ঘের শরণ ব্যতীত আর কোনো শরণ নেই।[১০২] চারজনের অধিক ভিক্ষু একত্রিত হলে সঙ্ঘ হয়। বৌদ্ধসঙ্ঘে প্রবেশাধিকার ছিল সকলের। বুদ্ধ অনর্থক জাতিভেদ প্রথা ধনগৌরব, পদগৌরব যশগৌরব, বংশগৌরব ইত্যাদি আগ্রাহ্য করতেন। তাই তিনি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়, বৈশ্য-শূদ্র, আর্য-অনার্য, দলিত কিংবা অস্পৃশ্য কিংবা অচ্ছুত সকলের চিত্তকে তিনি জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর কালজয়ী অভূতপূর্ব বাণী সর্বজনীন ও সর্বভৌমিক বলে সকলে তা আনন্দচিত্তে গ্রহণ করেছিল। সমাজব্যবস্থায় মানুষ তার নিজ নিজ কর্মের মধ্যে দিয়ে পরিচিতি লাভ করে। বুদ্ধ সর্বাগ্রে কর্মকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কর্মের দ্বারা মানুষ ছোটো হয়। কর্মে দ্বারাই বড়ো হয়। কর্মের দ্বারা মানুষ মহতো মহীয়ান হতে পারে। জন্মের মাধ্যমে কখনো ব্যক্তির পরিচয় হয় না।[১০৩] বুদ্ধ 'বসল সূত্রে' বলেন ;

Dhaka University Institutional Repository

ন জচ্চা বসলো হোতি ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো

কম্মুনা বসলো হোতি কম্মুনা হোতি ব্রাহ্মণো।[১০৪]

অর্থাৎ, 'জন্মের দ্বারা কেউ বসল বা অচ্ছুত হয় না, জন্মের কারণে কেউ ব্রাহ্মণা হয় না। কর্মেরা দ্বারাই বৃষল বা অচ্ছুত হয় আবার ব্রাহ্মণও কর্মের দ্বারা হয়'। সুপ্রসিদ্ধ বহুল প্রশংসিত 'ধম্মপদ' নামক গ্রন্থে আরো উল্লেখ রয়েছে ;

ন জটাহি ন গোত্তেন ন জচ্চ হোতি ব্রাহ্মণো

যম্হি সচ্চঞ্চ ধম্মো চ সো সূচী সো চ ব্রাহ্মণো।[১০৫]

অর্থাৎ, 'জটাধারণ দ্বারা, গোত্র দ্বারা, এবং জাতি দ্বারা কেউ ব্রাহ্মণ হয় না। যিনি ধর্মে ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত তিনি শুচি বা ব্রাহ্মণ'। এখানে বুদ্ধ কখনো বংশানুগত জাতিভেদ যেমন স্বীকার করা হয়নি তেমনি স্বীকার করা হয় কোনো আত্মঅহমকিাকে।

বুদ্ধ প্রবর্তিত ধর্মকে সদ্ধর্ম বলা হয়। বিভিন্ন জাতি, গোত্র এবং বর্ণ থেকে বুদ্ধের শাসনে এসে সকলে সদ্ধর্মের প্রচার প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। পিটকীয় গ্রন্থ অঙ্গুত্তর নিকায় নামক গ্রন্থে দেখা যায় ;' তথাগতের পরিনির্বাণে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকারা শাস্তার প্রতি সগৌরব ও মনোযোগী হয়ে অবস্থান করে ; ধর্মের প্রতি সগৌরব ও মনোযোগী হয়ে অবস্থান করে ; সঙ্ঘের প্রতি সগৌরব ও মনোযোগী হয়ে অবস্থান করে ; শিক্ষার প্রতি সগৌরব ও মনোযোগী হয়ে অবস্থান করে ; এবং পরস্পরের প্রতি সগৌরব ও মনোযোগী হয়ে অবস্থান করে। এর মাধ্যমে তথাগতের পরিনির্বাণে সদ্ধর্ম দীর্ঘস্থায়ী হয়। ভিক্ষু এবং গৃহপতি একে-অপরের উপর নির্ভরশীল। উভয়ে-উভয়কে ছাড়া চলতে পারে না।[১০৬] প্রসঙ্গক্রমে বলতে গিয়ে বুদ্ধ ভিক্ষসঙ্ঘকে উদ্দেশ্য করে বলেন ; হে ভিক্ষুগণ! ব্রাহ্মণ-গৃহপতিরা তোমাদেরকে চীবর, আহার, পানীয়, শয়নাসন, ওষুধসহ প্রয়োজনীয় বস্তু দান করে। তারা তোমাদের বহু উপকারী। অনুরূপভাবে ভিক্ষুগণ তোমারও ব্রাহ্মণ-গৃহপতিদের বহু উপকারী। তোমরা তাদেরকে আদি কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ এবং অন্তে কল্যাণ বিষয়ে ধর্ম দেশনা করে সুন্দর বিশুদ্ধ জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করেছ।[১০৭] সপ্তবিষয় কুলপুত্রকে অপরিহানির দিকে নিয়ে যায়। সপ্তবিষয়সমূহ হলো ; ক. ভিক্ষু দর্শনে অব্যর্থ ; খ. সদ্ধর্ম শ্রবণে উৎসাহী ; গ. উচ্চতর ধর্ম শিক্ষা করে ; ঘ. বয়োঃবৃদ্ধ, নবীন এবং মধ্যবয়সী ভিক্ষুদের প্রতি অসাধ বিশ্বাস স্থাপন ; ঙ. প্রসন্ন চিত্তে ধর্ম শ্রবণ ; চ. দোষ অন্বেষণ করে না ; এবং ছ. শাসন বহির্ভূত দানপাত্র অনুসন্ধান করে না।[১০৮] পিটক বহির্ভূত গ্রন্থ 'মিলিন্দ প্রশ্ন' নামক গ্রন্থে দশ প্রকার কুলপুত্রের গুণের কথা উল্লেখ রয়েছে। গুণসমূহ হলো : ক. সঙ্ঘর সুখ-দুঃখে সহানাভূতি সম্পন্ন হতে হয়; খ. ধর্মকে অধিপতিরূপে স্বীকার করে নিতে হয় ; গ. যথাশক্তি দান

Dhaka University Institutional Repository

কার্য সম্পাদন করতে হয় ; ঘ. বুদ্ধ শাসনে পরিহানি দেখলে তার উন্নতির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয় ; ঙ. সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন হতে হয় ; চ. কৌতূহলবশতঃ অন্যধর্মের আচার্যের শরণ নিতে হয় না ; ছ. কায় এবং বাচনিক সংযম রক্ষা করতে হয় ; জ. ঐক্যপ্রিয় ও একতায় রত থাকতে হয় ; ঝ. ঈর্ষা পরায়ণ হয়ে শঠতার বশে ধার্মিকের ভান করে না চলা এবং. ঞ. যথাযথভাবে বুদ্ধ, ধর্ম এবং সঙ্ঘের শরণাপন্ন হতে হয়।[১০৯] একসময় শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে জানতে চাইলেন গৃহীরা কীভাবে গৃহীজীবনের উপযুক্ত ধারায় প্রবিষ্টকারী, যশ, গৌরব, কীর্তি এবং স্বর্গ লাভ করতে পারে। তখন বুদ্ধ তাঁকে বলেন ; চার ধর্মে সমন্বিত আর্যশ্রাবক গৃহীজীবনের উপযুক্ত ধারায় প্রবিষ্টকারী, যশ, গৌরব, কীর্তি লাভ এবং স্বর্গ লাভ করতে পারে। চারটি ধর্ম হলো : ক. চীবর (robes), খাদ্য-ভোজ্য (alms food), শয়নাসন (lodgings)এবং ওষুধ পত্র (medicine)।[১১০] গৃহীরা চার প্রকার সুখ ভোগ করে। সেই চার প্রকার সুখ ; ক. প্রাপ্তি সুখ, খ. সুখ ভোগ, গ. ঋণমুক্ত সুখ, এবং ঘ. অনবদ্য সুখ।

ক. প্রাপ্তি সুখ : জগতে এমন কোনো কোনো কুলপুত্র রয়েছে যাদের অধিগত বীর্য (শৌর্য, বীরত্ব) ভোগ, বাহুবল, পরিশ্রম, ধর্ম এবং ধর্মগুণ লাভ হয়। 'সে আমার অধিগত বীর্য, ভোগ, বাহুবল, পরিশ্রম, ধর্ম এবং ধর্মগুণ আছে' বলে সুখ এবং সৌমনস্য (মানসিক আনন্দ অনুভূতি) লাভ করে। একে বলে প্রাপ্তি সুখ।

খ. সুখ ভোগ : জগতে এমন কোনো কোনো কুলপুত্র রয়েছে যাদের অধিগত বীর্য ভোগ, বাহুবল, পরিশ্রম, ধর্ম এবং ধর্মগুণ লাভ হয়। সে 'আমার অধিগত বীর্য, ভোগ, বাহুবল, পরিশ্রম, ধর্ম এবং ধর্মগুণ দ্বারা সুখ ভোগ করছি, পুণ্যকর্ম সম্পাদন করছি' এরূ বলে সুখ সৌমনস্য (মানসিক আনন্দ অনুভূতি) লাভ করে। একে বলে ভোগ সুখ।

গ. ঋণমুক্ত সুখ : জগতে এমন কোনো কোনো কুলপুত্র রয়েছে যারা কারো কাছ থেকে অল্প কিংবা বেশী ঋণ গ্রহণ করে না। সে 'আমি কারো কাছ থেকে অল্প কিংবা বেশী ঋণ গ্রহণ করিনি' এরূপ বলে সুখ সৌমনস্য (মানসিক আনন্দ অনুভূতি) লাভ করে। একে বলা হয় ঋণমুক্ত সুখ।

ঘ. অনবদ্য সুখ : জগতে এমন কোনো কোনো কুলপুত্র রয়েছে যারা অনবদ্য কায়-বাক্য-মনো কর্মে সমন্বিত হয়। সে 'আমি অনবদ্য কায়-বাক্য-মনো কর্মে সমন্বিত' এ বলে সুখ সৌমনস্য (মানসিক আনন্দ অনুভূতি) লাভ করে। একে বলা হয় অনবদ্য সুখ।[১১১]

Dhaka University Institutional Repository

বহুজনের মঙ্গল-হিত কামনায় বিবাদে প্রবৃত্ত না হয়ে কুলপুত্রদের বুদ্ধ একত্রে সিদ্ধান্ত নেবার কথা বলেছেন।[১১২] এখানে বুদ্ধ বোঝাতে চেয়েছেন এর ফরে সকলে সুখ বৃদ্ধি পায়। কুলপুত্ররা চার প্রকারে ভিক্ষুর সেবা করেন। যথা : ক. মৈত্রীভাবযুক্ত কায়কর্মের দ্বারা, খ. মৈত্রীভাবযুক্ত বাচনিক কর্মের দ্বারা, গ. মৈত্রীভাবযুক্ত মানসিক কর্মের দ্বারা এবং ঘ. অবারিত দ্বার হয়ে খাদ্য ভোজ্যাদি প্রদানের দ্বারা।[১১৩] এরূপে সেবিত হয়ে ভিক্ষুরা (Budhist monks) ছয় প্রকারে[১১৪] কুলপুত্রদের প্রতি অনুকম্প করেন। যেমন : ক. পাপ হতে রক্ষা করেন, খ. কল্যাণে নিয়োজিত করেন, গ. কল্যাণকামী হয়ে অনুকম্প করেন, ঘ. অলব্ধ বিদ্যা দান করেন, ঙ. লব্ধ বিদ্যা পরিমার্জিত করেন, এবং চ. স্বর্গের পথ প্রদর্শন করেন।[১১৫] কুলপুত্রদের সাথে ভিক্ষুর এক ধরনের নিবিড় এবং ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। ভিক্ষুরা প্রতিনিয়ত শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা সাধনা করেন। তারা পুণ্যকর্মে উৎসাহী হন। পাপকর্মে ভীত হন। সর্বদা আরব্ধবীর্য ও উদ্যোগী হয়। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বুদ্ধ বলেন ;

এরূপ বিহারীরই হন শান্ত অনুদ্ধত
শিক্ষাকামী প্রশান্ত চিত্ত এই মত।
যথা বিধিমতে যেজন চলেন সতত
এতে উদ্যোগী ভিক্ষু নামে খ্যাত।[১১৬]

প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে গৃহীরা ভিক্ষুর কাছ থেকে বুদ্ধ, ধর্ম এবং সঙ্ঘের শরণ নিয়ে গৃহীবিনয় নীতি অর্থাৎ পঞ্চশীল গ্রহণ করে। চার প্রকার ধর্মে মনোনিবেশ হয়ে তারা সংসার জীবনযাপন করে। এগুলো হলো খ. শ্রদ্ধা সম্পদ, শীল সম্পদ, ত্যাগ সম্পদ এবং প্রজ্ঞা সম্পদ।[১১৭]

গৃহীরা ভিক্ষুদের কাছ থেকে বুদ্ধের অমৃতময় ধর্মকথা এবং ধর্মবাণী শ্রবণ করে নিজেকে সৎপথে পরিচালিত করে। সকল প্রকার অশুভ কর্ম সম্পাদন থেকে দূরে থাকে। অন্যকে পাপকাজ সম্পাদনে নিরুৎসাহিত করে। ভিক্ষুর স্বরূপ সম্পর্কে দেখা যায় ; ভিক্ষু চক্ষুতে সংযত, কানেতে সংযত, নাসিকায় সংযত, জিহ্বায় সংযত, হস্তে সংযত, পদে সংযত, বাক্য সংযমত, জ্ঞানগর্ভ কথা বলেন, কোনো রকম ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেন না, ধর্ম ও তার যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদান করেন, মৈত্রীচিত্ত অধিকারী, শান্ত, সন্তুষ্ট চিত্ত, ধর্মানুরক্ত, সর্বোপরি লোভ-দ্বেষ-মোহ বিদূরিতকারী।[১১৮] বহু লোকের সুখ-শান্তি-কল্যাণ লাভার্থে ভিক্ষু যথার্থ ধর্ম ভাষণ করেন। এর ফলে গৃহীরা সত্য পথ, সত্য ধর্ম এবং কুশল কর্শ সম্পাদন করতে পারে।[১১৯] বুদ্ধ পুত্ররা কখনো সামান্য বিষয়ে বিচলিত হন না। গিরিরাজ সুমেরু যেমন প্রবল ঝড়-তুফানের প্রহারে বিচলিত হন না ; মহাসাগর যেমন অসংখ্য নদীধারায় পুর্ণ হয় না। ঠিক সেই রূপ।[১২০] ভিক্ষুরা গৃহীদরেকে অকুশল কর্ম থেকে বিরত রেখে কুশলকর্মে উদ্বুদ্ধ করেন। সত্য ও বিশুদ্ধ জীবনযাপনের পথ

Dhaka University Institutional Repository

প্রদর্শন করেন। শারীরিক সুস্থতার জন্য পরিমিত ভোজন করার কথা বলেন।[১২১] ভিক্ষু গৃহীদের ধর্মদান (moral and spiritual support) করেন। তারা ভিক্ষুদের উপদেশ শ্রবণ করে সংসার জীবনে সুখে দিনাতিপাত করে। সকল প্রকার দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ এমন নির্দেশনা পাওয়া যায়।[১২২] এ বিষয়ে দুই প্রকার দানের কথা উল্লেখ রয়েছে। যথা ; ক. আমিষ দান (বস্তুগত দান) এবং খ. নিরামিষ দান (ধর্মদান)। উপরি-উক্ত দান দুটি মহামতি বুদ্ধ কর্তৃক প্রশংসিত।[১২৩] দুই প্রকার দানের মধ্যে ধর্মদানই শ্রেষ্ঠ। তাই বুদ্ধ বলেন ;

যার ধর্মদান অবলী মাৎসর্যহীন
তথাগত সর্বপ্রাণে তিহানুকম্পী হন।
দেব-মানবের শ্রেষ্ঠ তাদৃশ সত্ত্বেরে
ভবোত্তীর্ণ সেই জনে নমি শ্রদ্ধাভরে।[১২৪]

বুদ্ধ একসময় মহতী ভিক্ষসঙ্ঘকে উপলক্ষ্য করে বলেন, দুই প্রকার দান অর্থাৎ, আমিষ দান (বস্তুগত দান) এবং নিরামিষ দান (ধর্মদান) এর মধ্যে ধর্ম অনুসন্ধান, ধর্মীয় আন্তরিক শিক্ষা, ধর্ম পর্যবেক্ষণ, ধর্মপূজা, ধর্মাতিথেয়তা, ধর্ম ঋদ্ধি, ধর্ম বৃদ্ধি, ধর্ম সম্পদ, ধর্ম সঞ্চয় এবং ধর্মোন্নতিকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন।[১২৫] ভিক্ষুরা সচরাচর কোনো গৃহে গমন করলে গৃহীরা নবাঙ্গযুক্ত হয়ে তাদের আগমনকে স্বাগত জানায়। এগুলো হলো ; ক. আনন্দিত মনে আসন থেকে উঠে দাঁড়ায় ; খ. আনন্দিত মনে অভিবাদন করে ; গ. আনন্দিত মনে আসন প্রদান করে ; ঘ. আসন থাকলে লুকিয়ে রাখে না ; ঙ. অনেক থাকলে প্রচুর দেয় ; চ. প্রণীত থাকলে প্রণীতই দেয় ; ছ. অসম্মান ও অশ্রদ্ধাভরে কোনো কিছু দেয় না বরং সম্মান ও শ্রদ্ধা ভরেই কিছুই দেয় ; জ. ধর্ম শ্রবণের জন্য উপবেশন করে ; এবং ঝ ভাষিত গভীর ভাবে উপলব্ধি কিংবা অনুভব করে।

মধ্যম নিকায়ের কৌশাম্বী সূত্রে[১২৬] বুদ্ধ সামাজিক, সংহতি, ঐক্য এবং অখণ্ডতার কথা বলেছেন। এখানে তিনি সবাইকে ছয়টি বিষয়ে মনোযোগী হবার পরামর্শ দিয়েছেন। ছয়টি বিষয়সমূহ হলো নিম্নরূপ ; ক. পরস্পরের মধ্যে প্রকাশ্যে ও গোপনে মৈত্রীসূচক আচরণ করা ; খ. পরস্পরের মধ্যে প্রকাশ্যে ও গোপনে মৈত্রীময় বাক্য আলাপ ; গ. পরস্পরের মধ্যে প্রকাশ্যে ও গোপনে সকলের (আত্মীয় বা অনাত্মীয়) প্রতি সমভাবে আন্তরিকতা পোষণ করা ; ঘ. পরস্পরের মধ্যে প্রকাশ্যে ও গোপনে সমবন্টন নীতি অনুসরণ করা ; ঙ. পরস্পরের মধ্যে প্রকাশ্যে ও গোপনে সৎ বুদ্ধি ও পরামর্শ প্রদান করা ; এবং চ. পরস্পরের মধ্যে প্রকাশ্যে ও গোপনে একে-অপরকে নির্দোষ ও গৌরবকর বিশুদ্ধ জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করা। এগুলো সমাজীবনে প্রত্যেক ব্যক্তির অনুসরণীয় নীতি যা সামাজিক

Dhaka University Institutional Repository

দায়বদ্ধতারও একটি অংশবিশেষ। উপরি-উক্ত বিষয়গুলো পরিপালিত হলে পরিবারে, সংসারে, সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতিভাব বিরাজিত থাকে। তাছাড়া বুদ্ধ ব্যক্তির উন্নতির চেয়ে সমষ্টিক উন্নতি নিয়ে চিন্তা করেছেন। তিনি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ঐক্য এবং ঐতিহ্যকে চিরঞ্জীব করে রাখার ক্ষেত্রে সাতটি অপরিহানীয় নীতি ঘোষণা করেছেন যার অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে।[১২৭] পরিবারের সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিকরণে বুদ্ধের শিক্ষার সম্যক ধারণা পালি সাহিত্যে দেখা যায়।

উপরি-উক্ত পারস্পরিক সম্পর্ক আমাদের সুন্দর পথ নির্দেশ করে যার মাধ্যমে একে-অপরের প্রতি বিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। একে-অরের প্রতি আস্থা রাখতে পারবে। পরিবার নামক সংগঠনটি আদর্শ সংগঠন হিসেবে বিবেচিত হবে। পরিবার সুন্দর সুখী এবং সমৃদ্ধশালী করার ক্ষেত্রে আধুনিক কালে বহুবিধ মতবাদের প্রচলন রয়েছে। পরিবার, সমাজকে প্রগতিমুখী, নৈতিক উন্নয়ন, আত্মিক উন্নয়ন এবং সামাজিক উন্নয়ন করার নিখুঁত রূপরেখা পালি কিংবা বৌদ্ধ সাহিত্যে রয়েছে যা বর্তমান সময়েও অনন্য সাধারণ নৈতিক উপাদান হিসেবে বিবেচিত।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা ও তথ্য নির্দেশিকা

১. ঈশান চন্দ্র ঘোষ অনূদিত, জাতক, তৃতীয় খণ্ড (কলিকাত : ১৩৯১ বাংলা), পৃ. ২৮১

২. B C Law, A History of Pali literature, Vol. 1 (Delhi : 1983) , P. 113

৩. প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত, মহাবর্গ (কলিকাতা : ১৯৩৭), পৃ. ৪ ও ১৮

৪. P. A Payutto, A Constitution for Living (Bangkok : 1998), P. 15

৫. শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির, সুত্ত নিপাত (বান্দরবান : ২০০৭), পৃ. ১৬৬-১৭৮

৬. ধম্মপদ, সহস্সবর্গ/১১২

৭. ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, দীর্ঘ নিকায়, তৃতীয় খণ্ড (রাঙ্গামাটি : ২০০৭), পৃ. ১৫৭

৮. মিলিন্দ প্রশ্ন

৯. অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া অনূদিত, অঙ্গুত্তর নিকায়, প্রথম খণ্ড (রাঙ্গামটি : ২০০৪), পৃ. ১৭৫

১০. সাধননন্দ মহাস্থবির অনূদিত, সুত্ত নিপাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

১১. সদ্ধর্ম-রত্ন সংগ্রহ, শিশির বড়ুয়া চৌধুরী সংকলিত (চট্টগ্রাম : ২০১৬), পৃ. ৬৭

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭ ৬৮

১৩. অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া অনূদিত, অঙ্গুত্তর নিকায়, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫-১৭৬

১৪. ভদন্ত ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, ভদন্ত সুমন স্থবির, ভদন্ত বঙ্গীশ, ভদন্ত অজিত ভিক্ষু ভদন্ত সীবক ভিক্ষু অনূদিত, অঙ্গুত্তর নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড (রাঙ্গামটি : ২০১৫), পৃ. ৭০

১৫. অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া অনূদিত, অঙ্গুত্তর নিকায়, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫-১৭৬

১৬. অঙ্গুত্তর নিকায়, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

১৭. মেত্তাবংশ স্থবির অনূদিত, ইতিবুত্তক (রাঙ্গামাটি : ২০১২), পৃ. ১০২-১০৩

১৮. প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু অনূদিত, অঙ্গুত্তর নিকায়, পঞ্চম নিপাত (রাঙ্গামটি : ২০০৮), পৃ. ৩৯

১৯. অঙ্গুত্তর নিকায়, পঞ্চম নিপাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯-৪০

২০. বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘ, মাতা-পিতা এবং আচার্য বা গুরু

২১. ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, দীর্ঘ নিকায়, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২

২২. দীর্ঘ নিকায়, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৬২

২৩. শ্রী ধর্ম্মজ্যোতি স্থবির ও নীলম্বর বড়ুয়া অনূদিত, খুদ্দক পাঠো, কলিকাতা, ১৯৫৫, পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

২৪. মধ্যম নিকায়, দক্ষিণাবিভঙ্গ সুত্ত, উপরি পঞ্হাস ; অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া অনূদিত, অঙ্গুত্তর নিকায়, প্রথম খণ্ড (রাঙ্গামটি : ২০০৪), পৃ. ৯৮

২৫. প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির অনূদিত, থেরগাথা (রেঙ্গুন : ১৯৩৫), পৃ, ৪২৮

২৬. সাধনানন্দ মহাস্থবির, সুত্ত নিপাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫ ও ৩১

২৭. শ্রীমৎ সুগত বংশ মহাস্থবির, বুদ্ধ পূর্ণিমা ও দর্শন (চট্টগ্রাম : ১৯৯২), পৃ. ৬৬

২৮. দস ধম্মক সূত্ত, সূত্র পিটক

২৯. ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ, কৃষ্ণ খণ্ড, ৮৪

৩০. শীলানন্দ ব্রহ্মচারী অনূদিত, সংযুক্ত নিকায়, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড (রাঙ্গামাটি : ২০০৯), পৃ. ১৫৩,

৩১. মেত্তাবংশ স্থবির অনূদিত, ইতিবুত্তক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০-৬১

৩২. ইতিবুত্তক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

৩৩. অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া অনূদিত, অঙ্গুত্তর নিকায়, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

৩৪. অঙ্গুত্তর নিকায়, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

৩৫. প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত, মহাবর্গ, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯১

৩৬. শীলানন্দ ব্রহ্মচারী অনূদিত, সংযুক্ত, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮,

৩৭. দান, প্রিয়বাক্য, হিতচর্যা এবং সমদর্শীতা (ভদন্ত ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, ভদন্ত সুমন স্থবির, ভদন্ত বঙ্গীশ, ভদন্ত অজিত ভিক্ষু ভদন্ত সীবক ভিক্ষু অনূদিত, অঙ্গুত্তর নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড (রাঙ্গামটি : ২০১৫), পৃ. ৩৪)

৩৮. অঙ্গুত্তর নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

৩৯. S. Tachibana, The Ethics of Buddhism (London :1926), P. 152

৪০. শ্রী ঈশান চন্দ্র ঘোষ অনূদিত, জাতক, শানন্দ জাতক (কলকাতা : ১৩৯১ বাংলা), পৃ. ২০৫

৪১. J. Gonda, Change and continuity in Indian Religion, (Hague : 1965), P. 249f

৪২. প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত, মহাবর্গ , প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫-৬৭

৪৩. বিজ্জাচরণ সম্পন্নো সো সেট্ঠো দেবমানুসসেসু।

৪৪. The Commentary on the Dhammpada, Vol-111, PTS (London : 1911), P. 23

৪৫. প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু অনূদিত,অঙ্গুত্তর নিকায়, পঞ্চম নিপাত, প্রাগুক্ত , পৃ. ১২৬-১২৭

৪৬. অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া অনূদিত, অঙ্গুত্তর নিকায়, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬

৪৭.প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু অনূদিত, অঙ্গুত্তর নিকায়, ৫ম খণ্ড, (রাঙ্গামাটি : ২০১১), পৃ.২৫৫

Dhaka University Institutional Repository

৪৮. ধম্মপদ, বুদ্ধবর্গ/১৮৩।

৪৯. মেত্তাবংশ স্থবির অনূদিত, ইতিবুত্তক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

৫০. পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত, মিলিন্দ প্রশ্ন (কোলকাতা : ২০১৩), পৃ. ৯২-৯৩

৫১. ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, দীর্ঘ নিকায়, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২

৫২. অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া অনূদিত, অঙ্গুত্তর নিকায়, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬

৫৩. মেত্তাবংশ স্থবির অনূদিত, ইতিবুত্তক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

৫৪. ইতিবুত্তক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১ ও ৯৮

৫৫. ভদন্ত ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, ভদন্ত সুমন স্থবির ও অন্যান্য অনূদিত, অঙ্গুত্তর নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, ২০১৫, পৃ. ১৩৬

৫৬. রণব্রত সেন সম্পাদিত, ধম্মপদ, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ২১৩

৫৭. মেত্তাবংশ স্থবির অনূদিত, ইতিবুত্তক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।

৫৮. ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, দীর্ঘ নিকায়, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২

৫৯. প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত, মহাবর্গ (কলকাতা : ১৯৩৭), পৃ. ৫৪

৬০. মহাবর্গ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩ ও ৬৫

৬১. পরিমল ভূষণ কর, সমাজতত্ত্ব (কলিকাতা : ২০১১), পৃ. ৩০৩

৬২. মাহমুদা ইসলাম, বিয়ে (ঢাকা : ১৯৯৬), পৃ. ৪

৬৩. Human life and Problems, (Kualalumpur : :1997), P. 35

৬৪. অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া অনূদিত, অঙ্গুত্তর নিকায়, চতুর্থ খণ্ড (রাঙ্গামটি : ২০০৫), পৃ. ২৬৪)

৬৫. ভদন্ত ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, ভদন্ত সুমন স্থবির ও অন্যান্য অনূদিত, অঙ্গুত্তর নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭-৫৯

৬৬. অঙ্গুত্তর নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

৬৭. অঙ্গুত্তর নিকায়, চতুর্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩-৮৪

৬৮., অঙ্গুত্তর নিকায়, চতুর্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

৬৯. শ্রী ঈশান চন্দ্র ঘোষ অনূদিত, জাতক, ৫ম খণ্ড (কলকাতা :১৩৯১ বাংলা), পৃ. ২৫২

৭০. প্রজ্ঞদর্শী ভিক্ষু অনূদিত, অঙ্গুত্তর নিকায়, পঞ্চম নিপাত, পৃ. ৩৩-৩৪

৭১. অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া অনূদিত, অঙ্গুত্তর নিকায়, চতুর্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, , পৃ. ২৬৫

৭২. ক. অন্তো অগ্নিম্হি নিব্বুতে বাহিরতো অগ্নিং অনাহরিতুংতি ;

খ. বাহরিতো অগ্নি ন অন্তো পবেসেতব্বোতি ;

Dhaka University Institutional Repository

গ. যে দদন্তি তেসং যেব দাতব্বংতি ;

ঘ. যে ন দেন্তি তেসং ন দাতব্বতি ;

ঙ. দদন্তস্সাপি অদদন্তস্সাপি দাতব্বংতি ;

চ. সুখং নিসীদিতব্বংতি ;

ছ. সুখং ভুঞ্জিতব্বংতি ;

জ. সুখং নিপজ্জিতব্বতি ;

ঝ. অগ্নি পরিচরিব্বোতি ;

ঞ. অন্তোদেবতা নমসসিতব্বাতি।

[অধ্যাপক ড. সুকোমল চৌধুরী অনূদিত, ধম্পদট্ঠকথা, তৃতীয় খণ্ড, বিসাখাবত্থু (কোলকাতা : ২০১০), পৃ. ১৯৮-২০০]

৭৩. শীলানন্দ ব্রহ্মচারী অনূদিত, সংযুক্ত নিকায়, ১ম ও ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫

৭৪. ভিক্ষু শীলভদ্র, দীর্ঘ নিকায়, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

৭৫. মেত্তাবংশ স্থবির অনূদিত, ইতিবুত্তক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৭৬. ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, দীর্ঘ নিকায়, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫

৭৭. মেত্তাবংশ ভিক্ষু অনূদিত, খুদ্দক পাঠো (রাঙ্গামাটি : ২০১৬), পৃ. ১৩৮

৭৮. মেত্তাবংশ স্থবির অনূদিত, ইতিবুত্তক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

৭৯. অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া অনূদিত, অঙ্গুত্তর নিকায়, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

৮০. অঙ্গুত্তর নিকায়, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

৮১.অঙ্গুত্তর নিকায়, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭-১৬৮

৮২. অঙ্গুত্তর নিকায়, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭-১৬৮

৮৩. রণব্রত সেন সম্পাদিত, ধম্মপদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮-৩৯ বিশ্বকবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের একটি গান রয়েছে

'যদি তোর ডাক শোনে কেউ না আসে তবে একলা চলেরে।'

৮৪. রণব্রত সেন সম্পাদিত, ধম্মপদ, প্রাগুক্ত,, পৃ. ৫৩

৮৫. শীলানন্দ ব্রহ্মচারী অনূদিত, সংযুক্ত নিকায় ১ম ও ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৮৬.শ্রী ঈশান চন্দ্র ঘোষ, জাতক, দ্বিতীয় খন্ড, (কলিকাতা : ১৩৮৪), পৃ. ৬১

Dhaka University Institutional Repository

৮৭. শ্রী ঈশান চন্দ্র ঘোষ, জাতক, প্রথম খন্ড, (কলিকাতা : ১৩৮৪), পৃ. ১০০

৮৮. জাতক, প্রথম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

৮৯. উদ্ধৃত, রণব্রত সেন সম্পাদিত, ধম্মপদ, প্রবন্ধ, বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় মনীষা, ত্রিপুরাশংকর সেনশাস্ত্রী, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৫৩

৯০. Dialogues of Buddha— P. 185

৯১. অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া অনূদিত, অঙ্গুত্তর নিকায়, চতুর্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

৯২. অঙ্গুত্তর নিকায়, চতুর্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪,

The Guide, Bhikkhu Nanamali Tra. PTS, Londan, 1962 P. 216

৯৩. ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, দীর্ঘ নিকায়, তৃতীয় খণ্ড, রাঙ্গামটি , ২০০৭, পৃ. ১৬০

৯৪. দীর্ঘ নিকায়, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২

৯৫. শ্রী ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত, জাতক, পঞ্চম খণ্ড, কলকাত, ১৯৯১, পৃ. ৩১৩

৯৬. পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫৬, পৃ. ১৭৬-২৮৩

৯৭. পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪-২০৫

৯৮. শ্রীমৎ বঙ্গীস ভিক্ষু, শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু এবং প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু অনূদিত, সংযুক্ত নিকায়ে মহাবর্গ, (খাগড়াছড়ি : ২০১১), পৃ. ৪৪০,

৯৯. ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, দীর্ঘ নিকায়, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২

১০০. দীর্ঘ নিকায়, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩

১০১. শিশির বড়ুয়া চৌধুরী সংকলিত, সদ্ধর্ম-রত্ন সংগ্রহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

১০২. নত্থি মে সরণং অঞ্ঞং সংঘো মে সরণং বরং।

১০৩. সব্যসাচী চট্টোপধ্যায় সম্পাদিত , ইতিহাস অনুসন্ধান, ২৯, বুদ্ধের মানবতাবাদ : একটি পর্যেষণা (প্রবন্ধ), পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০১৫, পৃ. ১৩৮

১০৪. সাধনানন্দ মহাস্থবির অনূদিত, সুত্ত নিপাত

১০৫. ধম্মপদ, ব্রাহ্মণবর্গ/৩৯৩

১০৬. প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু অনূদিত,অঙ্গুত্তর নিকায়, পঞ্চম নিপাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫)

Dhaka University Institutional Repository

১০৭. মেত্তাবংশ ভিক্ষু অনূদিত, ইতিবুত্তক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

১০৮. অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া অনূদিত, অঙ্গুত্তর নিকায়, চতুর্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭ এবং ২৮

১০৯. পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত, মিলিন্দ প্রশ্ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২.

১১০. ভদন্ত ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, ভদন্ত সুমন স্থবির ও অন্যান্য অনূদিত, অঙ্গুত্তর নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

১১১. অঙ্গুত্তর নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত,পৃ. ৬৯-৭০

১১২. ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, দীর্ঘ নিকায়, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪

১১৩. দীর্ঘ নিকায়, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩

১১৪. দীর্ঘ নিকায়, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩

১১৫. দীর্ঘ নিকায়, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩

১১৬. মেত্তাবংশ স্থবির অনূদিত, ইতিবুত্তক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

১১৭. ভদন্ত ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, ভদন্ত সুমন স্থবির ও অন্যান্য অনূদিত, অঙ্গুত্তর নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬-৬৯

১১৮. রণব্রত সেন সম্পাদিত, ধম্মপদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭-১৯৯

১১৯. অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া অনূদিত অঙ্গুত্তর নিকায়, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত,পৃ. ১০৫

১২০. পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত, মিলিন্দ প্রশ্ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০.

১২১. ভদন্ত ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, ভদন্ত সুমন স্থবির ও অন্যান্য অনূদিত, দীর্ঘ নিকায়,[দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯-১৬০

১২২. শীলানন্দ ব্রহ্মচারী অনূদিত, সংযুক্ত নিকায় ১ম ও ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

১২৩. মেত্তাবংশ স্থবির অনূদিত, ইতিবুত্তক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

১২৪. ইতিবুত্তক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

১২৫. অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া অনূদিত অঙ্গুত্তর নিকায়, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭-১২৮

১২৬. কৌশাম্বী সূত্র, মধ্যম নিকায়, সূত্র পিটক

১২৭. রাজগুরু ধর্মরত্ন মহাস্থবির অনূদিত, মহাপরিনিব্বানং সুত্তং, (চট্টগ্রাম : ১৯৫৪), পৃ. ০৪-৮

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

গৌতম বুদ্ধ খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ অব্দে ভারতবর্ষের কপিলাবস্তু রাজ্যের (বর্তমান নেপাল) লুম্বিনী উদ্যানে জন্মগ্রহণ করেন। পয়ঁত্রিশ বছর বয়সে তিনি বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদাবে ধর্ম প্রচার শুরু করে আশি বছর বয়স পর্যন্ত তা প্রচার করেন। তাঁর ধর্মীয় মতবাদকে যারা অনুসরণ করেন তারা বৌদ্ধ। তাঁর উপদেশিত কিংবা ধর্মবাণী যেই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে তাই 'ত্রিপিটক'। এটি বৌদ্ধদের ধর্মীয় পবিত্র গ্রন্থ। ত্রিপিটক হলো তিনটি পিটকের সমাহার। পিটক তিনটি হলো : ক. বিনয় পিটক, খ. সূত্র পিটক, এবং গ. অভিধর্ম পিটক। সুতরাং বলা যায়, বুদ্ধের বাণী যে আধারে সংরক্ষিত রয়েছে তাকেই পিটক বলা হয়। ত্রিপিটকের মোট গ্রন্থ বত্রিশ। ত্রিপিটকের উৎস বুদ্ধবাণী যেখানে তাঁর মতাদর্শ ও চিন্তার রূপ-রূপান্তর দেখা যায়। ত্রিপিটককে অবলম্বন করেই পালি সাহিত্য সৃষ্টি হয়। পালি সাহিত্যের মূলভিত্তি ত্রিপিটক। ত্রিপিটক সংকলনের পরবর্তী যুগে ভারতবর্ষে, শ্রীলংকা (প্রাচীন নাম সিংহল), মায়ানমান (পূর্বনাম ব্রহ্মদেশ), থাইল্যান্ড (পূর্বনাম শ্যামদেশ) এবং কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশে ত্রিপিটককে অবলম্বন করে আরো অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয় যাকে ত্রিপিটক বহির্ভূত সাহিত্য বলা হয়। ত্রিপিটক অন্তগর্ত সাহিত্যকে ইংরেজিতে Non Canonical Text আর ত্রিপিটক বহির্ভূত গ্রন্থসমূহকে Non Canonical Text বলা হয়। ত্রিপিটক অন্তগর্ত সাহিত্য এবং ত্রিপিটক বহির্ভূত সাহিত্যকে নিয়ে গড়ে উঠে বিশাল পালি সাহিত্য।

পালি সাহিত্য হতে প্রাক্‌বৌদ্ধ ও বৌদ্ধযুগের ঐতিহাসিক ঘটনা সমূহের অনেক নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয় যায়। সুদূর অতীতকাল থেকে মানববিদ্যার পঠন-পাঠনে পালি সাহিত্য অবদান রেখে চলেছে এখনো বর্তমান। পালি সাহিত্যের ইতিহাস গৌরবামণ্ডিত যার গুরুত্ব ও ব্যাপকতা পৃথিবীর অন্যান্য যে কোনো সাহিত্যের সাথে তুলনীয়। মানবিক মূল্যবোধ উন্নত সমাজ বিনির্মানেও সাহিত্যটির রয়েছে অত্যুজ্জ্বল ভূমিকা। বলা যায়, পালি সাহিত্য মানবিক সাহিত্য। এতে অত্যন্ত সুন্দর করে মানবাধিকারের কথা উপস্থাপিত হয়েছে। মানবতার বাতাবরণে কিংবা সদ্ভাব-সম্প্রীতির মেলবন্ধনে সবাইকে আবদ্ধ করতে সহায়তা করে এটি। পালি সাহিত্যে তথ্য-উপাত্ত কিংবা তথ্য উপাদান আদর্শিক সমাজবিনির্মানে সহায়ক। বুদ্ধের উপদেশ কিংবা ধর্মবাণীতে মানবাধিকার সম্পর্কিত প্রচুর তথ্য ও তত্ত্ব রয়েছে। তাঁর ধর্মের মূল শিক্ষা অহিংসা। তিনি তাঁর ধর্মে রাজা-শ্রেষ্ঠী, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়, বৈশ্য-শূদ্র, ধনী-গরীব, দাস-দাসী, অস্পৃশ্য, চণ্ডাল, বারবণিতাসহ সবাইকে স্থান করে দিয়ে তাদের অধিকারের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শন করেছেন। জাতি-গোত্র-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে অখণ্ড পৃথিবীতে সবাই সমান। সকল মানুষকে তিনি এক এবং অভিন্ন করে দেখেছেন। বলেছেন সর্বক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকারের কথা। তিনিই সর্বপ্রথম দেখিয়েছেন মানবসমাজ অখণ্ড এবং বিশ্বের সকল মানুষ অবিচ্ছেদ্য এবং পরম আত্মীয়তায় আবদ্ধ। সকলের সঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

প্রবেশাধিকার দিয়ে তিনি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছেন এখনো। সকল প্রকার বর্ণ-বৈষম্য, জাতিভেদ প্রথার বিলোপ সাধন, মানবমনের উন্নয়ন এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি-সদ্ভাব ও সৌভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করাই হলো বুদ্ধের অন্যতম শিক্ষা।

তিনি মানবতার জয় ও মানবকল্যাণের জন্য জীবনের পরমসত্য উপলব্ধি করেন। তাঁর প্রদেয় নৈতিক শিক্ষা সুন্দর জীবনযাপনে, সমাজগঠনে যেমন উদ্বুদ্ধ করে তেমনি আবার রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বুদ্ধের জীবন সাধনা ও দর্শন চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল মানবসমাজ এবং মানবের মঙ্গল ও কল্যাণ সাধন। ভারতীয় চিন্তা-ধারায় মানবকেন্দ্রিক দর্শন তথা মানবতাবাদের পরিপূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য করা যায় মহামানব বুদ্ধের দর্শন ও জীবন সাধনায়। তাঁর দর্শনে ঈশ্বর অতীন্দ্রিয় সত্তার কোনো উল্লেখ নেই। জীবের মুক্তির জন্য জীবই যথেষ্ট। তার মানে বৌদ্ধ দর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল মানুষ ও মানুষের কল্যাণ প্রতিষ্ঠা, কোনো অতিপ্রাকৃত সত্তার পূজা-অর্চনা নয়। মানুষ এক বিরাট সম্ভাবনাময় সত্তা, সে নিজেই নিজের ভাগ্য নিয়ন্তা। একথা সম্ভবত তথাগত বুদ্ধই প্রথম গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তৎকালীন সময়ে যে বর্ণপ্রথা বিদ্যমান ছিল তার মূলে বুদ্ধ কুঠারাঘাত করেছেন। বুদ্ধের মানবতাবাদে বিশ্বপ্রেমের দিক নির্দেশনা রয়েছে। এ আবেদন রাজা প্রসেনজিৎ, বিম্বিসার ও উদয়নের কাছে যেমন : সর্বহারা উন্মাদিনী পটাচারা, বারবণিতা আম্রপালি ও পুত্র শোকে ক্রন্দনরতা কৃশা গৌতমীর কাছে ছিল একই রকম তেমন প্রযোজ্য, এর চেয়ে বড় বিশ্বপ্রেমিক কে হতে পারে। বুদ্ধ সর্বত্র মানুষকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর উপদেশের সর্বত্র মানবের জয়গান করা হয়েছে। মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসাকে তিনি গভীরভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

প্রত্যেক ধর্মেই নারী অধিকারের কথা রয়েছে। নারী-পুরুষের পূর্ণ পরিচয় তারা উভয়েই মানুষ। সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে রয়েছে নারী-পুরুষের অংশগ্রহণমূলক অবদান। বুদ্ধ নারী-পুরুষ উভয়ের প্রতি সমান মর্যাদাবোধ প্রদর্শন করেছে। পুরুষের ন্যায় ধর্মসাধনা ও শাস্ত্রচর্চায় নারীদের অধিকার সম্বন্ধে তেমন বিশেষ কোনো রকম পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। ভিক্ষুণী সঙ্ঘ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নারীজাতি ভিক্ষুণীধর্মে দীক্ষা নিয়ে সঙ্ঘে প্রবেশের অনুমতি লাভ করেছিলেন। পুরুষের ন্যায় নারীরাও সঙ্ঘে জীবনযাপনের অধিকারিনী হয়ে সর্বোচ্চ শিক্ষা ও জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে পুরুষের ন্যায় পূর্ণ সুযোগ সুবিধা পেয়েছিলেন। বুদ্ধের সময়ে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি নারীকে সমাজে অধিকারের স্বীকৃতি প্রদানের কথা বলেছেন। তিনি সকল প্রকার সামাজিক ও ধর্মীয় বিধি-বিধান অগ্রাহ্য করে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পরিপালনের ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি গোত্র-বর্ণনির্বিশেষে সকল নারীকে সমানাধিকার প্রদান করে ছিলেন। বুদ্ধকালীন ভারতে

Dhaka University Institutional Repository

স্ত্রীলোকের অনেক বিষয়ে স্বাধীনতা ছিল। স্ত্রী শিক্ষা সমাজের সর্বস্তরে বহুল প্রচলিত ছিল। এমন কি বারবণিতাও শিক্ষিত ছিলেন। আম্রপালির কবিত্ব শক্তি, পণ্ডিত ও বিবেচনা শক্তি প্রশংসনীয়।

মানবকল্যাণ মানবকেন্দ্রিক কল্যাণ যেখানে মানুষের সকল প্রকার মানবিকমর্যাদা কিংবা মর্যাদাবোধের কথা গভীর ভাবে অনুরণিত হয়। পরস্পর পরস্পকে প্রেম-প্রীতি, পরস্পর মঙ্গল, কল্যাণ ও শুভ চেতনাবোধের মাধ্যমে আবদ্ধ করাই হলো মানবকল্যাণের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। মানবকল্যাণে যে কজন নিবেদিত প্রাণ রয়েছে তাদের মধ্যে বুদ্ধ অন্যতম। তিনি মানবের কল্যাণের জন্য যে সমস্ত নীতির কথা বলেছেন তন্মধ্যে পঞ্চশীল কিংবা পঞ্চনীতি অন্যতম নয় সর্বাপেক্ষা উত্তমও বটে। সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠায়, নৈতিক আচার-আচরণ সমৃদ্ধিকরণে, সুন্দর-বিশুদ্ধ জীবনযাপনকরণে এবং সামাজিক মর্যাদাবোধ প্রতিষ্ঠায় পঞ্চশীলকে পারিবারিক আচার-আচরণ সমন্বিত বিনয়বিধানও বলা হয় যা বিশ্বমানবতার মহাকল্যাণে বুদ্ধ প্রবর্তন করেন।

পারিবারিক সম্পর্কোন্নয়নে বুদ্ধের নির্দেশনা সবাইকে একটি সুন্দর পথনিদের্শনা করে যার মাধ্যমে একটি নৈতিক ও সহনশীল পরিবার গড়ে তোলা সম্ভব। বুদ্ধ তাদের বিভিন্নভাবে আত্মসচেতন হয়ে কল্যাণমিত্রদের সংসর্গে সুখে জীবনযাপন করার উপদেশ প্রদান করেন। পরিবারকে সুখী ও সমৃদ্ধশালী করে তোলার জন্য যে অনেক উপদেশ বুদ্ধ প্রদান করেছেন যা পালি সাহিত্য কিংবা বৌদ্ধ সাহিত্যের বিভিন্ন স্থানে দেখা যায়। বুদ্ধ কর্তৃক প্রদত্ত উপদেশসমূহকে বলা হয় গৃহীবিনয়। বুদ্ধের দৃষ্টিতে প্রত্যেক মানুষেরই রয়েছে সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। রয়েছে একে-অপরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, সম্মান দেখানো, বিশ্বাসস্থাপনসহ নানাবিধ কল্যাণময় দিক নির্দেশনা। বুদ্ধ নিজ কর্ম ও কর্মফলে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম-দর্শনে দেখা যায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মের ফলভোগ করে। তিনি বলেছেন, সতত সৎ, সুন্দর, কুশল কর্মে উদ্যোগী হয়ে জীবনকে সুচারুরূপে গড়ে তোলা উচিত। সবশেষে বলা যায়, পালি সাহিত্যে পরিপূর্ণ জীবনবিধানের একটি ধারণা পাওয়া যায়। জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য অসাধারণ তথ্য-উপাত্ত রয়েছে এখানে। এতে যে সমস্ত মানবিক নির্দেশনা রয়েছে তা যদি পালন করা সম্ভব হয় তবে সুন্দর আগামী রচনা করা সম্ভব এমনটি বলা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা বই

অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া অনূদিত, অঙ্গুত্তর নিকায়, চতুর্থ খণ্ড (রাঙ্গামাটি ; বনভন্তে প্রকাশনী, ২০০৫)

অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া অনূদিত, অঙ্গুত্তর নিকায়, চতুর্থ খণ্ড (রাঙ্গামাটি ; বনভন্তে প্রকাশনী ২০০৫)

অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া অনূদিত, পারিবারিক সম্প্রীতি (চট্টগ্রাম : বুডিস্ট রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন, ২০১০)

অধ্যাপক ড. সুকোমল চৌধুরী অনূদিত, ধম্পদট্ঠকথা, তৃতীয় খণ্ড, বিসাখাবত্থু (কোলকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সী, ২০১০)

অনুকূল চন্দ্র বন্দ্যোপধ্যায়, বৌদ্ধ সাহিত্য ও শিক্ষ-দীক্ষার রূপরেখা (কলিকাতা : ১৯৭৮)

আফতাব হোসেন, মানবাধিকারের তাৎপর্য (ঢাকা : ১৯৯৬, বাংলা একাডেমী)

আশা দাস, ভারত-ভারতবোধ ভারত সংস্কৃতি (কলিকাতা : ফার্মা কে এম প্রা. লি. ২০০১)

আব্দুল কাদির সম্পাদিত, নজরুল রচনাবলী (ঢাকা : বাংলা একাডেমী)

এস. এম. লুৎফুর রহমান, বৌদ্ধ চর্যাপদ (ঢাকা : ১৯৯৯)

কাজী নজরুল ইসলাম, সঞ্চয়িতা, ত্রয়োদশ সংস্করণ (কলকাতা : ১৩৭১)

করুণাবংশ ভিক্ষু , পাচিত্তিযা (চট্টগ্রাম : রাজবন বিহার, ২০০৭)

গিরিশ চন্দ্র বরুয়া অনূদিত, ধম্মপদ (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭)

গোপাল হালদার, সংস্কৃতির রূপান্তর (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৮৭)

গাজী শামছুর রহমান, মানবাধিকার ভাষ্য (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (ঢাকা : আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ২০১১)

চারুচন্দ্র বসু অনূদিত, ধম্মপদ (কোলকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সী, ২০১০)

চিন্ময় চৌধুরী, প্রসঙ্গ মানবাধিকার (কলকাতা : ভারতীয় বুক স্টল, ২০০৬)

জ্যোতিপাল স্থবির অনূদিত, আচার্য শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতার (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪)

জ্যোতিপাল ভিক্ষু অনূদিত, উদানং (খাগড়াছড়ি : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, ২০১৩)

জামিল চৌধুরী সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বংলা অভিধান (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০১৩)

Dhaka University Institutional Repository

ড. রাধায়ন জানা, পালি ভাষা- সাহিত্যে বৌদ্ধ দর্শন ও রবীন্দ্রনাথ (কলকাতা : ১৯৮৫)

ড. মো. আবদুল আউয়াল খান, ড. আজাহার, আলী, মো. আব্দুস সামাদ ও মো. মিজানুর রহমান শিক্ষার ভিত্তি (ঢাকা : ১৯৯৯)

ড. জিনবোধি ভিক্ষু, তথাগত বুদ্ধের বোধি-বিধি (চট্টগ্রাম : বুডিস্ট রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন, ২০০৩)

ড. ভাস্কর চট্টোপধ্যায়, ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা [প্রাচীন যুগ] (কলকাতা : নিউ বৈশাখী প্রেস, ২০০৫)

ড. আদুল ওয়াহাব, ফোকলোর-মানবতাবাদ ও বঙ্গবন্ধু (ঢাকা : ২০১০)

ড. শুভ্রা বড়ুয়া অনূদিত, মহাবংশ (কলিকাত : গোবিন্দ প্রসাদ বড়ুয়া,২০০৪)

তাহ্‌মিনা আলম, বাংলার সাময়িকপত্রে মুসলিম নারী সমাজ, ১৯০০-১৯৪৭ (ঢাকা : ১৯৯৮)

ধর্ম্মতিলক স্থবির, সদ্ধর্ম রত্নাকর (তাইওয়ান : দি করপর‍্যাট বডি অব দি বুদ্ধ এডুকেশনাল ফাউন্ডেশন, ১৯৩৬)

ধর্মদীপ্তি মহাস্থবির, বুদ্ধের জীবন ও বাণী (চট্টগ্রাম : বিশ্বশান্তি প্যাগোডা, চ. বি. ১৩৯৯ বাংলা)

ধর্মাধার মহাস্থবির, বৌদ্ধদর্শন (কলিকাতা : ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, ১৪০১ বাংলা)

ধর্মজ্যোতি স্থবির ও নীলাম্বর বড়ুয়া অনূদিত, খুদ্দক পাঠো (কলিকাতা : ১৯৫৫)

ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত, মিলিন্দ প্রশ্ন (কলিকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সী, ১৯৮৭)

নুরুল ইসলাম, মানবাধিকার ও সমাজকর্ম (ঢাকা : নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৫)

নীরু বড়ুয় অনূদিত, পালিকাব্যে তেলকটাহ গাথা (ঢাকা : মিজান পাবলিশার্স, ২০০৮)

নিরোধানন্দ ভিক্ষু, শীলে আত্ম প্রতিষ্ঠা (চট্টগ্রাম : ২০০৮)

প্রজ্ঞালোক স্থবির, বুদ্ধের অভিযান (কলিকাতা : ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, ১৩৯৯ বাংলা)

প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত, মহাবর্গ (কলিকাতা : যোগেন্দ্র রূপসী বালা ত্রিপিটক ট্রাস্ট, ১৯৩৭)

প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির, ভিক্খু পাতিমোক্খং (কলিকাতা : ১৯৮৭)

প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু অনূদিত, অঙ্গুত্তর নিকায়, দশম ও একাদশ নিপাত (রাঙ্গামাটি : বনভন্তে প্রকাশনী ২০১১)

প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস (কলকাতা : বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র, ১৪১২ বঙ্গাব্দ)

প্রসূন বসু সম্পাদিত, সৌন্দরানন্দম/১৩-২৭-২৮, ৯ম খণ্ড (কলিকাতা : ১৯৮০)

প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষ অনূদিত , অঙ্গুত্তর নিকায়, পঞ্চম নিপাত (রাঙ্গামাটি : বনভন্তে প্রকাশনী ২০০৮)

Dhaka University Institutional Repository

প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু, অঙ্গুত্তর নিকায় অনূদিত, পঞ্চম খণ্ড (রাঙ্গামাটি : বনভন্তে প্রকাশনী, ২০১১)

প্রজ্ঞাবংশ ভিক্ষু সম্পাদিত, বিশুদ্ধিমার্গ ও বৌদ্ধ সাধনা (কলিকাতা : ১৯৩৬)

প্রণব কুমার বড়ুয়া, গৌতম বুদ্ধ জীবন ও দর্শন (ঢাকা : ২০১২)

পরিমল ভূষণ কর, সমাজতত্ত্ব (কলিকাতা : ২০১১)

বঙ্কিম রচনাবলী সাহিত্য সমগ্র, সাম্য, তুলি কলম (কলিকাতা : ১৩৯৩ বাংলা)

বেণীমাধব বড়ুয়া অনূদিত, মধ্যম নিকায়, প্রথম খণ্ড (কলিকাতা : যোগেন্দ্র রূপসী বালা ত্রিপিটক বোর্ড, ১৯৪০)

বীরেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দি সংকলিত, প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি বা কার্যকারণ নীতি (চট্টগ্রাম : ১৯৩৯),

বিমলা চরণ লাহা, বৌদ্ধ রমনী (কলিকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সী, ১৯৯৯)

বিনয়েন্দ্র নাথ চৌধুরী, মধ্যম নিকায়, তৃতীয় খণ্ড (কলিকাতা : ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, ১৯৯৩)

বিজয় মজুমদার অনূদিত, থেরী গাথা সন তারিখ অনুল্লেখিত

বোধিপাল শ্রামণ, বিদর্শন পূর্ণ শান্তি সমাধান (চট্টগ্রাম : ১৯৯৯)

বিমলাচরণ লাহা অনূদিত, সৌন্দরানন্দ কাব্য (কলকাতা : ২০০৩)

বেলু রানী বড়ুয়া অনূদিত, থেরী গাথা, (ঢাকা : বাংলাদেশ রিসার্স সেন্টার ফর বুড্ডিস্ট স্টাডিজ, ২০০৪)

ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, দীর্ঘ নিকায়, তৃতীয় খণ্ড (কলিকাতা : মহাবোধি সোসাইটি, ১৩৬১)

ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, দীর্ঘ নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড (কলিকাতা : মহাবোধি সোসাইটি, ১৩৬১)

ভিক্ষু শীলভদ্র, থেরী গাথা (তাইওয়ান : দি করপর‍্যাট বডি অব দি বুদ্ধ এডুকেশনাল ফাউন্ডেশন, ২০০৬)

ভিক্ষুশীল ভদ্র, দীর্ঘ নিকায়, তৃতীয় খণ্ড (রাঙ্গামাটি : বনভন্তে প্রকাশনী ২০০৭)

ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, ধর্ম্মচক্র প্রবর্তন সূত্র (কলিকাতা : ১৯৫১)

মেত্তাবংশ স্থবির অনূদিত, ইতিবুত্তক (রাঙ্গামাটি : বুদ্ধ শাসন উন্নয়ণ পরিষদ, ২০১২)

ভদন্ত ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, ভদন্ত সুমন স্থবির, ভদন্ত বঙ্গীশ, ভদন্ত অজিত ভিক্ষু ভদন্ত সীবক ভিক্ষু অনূদিত, অঙ্গুত্তর নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড (রাঙ্গামটি : বনভন্তে প্রকাশনী ২০১৫)

মাহমুদা ইসলাম, বিয়ে (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬)

রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, পালি সাহিত্যের ইতিহাস (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮)

Dhaka University Institutional Repository

রণব্রত সেন সম্পাদিত, ধম্মপদ, প্রবন্ধ : গৌতম বুদ্ধের দার্শনিক চিন্তা (কলিকাতা : হরফ প্রকাশনী, ১৯৮৮)

রণবীর চক্রবর্তী, প্রাচীন ভারতে অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধান (কলকাতা : ১৩৯৮ বাংলা

রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রবন্ধ : শিক্ষা, (জন্মশত বার্ষিকী সংস্করণ), একাদশ খণ্ড (কলিকাতা),

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছিন্নপত্রাবলী (কলিকাতা : ১৯৯৪)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বুদ্ধদেব, (ঢাকা : মাটিগন্ধা, ২০১২)

মো. সাইফুল ইসলাম দিলদার, মানবাধিকার তদন্ত (ঢাক : ১৯৯৭),

মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন সম্পাদিত, বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ (স্পোশাল ভলিউম

মো: মতিউর রহমান বাঙালির দর্শন : মানুষ ও সমাজ, (ঢাকা : ২০০০)

এম মতিউর রহমান সম্পাদিত, ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি (ঢাকা : ২০০৮)

মহিম চন্দ্র অনূদিত, বিমুক্তিমার্গ (রাঙ্গামাটি : বনভন্তে প্রকাশনী, ২০১২)

মেত্তাবংশ অনূদিত, খুদ্দক পাঠ (চট্টগ্রাম : ত্রিপিটক পাবলিশিং এসোয়িশন, ২০১৬)

রাজগুরু শ্রীমৎ ধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির অনূদিত, দীর্ঘ নিকায়, প্রথম খণ্ড (রেঙ্গুন : ত্রিপিটক পাবরিশিং প্রেস ১৯৬২)

লা লেভিন, মানবাধিকার : প্রশ্ন ও উত্তর (নয়াদিল্লী : ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ২০০২)

শ্রী রাজগুর ধর্মরত্ন মহাস্থবির অনূদিত, মহাপরিনিব্বানং সুত্তং (চট্টগ্রাম : ১৯৫৪)

শ্রী ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত, মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড (কলিকাতা :ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, ১৩৯৪বাংলা)

শ্রী ঈশান চন্দ্র ঘোষ অনূদিত, জাতক, প্রথম খণ্ড (কলকাতা : করুণা প্রকাশনী, ১৩৮৪ বাংলা)

শ্রী ঈশান চন্দ্র ঘোষ অনূদিত, জাতক, দ্বিতীয় খণ্ড (কলকাতা : করুণা প্রকাশনী, ১৩৮৪ বাংলা)

শ্রী ঈশান চন্দ্র ঘোষ অনূদিত, জাতক, তৃতীয় খণ্ড (কলকাতা : করুণা প্রকাশনী, ১৩৯১ বাংলা)

শ্রী ঈশান চন্দ্র ঘোষ অনূদিত, জাতক, ৫ম খণ্ড (কলকাতা : করুণা প্রকাশনী, ১৩৯১ বাংলা)

শ্রী ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত, জাতক, ষষ্ঠ খণ্ড (কলিকাতা : করুণা প্রকাশনী, ১৩৯১ বাংলা)

শ্রীমৎ সুগত বংশ মহাস্থবির, বুদ্ধ পূর্ণিমা ও দর্শন (চট্টগ্রাম : ১৯৯২)

শীলরত্ন ভিক্ষু পালি-বাংলা অভিধান (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০২)

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির অনূদিত, সুত্ত নিপাত (বান্দরবান : করুণাপুর বন বিহার, ২০০৭)

Dhaka University Institutional Repository

শ্রী ধর্ম্মজ্যোতি স্থবির অনূদিত, খুদ্দক পাঠো (কলিকাতা : ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, ১৯৫৫)

শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত, মিলিন্দ প্রশ্ন (কলিকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সী, ২০১৩)

শীলানন্দ ব্রহ্মচারী অনূদিত, সংযুক্ত নিকায়, প্রথম খণ্ড (কলিকাতা : ১৪০০ বাংলা)

শীলানন্দ ব্রহ্মচারী অনূদিত, সংযুক্ত নিকায়, প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খন্ড (রাঙ্গামাটি : বনভন্তে প্রকাশনী, ২০০৯)

শীলালঙ্কার মহাস্থবির, ধম্মপদট্ঠকথা, প্রথম খণ্ড (কোলকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সী, ২০১০)

শ্রীমৎ বংশদ্বীপ মহাস্তবির, ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ (রাঙ্গামাটি : রাজবন বিহার, ২০১৩)

শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, মহাশান্তি মহাপ্রেম (চট্টগ্রাম : বুডিস্ট রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন, ২০০২)

শ্রী বিমলাচরণ লাহা, বৌদ্ধ রমণ (কলিকাতা : ১৯৯৪)

শীলালঙ্কার মহাস্থবির, বুদ্ধ যুগে বৌদ্ধ নারী (কলিকাতা : ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, ১৩৯৭ বাংলা)

শরীফ হারুন সম্পাদিত, বাংলাদেশ দর্শন : ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান, তৃতীয় খণ্ড (ঢাকা : ১৯৯৯),

শ্রীবিধু শেখর শাস্ত্রী অনূদিত, মিলিন্দ পঞ্হো (বোলপুর-শান্তিনিকেতন : ১৩১৫ বাংলা)

শ্রীমৎ বঙ্গীস ভিক্ষু, শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু এবং প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু অনূদিত, সংযুক্ত নিকায়ে মহাবর্গ, (খাগড়াছড়ি : কিষ্ট লাল চাকমা ও অন্যান্য, ২০১১)

শিশির বড়ুয়া চৌধুরী সংকলিত, সদ্ধর্ম-রত্ন সংগ্রহ (চট্টগ্রাম : অমিতাভ প্রকাশনী, ২০১৬)

সুমঙ্গল বড়ুয়া, বুদ্ধবাণীর মূলমন্ত্র (ঢাকা : পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ২০১০)

সুভূতিরঞ্জন বড়ুয়া, বৌদ্ধ মহয়িসী নারী (কলিকাতা : ১৪০০)

সেলিনা বাহার সম্পাদিত, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন স্মারক গ্রন্থ (ঢাকা : ২০০২)

সত্যপ্রিয় মহাথের অনূদিত, চুল্লবর্গ (রাঙ্গামাটি : বনভন্তে প্রকাশনী ২০০৩)

সঘোধি ভিক্ষু অনূদিত, থেরী গাথা অট্ঠকথা (রাঙ্গামাটি : বনভন্তে প্রকাশনী ২০১০)

সুমনপাল ভিক্ষু অনূদিত, সদ্ধম্মোপাযন (কোলকাতা : ২০১২)

সব্যসাচী চট্টোপধ্যায় সম্পাদিত , ইতিহাস অনুসন্ধান, ২৯, বুদ্ধের মানবতাবাদ : একটি পর্যেষণা (প্রবন্ধ) (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০১৫)

সুমঙ্গল বড়ুয়া ও বেলু রানী বড়ুয়া অনূদিত, দ্বীপবংস (ঢাকা : বাংলাদেশ রিসার্স সেন্টার ফর বুড্ডিস্ট স্টাডিজ,

Dhaka University Institutional Repository

২০০৪)

সুভূতি রঞ্জন বড়ুয়া, অভিধর্মার্থ সংগ্রহ (কলিকাতা : ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, ১৯৯১)

সত্যসাধন চক্রবর্তী ও নির্মল কান্তি ঘোষ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান (কলকাতা : শ্রীভূমি পাবলিশিং কোং, ১৯৯৪)

সুকোমল চৌধুরী, মহামানব গৌতম বুদ্ধ (কলিকাতা : ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, ১৯৯৫)

সুদর্শন বড়ুয়া, প্রশ্নোত্তরে ত্রিপিটক, তৃতীয় খণ্ড (চট্টগ্রাম : ২০০৮)

সোলায়মান আলী সরকার, ভারতের দর্শন পরিচিতি (ঢাকা : ২০০৪)

স্থবির অনুদিত, থের গাথা (তাইওয়ান : দি করপর‍্যাট বডি অব দি বুদ্ধ এডুকেশনাল ফাউন্ডেশন, ১৯৯৮)

পত্রিকা

দীপঙ্কর, বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশন-এর মুখপত্র (ঢাকা : ২০০০)

সৌম্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধ ছাত্র সংসদের মুখপত্র (ঢাকা : ২০০০)

সংঘশক্তি (চট্টগাম : ১৯৯৭) পৃ. ২২-২৩

দর্শন ও প্রগতি, পারভীন আক্তার, মানব উন্নয়নে মানবতাবাদ, ২৩শ বর্ষ, ১ম ২য় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর, ২০০৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, এম.এ এরশাদুল বারী, প্রবন্ধ : মানবাধিকারের সর্বজীনন ঘোষণা,৪৩শ সংখ্যা, জুন-১৯৯২

সওগাত, রাজিয়া খতুন, সমাজ ও গৃহে নারী স্থান, ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৩৪, ১৯২৭

সাহিত্য পত্রিকা, চল্লিশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাচ্যবিদ্যা, বেলু রানী বড়ুয়া, প্রবন্ধ বৌদ্ধ সাধনা পদ্ধতি : ব্রহ্মবিহার, ১ম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৯৯ ঢা. বি.

পঠিত প্রবন্ধ

ড. বেণীমাধব ও ফণীভূষণ বড়ুয়া স্মারক বক্তৃতার পঞ্চম বক্তৃতা, প্রবন্ধ : মহান বুদ্ধের উজ্জ্বল উত্তরাধিকার ও একুশ শতকের বিশ্ব, অধ্যাপক যতীন সরকার, অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, ১ জুন, (চট্টগ্রাম : ২০০৭)

জিনবোধি ভিক্ষু, ইসলামিক ফাউন্ডেশেন কর্তৃক আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি বিষয়ে সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ ; বুদ্ধের ধর্মে নারীর অধিকার, (ঢাকা : ২০০৮)

Dhaka University Institutional Repository

English Books

A

Ajaha Sumedho, Teaching from the Silent Mind (England: Amaravati Publication,1992)

B

B. Russell, Authority and the Individual (Individual and social ethics) 1949

B C Law, A History of Pali literature, Vol. 1 (Delhi: 1983)

B. C. Law Geography of Early Buddhism (London: Kegan Paul, 1932)

Bela Bhatachary, Facts of Early Buddhism, (Calcutta: Modern Printers, 1995)

Bapat, P. V Ed, 2500 Years of Buddhism (Delhi: Govt. of India, 1956),

Bhikkhu Nanamali, The Path of Purification (Singapore: Singapore Buddhist Meditation Centre, 1956)

D

Durga M Bhagvat, Early Buddhist Jurisprudence (Poona: 1939)

Dr. Buddhadasa p. Krirthisnghe (Ed) Buddhist Concept Old and new (Delhi: 1983)

Dr. Tapan Biswal, Human Rights Gender and Environment (Viva Books, 2008)

Dr. Gayatri Sen Majumder, Early Buddhism and Laity (Kolkata: Mahabodhi Book Agency, 2009)

Dr. Hermann Oldenberg, Buddha his life his Doctrine, his Order (Delhi : Low Price Publication, 2013)

E

Edward J Thomas, The History of Buddhist Thought (New Delhi: Munsh)

G

Gealirth Alan, Human Rights Essays on Justification Application (Chicago: Chicago University Press, 1992)

Gems of Buddhist Wisdom (Taiwan: The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, 2006),

G. C Dev, Buddha the Humanist, Dhaka. (Karachi Lahore Dhaka: Paramount Publishers 1969), P. 21

H

H. Saddhatissa, Buddhist Ethics (London: George Allen and Unwin Ltd. 1970)

Hasan Joarder and Safiuddin Joarder, Begum Rokeya: The Emancipator (Dhaka: Nari Kalyan Sangstha, 1980)

Honderich, Ed, The Oxford Companion (Oxford: 1995)

Dhaka University Institutional Repository

I

I. B Horner, Women under Primative Buddhism (Delhi: Motilal Banarisidas Publishers Private Limited, 2007)

J

James Legge, The Travels of Fa-Hien (Delhi: Oriental Publishers, 1971)

J. Gonda, Change and continuity in Indian Religion (Hague : 1965)

K

Khalid Tanvir, Education: an introduction to Educational Philosophy and History (Karachi : 1975)

K. N Joysowal, An Introduction to Hindu Polity (Calcutta: 1913)

K. Sri Dhammananda, Human life and Problems, (Taiwan: The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, 1997)

K. Sri Dhammananda, What Buddhist Belive, (Taiwan: The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, 1993)

L

L. M Joshi, Studies in Buddhist Cultures of India (Delhi: 1967)

M

Morris, Edited, Saddhammopayan, (London: Journal of Pali Text Society, 1887)

Muhammad Zamir, Human Rights: Issues and international Law (Dhaka: 1990)

N

Narada Mahathera, The Buddha and His Teaching, (Singapore: Singapore Buddhist Meditation Centre, 1973)

Nalinaksha Dutta and Krishna Datta Bajpai, Devlopment of Buddhism in Uttrapradesh (Uttrapradesh: Lucknow Publication Burea, Gov. of Uttar Pradesh,1956)

Nanamali Tran. The Guide, Bhikkhu (London: pali Text Society, 1962)

Narada Thera Tran. A Manual of Abhidhama (Kuala Lumpur : Buddhist Missionary Society, 1956)

Nanamali Tran. The Path of Purification (Singapore: Singapore Buddhist Meditation Centre, 1956)

P

Pidiville Piyatissa, An Exposition of Buddhism (Taiwan: The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, 1995)

Dhaka University Institutional Repository

P Lakshmi Narasu, The Essence oF Buddhism (Delhi: 1948)

P. A Payutto, A Constitution for Living (Bangkok : , Buddhadhamma Foundation, 1998)

Petter Harvey, An introduction to Buddhist Ethics (Cambridge: 2000)

Phra Suntharn Plamintr, Basic Buddhism Course, (USA: 1991)

R

Robert Smitheram Translated, The Five Precepts (USA : 2011)

Richard Dagger 'Rights' in Political Innovation and Conceptual Change Ed. (Cambridge: 1989)

R. S Tripatty, History of Ancient India (Delhi: 1967)

S

S. C Chatterjee and D. M Datta, An Introduction to Indian Philosophy (Calcutta: University of Calcutta, 1994)

Sankar Sen, Human Rights in Development Society (New Delhi: 1998)

S, Tachibana The Ethics of Buddhism (New Delhi: Cosmo Publication, 2013)

S. C Roy Choudhury, Cultural and Economical History of India (Delhi: 1974)

T

T. W Rhys Davids, Buddhism (London: Pali Text Society, 1910)

T. W Rhya Davids, Dialogue s of Buddha (London: Pali Text Society, 1921))

T. W. Rhys Davids and Willam Stede, Pali English Dictionary (New Delhi: Motilal Banarisidas Publishers Limited, 2003)

T. W Rhys Davids and Williums Stede, Pali English Dictionary (New Delhi 2003)

Thahissaro Bhikkhu, The Wing to Awakening (USA: 1996)

The Illustrated Oxford Dictionary (London: 201)

Tachibana, The Ethics of Buddhism (London: 1926)

Tomas Watters Ed. On Yuan Chwang's Travels in India, London : Royal Asitic Society, 1904)

V

Ven Balangoda Anandamitreya (Colombo: Samayawardhna,, 1993)

W

Dhaka University Institutional Repository

William R Lafleur, Buddhism: A Culture Perspective (New jersey: 1988)

William Allan Nelson, Webster's New International Dictionary of English Language (London: 1959)

W.T Cunningham,, The nelson Contemporary English Dictionary (Hong Kong, 1984)

Walpola Rahula, What the Buddha Thought (Thaiwan : The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation,2009)

Journals

Journal of the Asiatic Society of Bengal 1837

Jounal of the Pali Text Society, vol. xii, Edited by K. R Norman 1988

Internet

http://www.web.singnet.com.sg/~alankhoo/precepts.html

http://www.urbandharma.org/udharma2/5precepts.htmr

http://www.angelfire.com/indie/ann_jonesl/sila.html

http://www.web.singnet.com.sg/~alankhoo/precepts.html

http://ibc.ac.then/content/history-buddhist-education-convocation-a